"নি র্ম্ম লি ন"

রেশম, পশম, সূতির সর্ব্বপ্রকার
বস্ত্র কাচিতে দেশী বিদেশী
সকল রকম সাবান
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
অথচ

—মূল্য কম—

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের
রঙিন কাপড় চোপড় 'নির্ম্মলিন'
সাবান দিয়া কাচিলে—কাপড়ের
রং ওঠে না ও অল্প আয়াসে
শীঘ্র পরিষ্কার হয়।

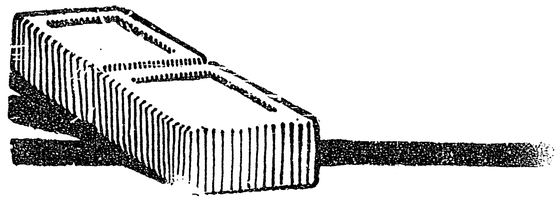

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস

ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা

বালীগঞ্জ ঃ ঃ কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

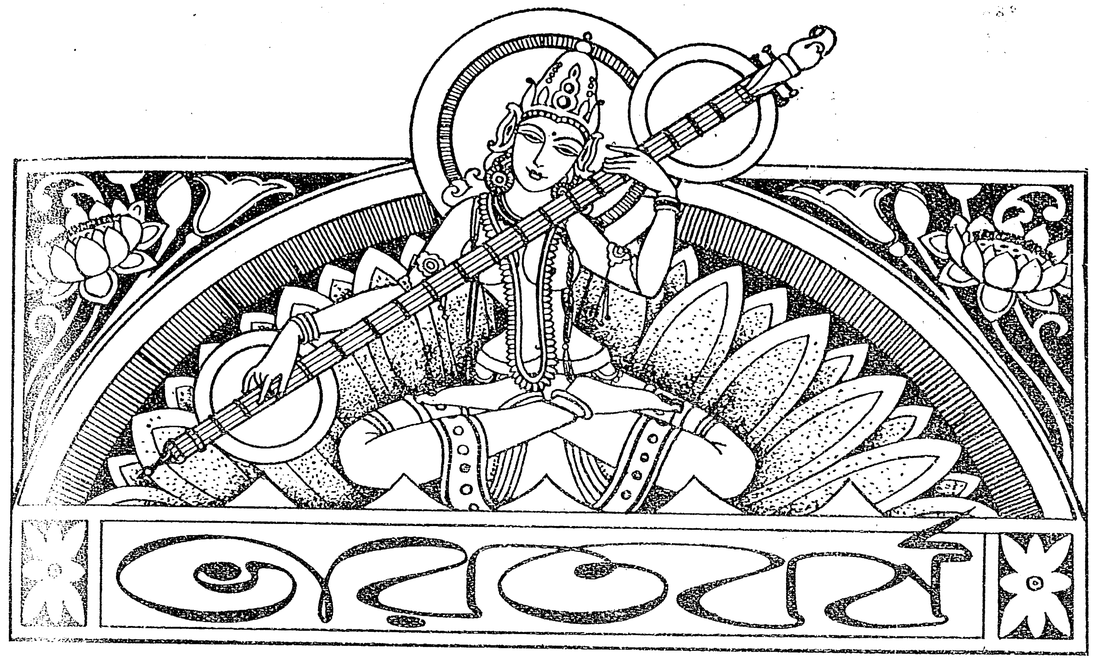

শ্রাবণ—১৩৩৮

প্রথম খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { দ্বিতীয় সংখ্যা

দুইখানি পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মণ্টু,

পত্র ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি বর্গি-বিশেষ, পোষ্টকার্ডের পত্রপুটে ভরার কথা মুড়ে দিয়ে তোমার খাজনা দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। কিন্তু আমার ক্ষেতে যে বুলবুলির নাঁক,—কত প্রশ্ন, কত চিঠি, কত চিন্তা, তাদের ছোট ছোট চঞ্চুপুটে ধান উজাড় ক'রে দিয়ে যায়—তোমার মত বর্গির খাজনা দেব কিসে?

বয়স সত্তর হোলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই। আমি কি, আমি কোন্‌খানে আছি, তা নিয়ে যারা তক্‌রার করে তারা চোখ বুজে করে, তাকিয়ে দেখে না। একদিন কোনো পঁচিশে বৈশাখে ষোলো বৎসর বয়সের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, অনেকগুলো পথের সাম্‌নে, অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্ততঃ একটাতে এসে ঠেকেছে। এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে,

আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বল্‌লেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।

বহুকাল আগে "কড়ি ও কোমলে"-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

তার মানে হচ্চে এই, মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যেই মোটা-মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌ল না,—কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্ব্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হ'য়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।

তুমি আমাকে উপরের বেদীতে চড়িয়ে রাখবে কেমন ক'রে? আমি যে তোমাদের সমবয়সী। আমার এত বড় পাকাদাড়ি নিয়েও আমি তোমাদের সঙ্গে বকাবকি করেচি, ঝগড়া করেচি, আসর জমিয়েচি, এক ইঞ্চি তফাতে স'রে বসিনি। আমার প্রবীণতায় অভিভূত হ'য়ে তোমরাও যে বিশেষ মুখ সাম্‌লিয়ে কথা ক'য়েছ, আমার ইতিহাসে এমন লেখেনা। এতে অনেক অসুবিধে হ'য়েচে, সময় নষ্ট হ'য়েচে বিস্তর, কিন্তু মনে একটা গর্ব্ব অনুভব না ক'রে থাকতে পারিনে যে, তোমাদের সঙ্গে অতি সহজেই একাসনে বস্‌তে পারি। এর থেকে বুঝেচি বুড়ো হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যারা ধর্ম্মে কর্ম্মে বিষয় সম্পত্তিতে স্বকীয় বা স্বাজাতিক ভাগ বখরার মামলা নিয়ে পেকে উঠ্‌ল কোনোদিন তাদের ছোঁয়াচ আমাকে লাগবে না। যে-মানব একই কালে "সনাতন্" এবং "পুনর্ণব" আমি তাঁরই কাছে কবিত্বের বায়না নিয়েচি—অতএব মানুষের মধ্যে আমি বাঁচব, তোমাদের সকলের মাঝখানে, কখনো বা তোমরা আমার গায়ে দেবে ধুলো, কখনো বা মালা চন্দন। আমি মানুষের অমৃতকে পেয়েচি, তাকে সুখে দুঃখে ভোগ করেচি—আমার রঙীন মাটির ভাঁড়ে তাকে রেখে গেলুম,—অনেক চুঁইয়ে গিয়েও কিছু তার বাকি থাকবে,—অল্প হ'লেও ক্ষতি নেই, কেন না ওজন দরে তার দাম নয়।

তার পর তোমার কবিতার কথা বলি। পরিমাণ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। ইতিপূর্ব্বে পদ্যজাতীয় তোমার অনেক লেখাই দেখেচি। বার বার মনে হ'য়েচে বঙ্গবাণীর মধুকোষের পথ তুমি পাওনি, তুমি ছন্দে পঙ্গু। তা নিয়ে মাঝে মাঝে আমি বিচার ক'রেচি, সেটা নিশ্চয় শ্রুতি-সুখকর হয় নি। অপ্রিয় কথা বল্‌বার অপ্রিয় দায় তুমি আমার উপর আবার চাপাতে এসেচ মনে ক'রে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলুম।

কিন্তু এ কি ব্যাপার হে? হঠাৎ ছন্দ পেলে কোথা থেকে? গুরুমশায়গিরি করবার জো রাখোনি। অকস্মাৎ তোমার কান তৈরি হ'য়ে গেল কী উপায়ে? আর তো তোমার ভয় নেই। কিন্তু কাব্য রচনায় খোঁড়া কি 'করে লাঠি ফেলে দিয়ে খাড়া হ'য়ে উঠে দৌড়ে চলে তার রহস্য আমি বুঝতে পারচিনে। এক একবার ভাবি তুমি আর কারো কাছ থেকে লিখিয়ে নাওনি তো? সরস্বতী যখন তোমার কণ্ঠে সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছেন, তখন নব-জাগ্রত ভাষায়, তোমার যা-কিছু বলবার, নিজের জবানীতেই ব'লে যেয়ো। তোমার বল্‌বার কথাও ত জ'মে উঠ্‌ছে তোমার ভিতরের থেকে। ইতি চৈত্র ১৩৩৭

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মণ্টু,

শাস্ত্রে বলে "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ"। অর্থাৎ পেট ভ'রে ভোগটার যখন সমাধা হ'য়েছে তখন বাদশার মত গা ঢেলে দিয়ে কুঁড়েমি করবে। জীবনের সুখ দুঃখ ও কর্ম্মভোগ ত খুব পুরো পরিমাণেই হ'য়ে গেছে, এখন নৈষ্কর্ত্তব্য ছাড়া আর কোনো কর্ত্তব্যই নেই। খুব সাব্লাইম রকমের কুঁড়েমি করবার জন্যে মনের আকাঙ্ক্ষা—

দার্জ্জিলিঙের কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়টার মতো—চাষবাস কোনো বালাই নেই, পশুপক্ষীপতঙ্গের কোনো ধার ধারেনা—চুপচাপ ব'সে কেবল মেঘে মেঘে রঙ লাগাচ্চে।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমার মনের ভাব তুমি ঠিক মতো ঠাওরাও নি। একটু খোলসা ক'রে বলি। আজকাল প্রায় মাঝে-মাঝে ছবি-আঁকার তাগিদ আসে। তখন দরজা বন্ধ করতে হয়। কলমের মুখে রূপের আবির্ভাব হয় নির্জ্জনে। এই যে দ্বারের বাইরে লোককে ঠেকিয়ে রাখি এজন্যে নিজেকে দোষ দিইনে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর ছবির প্রথম আঁচড় টানেন গোপনে।

ছবি-আঁকা ব্যাপারটা যদিচ নির্জ্জনে, তবু ছবি ব্যাপারটা সর্ব্বজনের। এস্থলে জনতারই কর্ত্তব্য নিষ্কৃতি দেওয়া। রচনাশালায় আড্ডা জমাতে আসা ধৃষ্টতা। যারা ছবি আঁকাটাকেই মনে করে বাজে কাজ তারা বর্ব্বর—তারা যা বলে বলুক গে, রাগ করে তো করুক। তারা কমিটি মীটিঙের ক্যোরাম রক্ষার জন্যে চেঁচামেচি করে—তখন দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে কান বন্ধ করলে দোষ হয়না।

শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাট্‌বে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে—সব সৃষ্টিকর্ত্তাই একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেইখানেই যেখানে জমেচে সকলের সঙ্গ,—তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হ'য়ে। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করি কেন?—যে জন্যে মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জমতে—শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে তৃষার জন্যে। কিন্তু কলের পাইপটা যদি মেঘের মধ্যে চালান ক'রে দেওয়া যায় তাহ'লে সহরের মেয়র সাহেবকে কাগজে গাল দিতেই হবে।...

তোমার হাল আমলের কবিতার পরে হস্তক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হই। শব্দের ধারা ও ধ্বনির কল্লোল বাধা পাচ্চে-না কোথাও। হঠাৎ তুমি এ-ওস্তাদী কোথা থেকে অর্জ্জন করলে ভেবে পাই নে।

তোমার কবিতার বইয়ের নাম চাও? নামকরণ রূপকরণের চেয়েও শক্ত। রূপের পরিচয় স্বয়ং রূপেই, নাম এসে বেড়া লাগিয়ে দেয়—সীমা নির্ণয়টা ঠিক মতো হয় না। তুমি নাম দাও না—"অনামী"। যার নাম খুঁজে পাই না তারি কথা বলি ছন্দে—ডিক্‌সনারি দূরে প'ড়ে থাকে। ইতি ৫ই বৈশাখ ১৩৩৮

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমস্যা না সমাধান?

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

অনেক দিকেই দেশের হাওয়া ফেরার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। এটা ভয়ের কথা কি ভরসার কথা, তা হঠাৎ বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কথা। যে মাঝির নৌকার পাল এলাইয়া পড়িয়া আছে, হাওয়া উঠিলে বা ফিরিলে তাকে ভাবিয়া দেখিতে হয়—হাওয়া অনুকূল না প্রতিকূল; হাওয়া আবার পড়িয়া যাইবে, কি কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিবে। জীবনের যে মহাসমুদ্রে আমাদের দেশের ভাগ্য-তরণীখানি আজ ভাসিয়া চলিতেছে, সে মহাসমুদ্র সুধু ভারতেরই নয়, বিশ্ব-মানবেরই সম্মিলিত জীবনধারায় পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সুধু বর্ত্তমানই নয়, স্মরণাতীত অতীত যুগের শত সহস্র ব্যক্ত ও গুপ্ত প্রেরণা এই মহাসম্মিলনের পশ্চাতে রহিয়াছে। এটা যে কেবল মহা সম্মিলন এমন নয়, মহা সঙ্ঘর্ষও বটে। ইহার মধ্যে গা ভাসাইয়া দিলেই যে কোন ব্যক্তি বা জাতির চরিতার্থতা, এমন বলা যায় না। ইহার মধ্যে অনেক প্রতিকূল ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করিয়া আত্মরক্ষা করারও প্রয়োজন বড় কম নয়। এই

মহাসাগরের কূল কেহ কোন দিন খুঁজিয়া পায় নাই। ইহা সুস্থির হইয়া পড়িয়াও নাই। গতিই ইহার প্রাণ, নিরন্তর চলাতেই ইহার অস্তিতা! কিন্তু ইতিহাস এটা সাক্ষ্য দিতে পারে নাই যে, এই মহাসমুদ্রের গতি ঠিক্ একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই হইয়া আসিতেছে। অথবা, যদি কোন একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যই থাকে, তবে সেটা এ পর্য্যন্ত আমাদের অজানা রহিয়া গিয়াছে। সে লক্ষ্য যে মানবীয় সত্তার উন্নতি বা অভ্যুদয়, এমন কথা বলার সাহস ইতিহাস সঞ্চয় করিতে পারে নাই। মানুষের কল্পনা অথবা বিশ্বাসের কোনও বালাই নাই। যুক্তি বা প্রমাণ যে ক্ষেত্রে পরাস্ত অথবা ত্রস্ত, মানুষের কল্পনা অথবা বিশ্বাস সে ক্ষেত্রে নিঃসঙ্কোচ। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ কল্পনা করিয়াছে, এমন কি বিশ্বাসও করিয়াছে যে, এই সৃষ্টির গতি সত্য-সত্যই একটা ঊর্দ্ধগতি; বিশ্বজীবনের অগ্রগতি সত্য-সত্যই প্রগতি। দার্শনিকের চিন্তায় এবং বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় এই রকম ধারা ক্রমিক ঊর্দ্ধগতি বা প্রগতি অনেক সময়ে সমাদৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বিগত শতকে এমনও অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, এই বিশ্বাস বা কল্পনার ভিত্তিটা সত্য সত্যই পাকা। এখনও অনেকে সম্ভবতঃ তাই মনে করেন। কিন্তু এটা আর অস্বীকার করা চলে না যে, ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল ও রহস্যগর্ভ হইয়া দেখা দিতেছে। বিশ্ব-ঘটনার বর্ত্ম আজ আর বোধ হয় সোজাসুজি একটা কাটা-ছাঁটা নক্সা করিয়া দেখাইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। সরলরেখা-ক্রমে কেবলই ঊর্দ্ধগতি হইতেছে, এ কথা কে আজ জোর করিয়া বলিবে? এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, শেষ পর্য্যন্ত একটা চরম লক্ষ্যের দিকেই নিখিল বিশ্ব-ঘটনার গতির মুখ রহিয়াছে। হয় ত সে চরম লক্ষ্য, আমাদের অজানা রহিলেও আমাদিগকে তারই অভিমুখে টানিয়া লইতেছে। আমাদের এই সৌর-জগৎ স্থির হইয়া নেই এ কথা ঠিক; কোনও একটা কেন্দ্রের চারিধারে ঘুরিতেছে এ কথাও ঠিক। কিন্তু সে কেন্দ্রটি এখনও আমাদের পরিচয়ের বাহিরে। কিন্তু সে আমাদের পরিচয়ের বাহিরে হইলেও, আমরা ত' তার প্রভাবের বাহিরে নই! এই রকম মনে হয় যে, আমাদেরও সম্মিলিত জীবনের অথবা জীবন-সমষ্টির কোনও একটা চরম লক্ষ্যের দিকে প্রবণতা হয় ত আছে; এবং এটাও হয় ত ঠিক যে, আমরা সাধ করিয়া চলি আর নাই চলি, আমাদের চলাটা শেষ পর্য্যন্ত কোনও এক চরম লক্ষ্যের অভিমুখেই হইতেছে। কিন্তু সিদ্ধাশ্রম অথবা সত্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের এই নবলোকের হিসাব লইয়া দেখিতে পাই যে, এখানে ঐ চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অথবা কল্পনা প্রায় বিসংবাদিনীই হইয়াছে, সংবাদিনী হয় নাই। এই চরম লক্ষ্যের চারিধারে মানুষের যুগায়ত দার্শনিক চিন্তা এক ভয়াবহ গোলকধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়াছে। সে গোলকধাঁধাঁর ভিতরে আমরা পথের হদিস পাইবার কোনই সূত্র খুঁজিয়া পাই নাই। উপনিষদের ঋষিরা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃতে লইয়া চল। কিন্তু আমরা যে গোলক-ধাঁধাঁর কথা বলিতেছি, তার মধ্যে যতই পা বাড়াই, ততই দেখি, আঁধার আরও ঘন হইয়া সব ঘিরিয়া আসিতেছে।

সৃষ্টির চরম গন্তব্য অথবা জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে এই গোলকধাঁধাঁর ভিতরকার গণ্ডগোল কোনও দিন থামে নাই, সহসা থামিবে বলিয়াও মনে হয় না। জীবের পরম পুরুষার্থ কি, এবং কি উপায়ে সেটাকে পাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে বিবাদ ও গোলযোগের অন্ত নাই। আঁধারে অসমান ও কুটিল পথে হুটোপুটি করিয়া চলিতে গেলে যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক, সেইরূপই হইয়াছে। যেখানে কেহই দেখে নাই, সেখানে কে কাহারে পথ দেখাইবে? দেখিতে পাইলে, সত্যকার একটা পথ দেখিতে পাওয়া যাইত; এবং তাহা হইলে, সে পথে চলায় কোন মারাত্মক গোল বাধিত না। সকলেই দেখিয়া শুনিয়া পা বাড়াইতে পারিত। কিন্তু সকলেই যেখানে অন্ধ এবং সকলেরই কল্পনা জল্পনা যেখানে নিরঙ্কুশ, প্রত্যেকেরই অভিমান যেখানে শ্রেষ্ঠ অভিজাত, সেখানে দেখিয়া শুনিয়া পথ চলা কাহারও হয় না, কেবল বাজে গণ্ডগোলই হইয়া থাকে। লক্ষ্যের সন্ধান এবং লক্ষ্যের অভিমুখে সত্যকার পথের সন্ধান যিনি দিতে পারিয়াছেন, তিনি এই চিরন্তন গোলক-ধাঁধাঁর ভিতরে হয় ত আদৌ ঢুকিতে চান নাই, অথবা ঢুকিয়া থাকিলেও কোন গতিকে বাহির হইবার একটা ফন্দি করিতে পারিয়াছেন। এ-সব সন্ধানী লোকের কথা সত্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু আমরা যারা গোলকধাঁধাঁর

পাকে ঘুরিয়া মরিতেছি, তাদের পক্ষে সে সব লোকের নাগাল পাওয়া ত সহজ নয়। নিজেদেরই চেঁচামেচিতে এত ব্যস্ত যে, খবরদারের খবরাখবর আমরা আদৌ শুনিতে পাই না, নয় ত শুনিতে পাইলেও, বিশ্বাস করিতে পারি না। যেটা যুক্তি বা তর্কের দ্বারা বুঝিবার ও বোঝাবার নয়, সেটাকে তাই দিয়ে বুঝাইয়া দেওয়ার বায়না করিয়া বসি। এ যেন কাউকে বলা—"ওগো, তুমি আমায় আমার নিজের কাঁধে উঠিয়ে দাও"। সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধির সামগ্রী যুক্তি-তর্কের হাটে বাজারে সওদা করিলে তার মূল্য দর পাওয়া যায় না। এই সব কারণে মনে হয়, আমরা চিন্তাশীল লোকদের মুখ হইতে সৃষ্টিরহস্য অথবা জীবনরহস্য সম্বন্ধে যে সকল চিন্তার উদ্গার উঠিতে দেখিতে পাই, তাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, তা'দের নিজেদেরই বুদ্ধিজঠরে ও-সকল চিন্তা হয় ত' জীর্ণ হইতে পারে নাই। মৌলিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে দার্শনিকদের অধিকাংশ চিন্তাই হয় ত এই রকম ধারা অজীর্ণের উদ্গার মাত্র। আমরা দর্শন-বিদ্যার অপযশ করিতেছি না। সে বিদ্যার যে একটা স্বাভাবিক গণ্ডী আছে, একটা স্বভাবসিদ্ধ কার্পণ্য আছে, সেইটারই ইঙ্গিত করা আমাদের উদ্দেশ্য। মননের কাজ উপলব্ধি নয়, আর উপলব্ধিরও কাজ মনন নয়। 'যার কাজ তারেই সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।' যার কাজ মনন, সে যদি বলে, আমি দেখাইয়া দিব, তবে তার অযথা গরব করা হইল। যে দেখায় সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, সে দেখানর মালেক মনন-ব্যবসায়ী নয়। তার কাজ আলাদা, এবং সে কাজেরও প্রয়োজন আছে। যাই হ'ক, এ মহাসমুদ্রের মাঝখানে তরী ভাসাইয়া যখন কূল-কিনারা কিছুই দেখিতেছি না, তখন দার্শনিককে ডাকিয়া আনিয়া আমার তরীর কর্ণধার করিয়া বসাইয়া দিতে কৈ তেমন ভরসা ত পাইতেছি না। দার্শনিকের পক্ষকেশ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ত' স্বচ্ছ নয়; হৃদয় ত' অকূতোভয় নয়, বাহু ত' ধীর ও অকম্পিত নয়! এ অকূলে পাড়ি দিতে যে রকম ধারা সাচ্চা ও শক্ত মাঝির প্রয়োজন, সে রকম ধারা সাচ্চা ও শক্ত মাঝির সার্টিফিকেট্ দার্শনিকের নাই।

দার্শনিককে ছাড়িয়া বিজ্ঞানাগারের দুয়ারে গিয়া ধরনা দিব কি? বিজ্ঞান শুধু যে বকিয়া মরে এমন নয়, সে আবার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াও দিতে চায়। সাদা চোখে দেখাইতে না পারিলেও, যন্ত্র দিয়া দেখাইয়া দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের অশেষ কেরামতি আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের বিজলি বাতির রোশনাইয়ে আমাদের সত্য দৃষ্টিটিকে ঝল্‌সাইতে দিলেও ত' চলিবে না। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে অপরা-বিদ্যা। এ বিদ্যা ত' সেই উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ শ্বেতকেতুর বিজ্ঞান-বিদ্যা নয়—যে বিজ্ঞানে নিখিল বিজ্ঞাত হইয়া যায়! এ বিদ্যা যে অসীম অজানার অমানিশার মাঝখানে একটুখানি জোনাকির ছটার মত চঞ্চল ও চকিত হইয়া ফুটিতেছে আর নিভিতেছে। যেটুকু দেখিতেছি বা বুঝিতেছি, তার চারিভিতে অজানার আঁধার আরও নিবিড়, আরও বিরাট্ হইয়া দেখা দিতেছে। এক বিন্দু বোঝার সঙ্গে একটা না-বোঝার সাগর পাইতেছি। বিজ্ঞানের অণু যতদিন এটম্ ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের বোঝাপড়ার মামলা অনেকটা সহজই ছিল। কিন্তু আজ অণুর ভিতরে দস্তুরমত একটা জগৎ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে আমাদের দেখার ও বোঝার দৌড় যতটা না বাড়িয়াছে, তার চাইতে ঢের বেশী বাড়িয়াছে বিস্ময়ের ও সংশয়ের দৌড়! যেখানে একটা সমস্যার সমাধান হইল ভাবিলাম, সেখানে দেখি তার ভিতর হইতে শত শত অতর্কিত সমস্যা আবার নূতন করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বটগাছ বুঝিব মনে করিয়া বটের ফল হাতে লইলাম। ভাঙ্গিয়া দেখি, সে ফলের ভিতরে শত শন ছোট দানা। এদেরই এক-একটা কি বটের প্রসূতি? তাই বা কেমন করিয়া বলি? সেই ছোট একটা দানা ভাঙ্গিলে তার মধ্যে আরও ছোট ছোট দানা দেখিতে পাওয়া সম্ভব। সাদা চোখে দেখিতে না পাইলেও, হয়ত যন্ত্র-সাহায্যে দেখিতে পাওয়া সম্ভব। তাহা হইলে, বটের আসল বীজ কোন্‌টা? কোন্ চরম বিন্দু বা কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বটের প্রকৃতি তার নিজস্ব শক্তি-ব্যূহটিকে রচনা করিয়া রাখিয়াছে? এই বটের বীজের উপমা আমরা দিতেছি না, ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতিই দিয়া গিয়াছেন। আসল কথা এই যে, আমাদের অন্বেষণের পথে কেহ কোন দিনই আগা ও মুড়া খুঁজিয়া পায় নাই। অথবা, ব্যাপারটা যেন আরও রহস্যময়। একটা সাপ যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া নিজের ল্যাজ নিজেই

গিলিয়া ফেলিতেছে। যেখানেই আরম্ভ করি, আবার সেখানেই ফিরিয়া আসিতে হয়। বিজ্ঞানের যে-কোনও অন্বেষণের বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি এ কথা খাটিবে। এককে বহু দিয়া বুঝিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত একেই ফিরিতে হয়; আবার বহুকে এক দিয়া বুঝিতে গিয়াও শেষ পর্য্যন্ত বহুতেই ফিরিতে হয়। রক্তবীজের এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়িলে শত সহস্র রক্তবীজের উদ্ভব হইয়া থাকে শুনিয়াছি। বিশ্ব-ঘটনাপুঞ্জের যে-কোনও সমস্যা, যে-কোনও প্রশ্ন ঐ রক্ত-বীজেরই গোষ্ঠী। সমাধানের খড়্গে তাকে কাটিয়া ফেলিলে শত সহস্র সমস্যা নূতন করিয়া গজাইয়া উঠে দেখিতে পাই। রক্তবীজ নিপাতের পূর্ব্বে দেবতারা সভয়ে দেখিয়াছিলেন যে, নিখিল জগৎ রক্তবীজের গোষ্ঠী দ্বারাই আপূরিত হইয়া গিয়াছে। আমরাও এই বৈজ্ঞানিক যুগে সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখিতেছি যে, শত শত নূতন সমস্যায় আমাদের ভাবনা চিন্তার জগৎটাকে উত্তরোত্তর ছাইয়া যাইতেছে। এক খণ্ড মেঘ সরিয়া যায় ত' দশখানা মেঘ আসিয়া জমাট বাধে। একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানের ভিতর হইতেই শত শত সমস্যা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যেন তারা ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল। একটা ক্ষুদ্র ধূলিরেণু আজ আর আমাদের পরিচয়ে ক্ষুদ্র নয়। তার সমস্যাও অসীম, তার সমাধানও অফুরন্ত। কেন না, সে যে ভূমারই কায়্‌বারি স্বল্প মূর্ত্তি! শ্রুতি বলিবেন—"ব্রহ্মের হৃদয়রবেশ্ম বা গুহা।" পুরাণ বলিবেন—"সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরই বামন রূপ।" এই গেল বিজ্ঞান-বিদ্যার এক দিকের কার্পণ্য।

তার পর, যেটুক্‌খানি আমরা বিজ্ঞানের প্রসাদে দেখিতেছি, সেটুক্‌খানিই কি পাকা দেখা? আগে অনেকে তাই মনে করিতেন বটে, কিন্তু এখন অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, আসলে সে দেখা পাকা দেখাই নয়, কাঁচা দেখা। বিজ্ঞানের রচনা সম্ভবতঃ ময়দানবের রচনা। যা কিছু খাঁটি সত্য বলিয়া কাটিতেছে, সে সমস্তই খাঁটি সত্য না হইতে পারে। গিল্টির জলুসও বড় কম হইতেছে না। কোনও কোনটা হয় ত ভেল্কি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞানের অণু পরমাণু, দেশ কাল, ঈথার, তাড়িত-শক্তি প্রভৃতি যে কতটা খাঁটি সত্য, সে পক্ষে অনেকেই আজকাল জেরা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্ততঃপক্ষে এ-সবের সত্যতা যে স্বয়ংসিদ্ধ নয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। স্বয় সিদ্ধ হইলে সংশয় উঠিত না, জেরা চলিত না। বৈজ্ঞানিক-জগতের বাস্তবতা প্রতিপন্ন করিতে কোন কোন কুশাগ্রধী মনীষীকে বিস্তর পরিশ্রম করিতেও হইতেছে দেখিতে পাইতেছি।

তার পর, আবার এও আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, বিজ্ঞান যে ঘটনাগুলিকে পরীক্ষিত এবং যে সিদ্ধান্তগুলিকে অসন্দিগ্ধ মনে করিয়া আসিতেছিল, সে সব ঘটনা এবং সে সমস্ত সিদ্ধান্ত আজকাল যেন কিসের একটা দ্রাবকে শিথিল হইয়া গলিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের কোন "ফ্যাক্‌ট"-ই আজকাল আর কায়েমি সত্য নয়; পূর্ণ বা গোটা সত্য সে ত' কোন দিনই ছিল না। ভাঙ্গাচোরা এবং জখমি সত্য কি না, সে বিষয়েও অনেকে জেরা তুলিতেছেন। পুরাণের মধু ও কৈটভ যদি আবরণ ও বিক্ষেপ হয়, তবে আমরা বলিতে পারি যে, বিজ্ঞানের "ফ্যাক্‌ট্" মাত্রেই মধু-কৈটভের কোটে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব তারা মায়িক সত্য। একেবারে আকাশ-কুসুম মনে না করিলেও চলে। বিজ্ঞানের "প্রিন্সিপল্"গুলি সম্বন্ধেও এই কথা। জগতের কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলটিকে যতটা পাকাপোক্ত মনে করা হইত, এখন দেখা যাইতেছে, সেটি ততদূর পাকাপোক্ত নাও হইতে পারে। তার মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকাও বিচিত্র নয়। সম্ভবতঃ আছেও। নিউটন বিদ্যা-বারিধির কূলে দাঁড়াইয়া কয়েকটি উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি বলিয়া অনবদ্য বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুই এক শতাব্দী পরে দেখি, বৈজ্ঞানিক এক বিশ্ব-বেড়া জাল হাতে করিয়া সেই অকূলের কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সেই জালের গায়ে লেবেল আঁটা রহিয়াছে—নিয়ম ও শৃঙ্খলা। প্রাচীনেরা সতর্ক হইয়া বলিতেন—ঋত। তাঁর আশা, তিনি এই জাল বিশ্ব জুড়িয়া ফেলিলে, তিমি-তিমিঙ্গিল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র শফরী পর্য্যন্ত কেহই বাদ পড়িবে না। বিশ্বে এমন কিছু বিপুল রহিবে না, যেটি এই বিশ্ব বেড়ার জালে সমগ্রভাবে ধরা না পড়িবে; অথবা এমন কিছু ক্ষুদ্র রহিবে না, যেটি এই জালের ছিদ্র দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইবে। বিরাট্‌কেও ইনি নাগপাশে বাঁধিবেন, আবার বামনকেও বাঁধিবেন। ঐ সুবিপুল নক্ষত্রজগৎ—যার তুলনায় আমাদের এই ধরিত্রী একটা ধূলি-রেণুর চাইতেও

নগণ্য,—তাকে তিনি তাঁর হিসাবের খাতায় স্বচ্ছন্দে বন্দী করিয়া ফেলিবেন। আর ঐ অণুর অন্দর-আসরে যে সব তৈজস বালখিল্য বাউল নাচিয়া বেড়াইতেছে, তা'দিগকেও তিনি আপনার ছন্দের শাসনে বাঁধিয়া নাচাইবেন। এই ছিল তাঁর আশা, এই ছিল তাঁর সাধ। তাঁর জালটি যে বিশাল ও বিচিত্র, তা আমরা সকলেই সবিস্ময়ে দেখিতেছি। কোটি পরার্দ্ধ যোজন দূরে সরিয়া রহিয়াও, জ্যোতিষ্ক অথবা নীহারিকাপুঞ্জ কতক কতক এই জালে ধরা পড়িয়া যাইতেছে দেখিতেছি। তাদের আকৃতি-প্রকৃতি, গতি-বিধি, উপাদান-উপকরণের অনেক সমাচারই আমরা পাইতেছি, সন্দেহ নাই। অন্য দিকে আবার, সে জালের বুনানী এত মিহি যে, অতি সূক্ষ্ম সামগ্রীও তাহাতে ছাঁকিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও এটা বৈজ্ঞানিক নিজে দেখিতেছেন এবং আমরাও দেখিতেছি যে, সব কিছু তাঁহার জালে উঠিতেছে না। আসল যেটি, সেটি বরাবরই জাল এড়াইয়া যাইতেছে। ছোট হউক বড় হউক, যেটি উঠিতেছে, সেটি অনেক পরিমাণে বৈজ্ঞানিকেরই মানসপুত্র। তাঁর নিজেরই কল্পনা সে সবের প্রসূতি। তিনি তাঁর বিজ্ঞান-ব্যবহারের নিমিত্ত আসলের ভোল ফিরাইয়া লইতেছেন, বাস্তবকে কতকটা মনগড়া করিয়া লইতেছেন; অমিত, অমেয় বস্তুকে মাপ-যোগ্য মনে করিয়া লইতেছেন। তবেই না সে বস্তু তাঁর জালে ধরা দিতেছে! নইলে আসলকে ধরে, আসলকে লইয়া কারবার করে, কার সাধ্য! আসলের এবং সমগ্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, বিশ্বে এমন কোনও বস্তু নাই, যেটিকে বিজ্ঞান তার জালে ঘোল-আনা ঘিরিতে পারে, এবং তার আইনের নাগপাশে একান্তভাবে বাঁধিতে পারে। আসলে একটা ধূলিকণাও বিজ্ঞানের দ্বারা বিজিত হয় নাই, কস্মিন্‌কালে হইবেও না। আমরা সাচ্চা ছাড়িয়া ঝুটার হিসাব রাখিতেছি বলিয়া ভাবি, সবই যেন একটা অনড় ব্যবস্থার বা নিয়মের গোলাম হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আসলে কেহই বা কিছুই গোলাম হইয়া নাই। যেটাকে জড় ভাবিতেছি, সেটাও নাই। বৈষ্ণবেরা জীবকে নিত্য-কৃষ্ণদাস বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই দাস্য গোলামি নয়, বিজ্ঞান যেটাকে বাধ্যতা বলিয়া জাহির করিতেছে, তা নয়। জীব ভগবানের লীলা-প্রতিযোগী; আর, পুতুলের সনে লীলা হয় না,—এটা মনে রাখিতে হইবে।

বিজ্ঞানের বাস্তু-দলিলখানি আমরা একবার কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। কেন না, এ যুগে দর্শনের তেমন জাঁক নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের জাঁকের অন্ত নাই। আমরা সৃষ্টির এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শেষ লক্ষ্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম, তার এক-তরফা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের খোদ বৈজ্ঞানিকেরা না হউন, বৈজ্ঞানিক-ঘেঁসা পণ্ডিতরা করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেন। ডারুইন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণীদের জগতেই ইভলিউসান্ থিওরি চালাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সত্বরই সে ধূয়া প্রাণি-জগতের সীমানা ছাড়াইয়া অপরাপর ক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই বিশ্বটাই একটা ক্রমোন্নত অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই রকম একটা ধারণা বিজ্ঞানের আওতাতেই বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং পাইয়াছে। মানুষের সভ্যতাকে তাই হাতে-খড়ি দিতে হইয়াছে, সেই প্যালিওলিথিক্ যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণে। মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সাধনাকে তাই সুরু করিতে হইয়াছে, বর্ব্বর যুগের অর্থহীন ও শ্রী-সৌষ্ঠবহীন ম্যাজিকে। বর্ত্তমান সভ্যতা তাই না কি মানুষের যুগ-যুগান্তরব্যাপী অধিরোহণের চরম পদবী —মানবীয় সিদ্ধি ও ঋদ্ধির সর্ব্বোন্নত শিখর। ভবিষ্যতে উঠিব কি নামিব, তার কে জানে? কিন্তু এখনই এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইয়াছে যে, এই জাতীয় চিন্তা-সৌধের বুনিয়াদ শক্ত জমিনে তেমন ধারা পাকা-পোক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা হয় নাই; হয় ত এটা অনেক পরিমাণে হাওয়ার উপর, অন্ততঃ পক্ষে হাল্কা বালির উপর গঠিত। ফল কথা, এখন আর আমাদের উপর-উপর দেখিলে চলিবে না, তল্লাইয়া গোড়াটাই পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। সভ্যতা বা কাল্‌চার্ নিজেকে সভ্যতা বা কাল্‌চার্ বলিলেই, তা হইয়া গেল না। আপনার ঢাকটি বাজাইতে কেহ কোন দিন কসুর করে নাই। প্রকৃত সভ্যতা বা কাল্‌চারের নিদান ও লক্ষণ সাব্যস্ত হওয়া দরকার। প্রকৃত উন্নতি বা অভ্যুদয় কি অবস্থায় কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত হইতে পারে, তা আমাদের ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত হইবে। মেকী ও ভেক্কীর বড় বেশী

কাট্‌তি হইতেছে দেখিতেছি। এমন কি বিজ্ঞানেও। অতএব সতর্ক, সাবধান না হইলে আর চলিতেছে কৈ?

গোড়াতেই এতবড় গৌরচন্দ্রিকা করিতে হইতেছে এই কারণে যে, আমরা আজকাল অনেকেই একটা মিথ্যা বৈজ্ঞানিকতার বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অন্ধ ভূত বরং তাড়ান সহজ; কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ভূত তাড়ান সহজ নয়। অন্ধ যুগের কুসংস্কার দনুজদলনী হইয়া না কি এই বৈজ্ঞানিকতা আসরে নামিয়াছেন। অনেক কুসংস্কারের মুণ্ড সত্য সত্যই ভূমে লুটাইয়াছে। গরবিনী দনুজদলনী তাদের মুণ্ডমালা গাঁথিয়া আপন গলে জয়মাল্য দোলাইয়াছেন। কিন্তু অনেক দিন হইতেই দুইটি খট্‌কা মনে উঁকিঝুঁকি মারিতে সুরু করিয়াছে:—প্রথম, যা কিছু সংস্কার আমরা ভাঙ্গিয়াছি অথবা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে সমস্তই কি নিঃসংশয়-রূপে কুসংস্কারই? মিথ্যা সংস্কারের সঙ্গে অনেক সত্য সংস্কারও কি ঝাঁটাইয়া কোণে সরাইয়া রাখা হয় নাই? দ্বিতীয়, যাহা এই সংস্কার-লীলাটি চালাইয়াছে, সে নিজেও কি কতকগুলি মিথ্যা সংস্কারের সৃষ্টি করে নাই? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে অনেক মিথ্যা সত্যের সাজে সাজিয়া বেশ কিছু দিন আমাদের ঠকাইয়া গিয়াছে, তার সাক্ষ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় পাতায় মিলিবে। আজ বৈজ্ঞানিক যাহা তিন সত্য দিয়া আমাদের বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছেন, কাল দেখি তিনি আবার সেটিকে নির্ম্মম হস্তে ফাঁসি-কাষ্ঠে লট্‌কাইয়া দিতেছেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। বিজ্ঞান-বিদ্যার গতি শুধু যে শামুকের গতি এমন নয়, সেটা আবার সরীসৃপের গতি। সে বিদ্যা ঋজু ও সহজ পথে অগ্রসর হয় নাই। সে বিদ্যার যে অভিনব তনু সেটাকে শাশ্বতী বলিব কোন্ সাহসে? এই সব কারণে মনে হয়, বিজ্ঞানাগারে যে গোঁড়ামীর বেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, সে বেদী ভাঙ্গিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। সে বেদী কদাপি আমাদের বিশ্বাসের অর্ঘ্য আর পূজার নৈবেদ্য স্থাপনের বেদী হওয়া উচিত নয়। এটা বৈজ্ঞানিক, ওটা অবৈজ্ঞানিক—এই রকম ধারা বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের ভিতরে জরিপের ফিতা টানিয়া দাঁড়াইয়া থাকার দিন চলিয়া গিয়াছে। যে ইভলিউশান থিওরি বা অভিব্যক্তিবাদের কথা আমরা আগে পড়িয়াছি, সে বাদের মূল কাঠামোখানা আজও কোন মতে বজায় থাকিলেও, তার সেই সাবেকি ডাল-পালা প্রায়ই বাদ-সাদ পড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাই আজ আর সেই থিওরির সূত্র ব্রহ্ম-সূত্রের মত চাপিয়া ধরিয়া থাকা চলে না। উন্নতি বা অভ্যুদয়ের একটা প্রকৃষ্ট লক্ষণ নির্ণয় করার অপেক্ষা রহিয়াছে। সেটা নির্ণয় যত দিন না হইতেছে, তত দিন কে সভ্য, কে বর্ব্বর, তা নির্ণয় করা চলিবে না। নিজেদের মালের বড়াই করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পরের উপর জুলুম করিতেছি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগৎ অবশ্য আপনার আলিঙ্গিত সভ্যতাটিকে পরাৎপরা সারাৎসারা মনে করে। কিন্তু ইহাতেই সপ্রমাণ হয় না যে, সে সভ্যতার চাইতে উৎকৃষ্ট সভ্যতা রূপে গুণে, কুলে শীলে, কোন কালেই হয় নাই, অথবা হইবে না। আমরা যে কয়টি সংশয়ের ঢেরা তুলিলাম, আজকাল ও-দেশেও অনেকে সেই সব ঢেরা তুলিতে সুরু করিয়াছেন। শ্রেয়ের পথ, কল্যাণের, শিবের অধ্ব সাম্‌নে স্পষ্ট দেখিতে পাই আর না পাই, এটা স্থির যে, কাহারও প্রাণে স্বস্তি নাই। নানা দিকে নানা ভাবে ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে, সকল দিকেই বিপ্লবের সাড়া পাইতেছি। বিপ্লবের বড় বড় দুই চারিটা ঢেউ আমাদের এই প্রাচীন ভাবুক মহাদেশের বুকেও আসিয়া পড়িয়া একটা গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতেছে। এ দেশের আত্মাও, তার শত সহস্র বর্ষের সাধনা ও তপস্যার বেদীতলে বসিয়াও, আজ যেন কি একটা গভীর ভূকম্পনের ফলে অস্থির ও আকুল হইয়া উঠিতেছে! আজ তার পক্ষে নিজের যুগাস্তীর্ণ আসনে সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। সে আসন সিদ্ধপীঠ হইলেও, তাকে আশ্রয় করিয়া থাকার মত বল ও ভরসা সে যেন আজ হারাইতেছে। মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন—সে, সে আসনে বসিয়াই, বরাভয় ও যোগক্ষেম লাভ করিবে। আসনে স্থির হইয়া থাকিলে, তার সিদ্ধি অমৃত আর অভয়, আর আসন হইতে টলিলে তার গতি—মৃত্যু ও মহাভয়। আজকাল অবশ্য আমরা অন্য রকমও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। গতিই যখন জীবনের লক্ষণ, তখন সাবেক ঘুণেধরা খুঁটিটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকা—ক্লৈব্য; আর তার ফল রিক্ততা ও মরণ ছাড়া আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমানের উদ্বেল জীবন-সিন্ধু হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আমরা

কোন্ প্রাণ-সঞ্চারহীন অতীতের মরুমাঝে শুকাইয়া মরিব? এই মহাসিন্ধু হইতে বিমুখ হইয়া নয়, কিন্তু ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াই, আমাদের জীবন পাইতে হইবে। আকাশের বারিধারা আর বন্যার প্লাবন, এ দুই হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিয়া কোন্ উদপান নিজেকে চিরদিন জীবনের রসে ভরিয়া রাখিবে? তাহার মর্ম্মস্থলে যে গোপন নির্ঝর ঝরিতেছে, তার গভীর স্তরে ধরিত্রীর যে সমস্ত ফল্গু-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তারা, আকাশ, বাতাস ও আলোকের দান প্রত্যাখ্যান করিয়া, কি চিরদিনই তাকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিবে, স্বচ্ছ ও হৃদ্য করিয়া রাখিতে পারিবে? কেবল অতীতের দোহাই দিয়া, আর অতীতের তহবিল ভাঙ্গিয়া খাইয়া কোন্ জাতি তার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে? যখন দারুণ ভূকম্পনে সৃষ্টি রসাতলে যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন কোন্ জীবিতা-কাঙ্ক্ষী তার জীর্ণ মন্দিরের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া নিজেকে নিরাপদ্ মনে করিবে? একটা গাছ যখন বাড়ে, তখন সে জীর্ণ ত্বকের বল্কল আর জীর্ণ পত্ররাজির ভার ত্যাগ করিয়াই বাড়ে। যদি দেখা যায়, তার পরিচ্ছদ জীর্ণ হইতে জীর্ণতরই হইতেছে, তার জীর্ণ পত্ররাজির মধ্যে নবকিশলয়ের অঙ্কুর মোটেই দেখা দিতেছে না, তবে আমরা সে গাছটার জীবন সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া পড়ি না কি? এই ভাবে, এই দিক্ দিয়া চিন্তা আমাদের ভিতরে একটা গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্যা জাগিয়াছে —অচলায়তনের ভিতরে বসিয়া থাকাতেই কি জীবন, অথবা, ক্রমাগত গতির ক্ষিপ্রতা অর্জ্জনের প্রয়াসেই জীবন? তুলসীদাসের একটা দোঁহায় পাই—চল্‌তি চক্কির কীলকে যে আশ্রয় লইতে পারিয়াছে, সেই বাঁচিয়া গেল; আর যে সেটিকে আশ্রয় করিতে পারিল না, তাকে চাকির পেষণে চুরমার হইতেই হইবে। এই যে বিরাট চক্কি চলিতেছে, এর কীলক যে কি বা কে, তা কে বলিবে? তিনি কি ভগবান? অথবা আমরা যেটাকে অচলায়তন বলিতেছিলাম, সেই রকম একটা কিছু? মীমাংসা হয় নাই। যদি বা একটা কীলকের মত একটা কিছু থাকে, তবে সেটাকে আশ্রয় করার মানে কি? আশ্রয় করিতে পারিলে হয় ত অটুট্ রহিয়া যাইব, কিন্তু অটুট্ রহিয়া যাওয়াই কি জীবন, অথবা, জীবনের চরিতার্থতা? যে সব দানা পিষিয়া যাইতেছে, তারা পিষিয়া যাইয়া মরিতেছে অথবা বাঁচিতেছে? ফুল ফুটিলে তবে তাতে ফল ধরে। ফল ধরিলে ফুলের পাঁপ্‌ড়ি আপনিই ঝরিয়া পড়িয়া যায়। এটা ফুলের মরণ না জীবন? ফল কথা, তলাইয়া না দেখিলে এ-সব মনের গোল মিটিবে না দেখিতেছি। এই বিশ্ব মহাব্রজে বাঞ্ছিতের মন্দির-দুয়ারে চিরদিন ধর্‌না দিয়া পড়িয়া থাকাই কি শ্রেয়ঃ ও মুখ্য, অথবা, এক রিরাট্ অফুরন্ত পরিক্রমার মধ্য দিয়াই আমাদের এই তীর্থযাত্রার সত্যকার ফল অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে? কালী বলিয়া ডুব দিলেই কি রত্নাকর তার গর্ভে আমাদের রত্নপুট সাজাইয়া দিবে, না, কোন এক সুদূর অজানা রত্নদ্বীপের পানে ঢেউ ভাঙ্গিয়া সাঁতার কাটিয়াই চলিতে হইবে?

আমরা গোড়ার কথা পাড়িয়া হয় ত গোল বাড়াইয়া তুলিতেছি। কিন্তু গোড়ার কথা না তুলিয়া এ গোড়ার গোল থামানর অন্য উপায় আছে কি? কানে আঙ্গুল দিয়া শুনিব না বলিলেই এ চিরন্তন গোল কি চুকিয়া যাইবে! এ গানের আসরে যারা "গোল থামাও গোল থামাও" বলিয়া চেঁচাইতেছে, তারাই সব চাইতে বেশি গোল করিতেছে না কি? বর্ত্তমান যুগ না কি বাজে গোল থামাইবার যুগ। মানব এত দিন ধরিয়া তার দীর্ঘ শৈশবে যে সমস্ত বাজে গোল করিয়াছে—বেদেই হ'ক আর বাই-বেলেই হ'ক—সেই সমস্ত গোল, সে সব "অমৃতং বালভাষিতং" ধমক্ দিয়া থামাইবার জন্যই কি এই বর্ত্তমান যুগ আসরে অবতীর্ণ হন নাই? তাঁর ধমকে কিছু ফল যদিও বা হইয়া থাকে, এটা কি আমাদের ভুলিলে চলিবে যে, তাঁর এই পরিণত বয়সের কাজের কর্কশ কদর্য্য গোল, সে যুগের শৈশবের বাজে মিঠে ও মঞ্জুল গোলের চাইতে ঢের বেশী মর্ম্মান্তিক ভাবে অসহনীয়! বিহগের কাকলিতে অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না, কিন্তু মাধুর্য্য পাই। তার মিষ্টতাটুকুর জন্যই আমরা তার আদর করিয়া থাকি। কিন্তু রসহীনতা ও সৌষ্ঠবহীনতা গুরুগম্ভীর অর্থযুক্ত হইলেও আমাদের ভাল লাগে না। বিশেষ, সে অর্থ যদি অনর্থ হয়, তবে আমাদের অসহিষ্ণু ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়। গাঙ্গে পাড়ি দিতে দিতে বুনো মাঝি-মাল্লার অবোঝা ভাটিয়ালী সুরের গানও মিঠা লাগে, কিন্তু মেছুনীদের

কড়ির মুনাফা লইয়া কোন্দল ভাল লাগে না। বর্ত্তমান যুগ বড় গলা করিয়া বলিতেছে—সে কাজের যুগ। এত দিন না কি মানুষ ছেলেমির খেলা লইয়াই ছিল, আজ তার বিজ্ঞান তাকে সত্যকার কর্ম্মদীক্ষা দিয়াছে। পুরাণকার ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মই ছিল না, কর্ম্মভূমি থাকিবে কিসে? মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! যজ্ঞ, হোম, পুরাণ গল্প, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, পরলোকের জন্য উইটিপি হওয়া—এই সব কি কর্ম্ম? আজ মাত্র দুই এক শতাব্দী গত হইল, পশ্চিম দেশ তার বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া সত্যকার কর্ম্মদীক্ষা পাইয়াছে, আর সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে সারা বিশ্বকে তারই কর্ম্মদীক্ষায় দীক্ষিত করিতে। তার এই অভিনব কর্ম্মদীক্ষা হইতে কিছু কিছু দৈবী সম্পৎ বোধ হয় লাভ হইয়াছে, কিন্তু যে পরিমাণে আসুরী সম্পৎ তাতে লাভ হইয়াছে, তার তুলনায় দৈবী সম্পৎটুকু কতটুকু? সত্যকার সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, শ্রী-সৌষ্ঠব মানুষ কতটুকু দোহন করিতে পারিয়াছে, এই অভিনব কর্ম্মদীক্ষার কল্যাণে? পুরাণে দেখিতে পাই পৃথুকে আশ্রয় করিয়া নিখিল প্রাণিবর্গ ধরিত্রী হইতে আপন আপন অন্ন দোহন করিয়া লইয়াছিল। যিনি বিস্তার করেন, তিনিই পৃথু। বীজভাবে যেটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেটাকে যিনি ফুটাইয়া ব্যক্ত করিয়া তোলেন, তিনিই পৃথু। পৃথুর এই ভাগবতী এবং শাশ্বতী তনু আমাদের ভুলিলে চলিবে না। দেশের পর দেশ, যুগের পর যুগ সেই ভাগবতী তনু আশ্রয় করিয়াই এই ধরিত্রী হইতে নিজেদের কর্ম্মার্জ্জিত এবং কর্ম্মোচিত অন্ন দোহন করিয়া যাইতেছে। এ ব্যাপারের অন্তও নাই, আদিও খুঁজিয়া পাই না। পুরাকালে ভারতবর্ষ এবং আর আর দেশ এইভাবে নিজেদের অন্ন দোহন করিয়া লইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশ এই ভাবেই আপন অন্ন দোহন করিয়া লইতেছে। সে অন্ন অমৃত না বিষ? সম্ভবতঃ উভয়ই। দোহন বা মন্থন করিতে গেলেই একটার সঙ্গে অপরটাকেও আমাদের অবশ্যই পাইতে হয়। সমুদ্র মন্থনে তাই দেখি, কেবল অমৃতভাণ্ডই উঠে নাই, বিষকুম্ভও উঠিয়াছিল। দৈত্যদিগকে বঞ্চিত করিয়া দেবতারা অমৃত-ভাণ্ডটি বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের আবার বিষকুম্ভটির গতি করারও একটা উপায় ভাবিতে হইয়াছিল। যিনি দেবতাদেরও দেবতা, যিনি মহাদেব, স্বয়ং তাঁকেই সেই বিষকুম্ভের ভার লইতে হইয়াছিল। এ রকম বন্দোবস্তটি না হইলে, কেবল অমৃতে দেবতাদের অমর হওয়া ঘটিত না। কেউ একজন ভার লইয়াছিলেন বলিয়াই, সমুদ্র মন্থনের ফলে দেবতাদের গরলে অমৃত হইয়াছিল, অমৃতে গরল হইয়া যায় নাই। এ সমুদ্র মন্থনও যে নিত্য ঘটনা! এক দিনের তরেও যে এর বিরাম নাই! পুরাকালে ভারতবর্ষ এ সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য-দেশ এই সমুদ্র মন্থন করিতেছে। এ মন্থনের দণ্ড, আধার, রজ্জু এ সবই আছে, এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখাইয়াও দিতে পারা হয় ত' যাইবে। কিন্তু সে কথা যাক। প্রশ্ন এই—হালের সমুদ্র মন্থনের ফলে মানবের ভাগ্যে গরলে অমৃত না অমৃতে গরল হইতেছে? ভোগ ও আরামের আয়োজন ত সুপ্রচুরই দেখিতেছি। মোহিনী তাঁর যাদুকরে যে সুধাভাণ্ড বাঁটিয়া দিতেছেন, সে ভাণ্ড ত' নিত্যই উপ্‌চাইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি। সুধা দিন দিন বড় উগ্র হইয়া উঠিতেছে। তার ঝাঁজে কলিজে পর্য্যন্ত জলিয়া যাইতেছে। কিন্তু পেয়ালা ভরপুর। যাদের পেয়ালা ভরপুর, তাদের আঁখি চুলু চুলু; যাদের পেয়ালা শূন্য বা গাদে ঠেকিয়াছে, তাদের আঁখির দৃষ্টি রক্তজ্বালাময়ী! সবই দেখিতেছি, কিন্তু যিনি নিষ্কাম-ত্যাগ-বপু এবং বিশুদ্ধ-জ্ঞান-বপু সেই শিবের আমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল-ভোগ-সঞ্জাত বিষে আজ বিশ্বমানব জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে না কি? বিশ্ব-সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সেই প্রচ্ছন্ন বিষের ক্রিয়া নানা দিকে নানা উৎকট অপচারের ভিতর দিয়া প্রকট হইয়া উঠিতেছে না কি? যাঁরা শুদ্ধ বিজ্ঞানের ভিতরে ডুবিয়া থাকিতে চাহেন, তাঁরাও আজ হাঁপাইয়া উঠিতেছেন এই ভাবিয়া যে, এ রকম ধারা ডুবিয়া থাকারই বা শেষ কোথায়, পরিণতি কোথায়! এ ডুবিয়া থাকা, না ডুবিয়া মরা! ছায়াটিকে ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে করিতে কায়াটির কথা আমরা একদম ভুলিয়া যাই নাই ত? প্রাচীনদের উপদেশ ছিল—আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জান। আপনাকে না জানিলে এই মহা বৃত্তের যেটি কেন্দ্র সেইটাই জানা হইল না। আর কেন্দ্রটি অজানা থাকিলে, আর সব জানা অজানারই সামিল হইয়া যায়। কেবল জানা বলিয়া কেন, পাওয়া

সম্বন্ধেও এই কথা। এই জন্য বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রসাদে অনেক কিছু জানিয়াও আমরা বোধ হয় জ্ঞানের ঠিক ফলভাক্ হইতেছি না—যে "বিদ্যয়া-অমৃতমশ্নুতে" সে বিদ্যার কৈ ত' মুখ দেখিতে পাইতেছি না! প্রাচীনেরা বলিতেন—জ্ঞানে মুক্তি। নবীন বিজ্ঞান আমাদের এই অনাদি বন্ধনের ব্যবস্থাটাকেই বিরাট্ ও নীরন্ধ্র করিয়া আমাদের দেখাইয়া দিতে চাহিতেছে। জড় আজ চৈতন্যের দীক্ষা না পাইয়া, চৈতন্যকেই আপন দীক্ষায় দীক্ষিত করিতেছে। জড়ের নমুনাতে তাই আমাদের চেতনকে ধরিতে বুঝিতে চেষ্টিত হইতে হইতেছে। যেটা মায়া, যেটা ভেল্কি, সেটা আজ সত্যের চেহারা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। প্রতিবিম্ব আজ বিম্বের প্রতি স্পর্দ্ধার বিন্ধ্যাদ্রি। ঋষিরা পূষা বা সূর্য্যের কাছে প্রার্থনা করিতেন—"হে জ্যোতির্ম্ময় দেবতা, তুমি হিরণ্ময় পাত্রে অপিহিত সত্যের আবরণ আমাদের কাছে উন্মোচন কর। আমরা সত্যের মুখ অবলোকন করি।" আর বিজ্ঞানের অন্তরাত্মার ভিতর হইতেও এই রকম ধারা একটা প্রার্থনা বা আকুতির সুর ধীরে ধীরে গুমরিয়া উঠিতেছে না কি? বিজ্ঞানের উপাস্য দেবতা আজ কি যেন একটা ছলনার মধ্যে, উপহাসের মধ্যে, আত্মগোপন করিয়াছেন। কোন্ এক অজানা বাঁশীর সুর অস্ফুট ব্যথায় এবং আশায় আজ বিজ্ঞানের কানে বাজিতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপন ময়দানবের দৃষ্টির মধ্যে আপনি দিশেহারা, পথহারা বিজ্ঞান কোন্ পথে অভিসার করিয়া তার বাঞ্ছিতের নাগাল পাইবে তা ত' জানি না! তার প্রাণে একটা অস্বস্তি ঘনাইয়া উঠিতেছে। বড় বড় হিসাবের খাতা চিবাইয়া তার গভীর মর্ম্মন্তুদ রসলিপ্সাটিকে আর কতকাল সে এমন ধারা পরিহাস করিতে পারিবে? এই ত গেল শুদ্ধ বিজ্ঞানের অবস্থা। প্রয়োগ বিজ্ঞানে যাইয়া দেখি, অবস্থা আরও কাহিল। সেখানে ব্যাঙ্ক-নোটের গাদা চিবাইয়া কলিজে ভিজানর চেষ্টা চলিতেছে। কাজের অনেক নূতন নূতন ফন্দি বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, সন্দেহ নাই। হাওয়ার উপরে মানুষ উড়িতেছে, বেতারে মানুষ গান ও অভিনয় শুনিতেছে। আরও কত কি ইন্দ্রজাল বিজ্ঞান যে সৃষ্টি করিয়াছে, তার হিসাব দিবে কে? কিন্তু সাধক রামপ্রসাদ একদিন আপশোষ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মন হারালি কাজের গোড়া।" বিজ্ঞান আজ এ-কাজ ও-কাজ হাঁসিল করিতে যাইয়া, কাজের গোড়াটাই হারাইয়া বসিয়াছে কি না, সেটা ভাবিয়া দেখার নয় কি? যাজ্ঞবল্ক্য একদিন তাঁর ব্রহ্মবাদিনী ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে অনেক কিছু বর দিবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন—যাতে ক'রে অমৃত না হব, এমন বর নিয়ে কি করব প্রভু? বালক নচিকেতা সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়া এইটাই বিশেষভাবে জানিতে চাহিয়াছিলেন। যম তাঁহাকে এটা সেটা দিয়া ভুলাইতে চাহিলেও তিনি ত' ভুলেন নাই। সকল প্রাচীন দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, এই অমৃতের সন্ধানই ছিল কাজের কথা। এ কাজের তুলনায় আর সবই ছিল বাজে। এখনকার দিনে আমরা উল্টা রাস্তা ধরিয়া ভাবিতেছি ও চলিতেছি। আমাদের জমা-খরচের খাতায় বড় বড় অঙ্ক উঠিতেছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সমস্ত অঙ্ক লাভের ভাগে পড়িতেছে, কি ফাজিলের ভাগে পড়িতেছে, তার হিসাব রাখিতেছে কে? কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে হয় ত' কোন কিছুর একটা কারখানা বানাইতেছি; কিন্তু সে কারখানায় আর যাহা উৎপন্ন হ'ক না কেন, মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি ও স্বাধীনতা যে তাহাতে উৎপন্ন হইতেছে না, সে পক্ষে কে সন্দেহ করিবে? ধরিত্রীকে যন্ত্রের লৌহ-নিগড়ে বাঁধিয়া আর যাহা কিছু আমরা দোহন করিতে পারি বা না পারি, সেই প্রাচীনদের সকল কাম্যের সেরা কাম্য—আনন্দ, অভয় ও অমৃত দোহন করিতে যে আমরা অপারগ হইতেছি, এ পক্ষেও সন্দেহ আছে কি? এটা অবশ্য ঠিক যে, ঐ যে প্রাচীনদের কাম্যের কথা বলিলাম, সেটা মানবাত্মারই চিরন্তন গভীরতম কাম্য! মানুষ তার সকল চাওয়ার ভিতর দিয়াই ঐ একটা চাওয়ারই পথ খুঁজিতেছে; তার সকল রকম পাওয়াকেও ঐ একটা পাওয়ারই সোপান রূপে গাঁথিয়া তোলার যত্ন করিতেছে। কিন্তু তার সকল চাওয়া ও পাওয়া সেই একটারই সত্য-সত্য অভিমুখেই যে হইয়াছে বা হইতেছে—এ কথা কে বুকে হাত রাখিয়া বলিবে? প্রাচীন ভারতে দেখিতে পাই, সেই চরম চাওয়া ও পাওয়াটিই সাম্‌নাসাম্‌নি কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া, স্পষ্টতঃ তারই নির্দ্দেশে এবং অভিমুখে সর্ব্ববিধ চিন্তা ও চেষ্টাকে সাজাইয়া গাঁথিয়া তোলার একটা

যন্ত্র ছিল। "অমৃতা অভূম"—এই সঙ্কল্পটাকে তাঁরা যেন আড়ালে আব্‌ডালে যাইতে দিতে রাজি নন। এই মূল সঙ্কল্পের মন্ত্রে দেখি সমস্ত বিরাট্ সভ্যতা ও বিচিত্র সাধন-পদ্ধতি, তাদের যন্ত্র যেটি, আর তাদের তন্ত্র যেটি, সেটি গড়িয়া লইতেছে। ধ্যানে যে মহাসত্যের উপলব্ধি, সঙ্কল্পে যে শাশ্বত শিবসুন্দরের বরণ, তারই আলোক দেখাইয়া দিতেছে, কোন্‌টা ঝুঁটা কোন্‌টা সাচ্চা, তারই আকর্ষণ বাছিয়া লইতেছে, সত্যকার উপাদেয়টিকে হেয়ের মধ্য হইতে। কিন্তু সব যুগে, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে, সে আলোক তেমন খোলসা ভাবে সাম্‌নে হাজির, সে আকর্ষণ তেমন সরল, স্বচ্ছন্দভাবে ক্রিয়াশীল দেখিতে পাইতেছি কি? বর্ত্তমান যুগের যিনি প্রাণ-দেবতা, তিনি, সেই উপনিষদের ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতন অকুণ্ঠিতবাণী বলিতে পারিতেছেন কি—"তেনাহং কিং কুর্য্যাম্, যেনাহমমৃতা ন স্যাম্"? বলিতে পারিলে হয় ত' জীবনটা অনেকটা সরল, সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিত। ও-দেশেও দু'চারজন আজ কা'ল বলিতে যে পারিতেছেন না, এমন নয়। কিন্তু কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে। লোকায়ত ও যুগায়ত চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতি তাঁদের কথায় কাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নাই, এমন কি, অবিশ্বাসে আর পরিহাসে তাঁদের গলা টিপিয়া ধরার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আছে।

এ দেশেও আজ এই অবিশ্বাস ও পরিহাস, বিদ্রূপ ও আক্রমণের মনোভাবটা লোকায়ত হইবার জন্য মাথা তুলিতেছে। যেন, এক অজানা অমৃতের এষণাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! চরম বা পরম গন্তব্যটিকে যাঁরা এখনও অঙ্গীকারের বাহিরে ঠেলিয়া দিতে পারেন নাই, তাঁরাও আজ সন্দিহান—ভারতের অমৃতের এষণা কি ঠিক ঠিক রাস্তাতেই হইয়াছিল? যদি হইয়াছিল, তবে ভারত আজ হাজার বছর ধরিয়া নগণ্যের অগ্রগণ্য হইয়া রহিয়াছে কেন? অমৃতের, অভয়ের, আনন্দের খোঁজে চলিয়া আজ ভারত এমনধারা মৃত্যু, দৈন্য, ভীরুতার নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া রহিল কেন? অয়নের জন্য অন্য পন্থা নেই হয় ত'—কিন্তু ভারত সে পথের রঙ্গীন ছায়াচিত্রই দেখিয়াছিল, তার সত্য, কঠোর ও বন্ধুর পরিচয় পায় নাই। আজ নানা ভুলভ্রান্তি, বিরোধ-বিপ্লব, রক্তপাত-প্রাণপাতের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান যুগ যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে, সেইটেই বোধ হয় এ পর্য্যন্ত বিশ্বমানব প্রগতির শেষ পাদপীঠ; এই পাদপীঠ হইতেই হয় ত অভিযান নূতন করিয়া সুরু করিতে হইবে সকলকেই। হয় ত' কম্যুনিষ্ট রাশিয়া যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছে, সেইখানেই আমাদের সকলের যাত্রা সুরু করিতে হইবে। কংগ্রেস আন্দোলন, নারী-প্রগতি, বিশ্ব-শ্রমিকের উত্থান, প্রাচীন সমাজধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গন—এ সকলই হয় ত সেই অবশ্যম্ভাবী আরম্ভের রেখার কাছাকাছি আমাদের লইয়া চলিয়াছে। দেশের হাওয়াটা সেই দিকেই মনে হয় বটে। কিন্তু তবু—এই প্রাচীন আর্য্য-ঋষি-মহাজন-জুষ্ট দেশের যেটি অন্তরাত্মা, সে জেরা তুলিবে—এই যে নূতন করিয়া আরম্ভ, এটা কিসের আরম্ভ—সমস্যার না সমাধানের? সমস্যার মূল গাঁটটা ভুলিয়া বা ছাড়িয়া, আশে-পাশের গাঁটগুলো ধরিয়া টানাটানি করিয়া সব তাল পাকাইয়া তুলিতে যাইতেছি না কি? অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া খেই হারাইয়া ফেলিতেছি না কি?

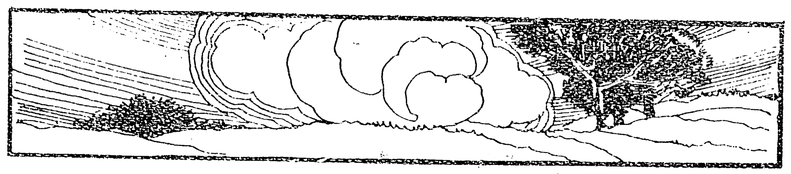

তার পর

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

৩

মায়া ও সরমা কথা কহিতেছিল বারান্দায় একটা রেলিং ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া। তাদের মাথার উপর ঝুলিতেছিল দুটো সুন্দর অর্কিডের মাঝখানে একটা পাখীর খাঁচা। অর্কিডের লম্বা বিচিত্র ফুলের আড়গুলি নামিয়া আসিয়া দুই বোনের গায় পড়িয়া খেলা করিতেছিল।

অভয় নিরুপমকে লইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিতেছে; যখন সরমা তাহা টের পাইল তখন অভয় তাদের দেখিয়া ফেলিয়াছে। সরমার ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া পলায়, কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি পলায়নটা অশোভন হইবে বলিয়া সে শান্তভাবে মাথার কাপড় টানিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অভয় স্মিত হাস্যের সহিত বলিল, "এই যে দিদি, এয়েছেন?"

মায়া অগ্রসর হইয়া অভয়কে বলিল, "তুমি দিদি দিদি ক'রে সরির মাথাটা খেলে। এতে ওর যা দেমাক হ'য়েছে তা বলবার নয়, আমাকে ও আর গ্রাহ্যই ক'রতে চায় না—যেন আমার চেয়ে কত বড়।"

নিরুপম পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাস্তবিক অভয়দা, এ তোমার ভারী অন্যায়! এতে ওঁকে অপরিচিত লোকের কাছে অপমানও তো করা হয়। লোকে ভাববে বুঝি উনি সত্যি সত্যি তোমার বড়—এ কি সহজ অপমান!"

অভয় হাসিয়া বলিল, "দেখুন তো দিদি, কি অবিচার! আপনি হ'লেন দিদি, তা' ব'লতে পারবো না?"

সরমা শান্তভাবে বলিল, "কেন ব'লবেন না অভয়বাবু, আপনার যা মন চায় তাই ব'লবেন। পরের কথায় কি যায় আসে?"

মায়া ঘাড় বাঁকাইয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "ঈস্ দরদ দেখ। আমি হ'লাম পর!—যাক গে, ঠাকুরপো এসো। তোমার পরিচয় ক'রে দি। ইনি হ'লেন আমার ঠাকুর-পো, নিরুপম—আর এ সরি।"

নিরুপম সরমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "যদিও বউদি আপনার যে পরিচয় দিলেন সেটা কোনও পরিচয়ই হ'ল না, তবু অভয়দা'র কল্যাণে আপনি আমার অপরিচিত নন। আপনার রূপ গুণের ব্যাখ্যা অনেক শুনেছি, আজ দেখে চরিতার্থ হ'লাম।"

অভয় অবাক্ হইয়া নিরুপমের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল; তার কথা শেষ হইলে অভয় বলিল, "আচ্ছা ভাই, উকীল জাতটাকে বোধ হয় ভগবান আলাদা ক'রে তৈরী করেন কথা বোঝাই ক'রে। তুমি দিব্যি অনায়াসে এই বক্তৃতাটা ক'রে গেলে কেমন ক'রে তাই ভাবছি। আমার সঙ্গে মায়ার যখন প্রথম দেখা হ'ল সেদিন যদি এমনি একটা বক্তৃতা ক'রতে পারতাম তবে আমার এত দুঃখ পেতে হ'ত না।"

অভয়ের সঙ্গে মায়ার প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সরমা ও নিরুপমের প্রথম সম্ভাষণের এই তুলনায় সরমার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। অভয়ের এই অনিচ্ছাকৃত সমালোচনায় সরমা আপনাকে এত সঙ্কুচিত বোধ করিল যে, ইহার পর তার মুখে কথা বাহির হইল না। সরমার এ বিব্রত ভাব মায়া বা অভয় লক্ষ্য করিল না—কিন্তু নিরুপম লক্ষ্য করিল।

নিরুপম একটু হাসিয়া বলিল, "কিসে আর কিসে অভয়দা—তোমার সে সময় জীবনের এক মহামুহূর্ত্ত—তেমন অবস্থায় প'ড়লে সরস্বতীও নির্ব্বাক হ'য়ে যেতেন। আমার তো সে সৌভাগ্য হয় নি।"

মায়া বলিল, "চল সবাই ঘরে ব'সবে চল। এখানে মিছামিছি ঠাকুরপোকে দাঁড় করিয়ে রাখা কেন?"

নিরুপম বলিল, "ঘরে কেন বৌদি, এখানেই বসি না। বারান্দাখানাকে যা মনোহর ক'রে রেখেছ,—যেন একটা কুঞ্জবন, এ ছেড়ে ঘরে যেতে ইচ্ছা হয় না। জান তো আমি একজন কবি।"

বলিয়া সে ঝকঝকে লাল সিমেণ্টের মেঝের উপর চাপিয়া বসিয়া পড়িল।

মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও কি, মেঝেয় ব'সছো বড়। আমি এখানে চেয়ার আনিয়ে দিচ্ছি।"

হাত তুলিয়া নিরুপম বলিল, "থাক বউদি, এমন এক-খানা কাব্যকে চেয়ার এনে পঙ্গু ক'রে দিও না, বরং তোমরাও সবাই মিলে এই মেঝের উপর ব'সে পড়, তাতেই যথেষ্ট খাতির করা হবে।"

তখন সবাই সেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

নিরুপম সরমাকে বলিল, "আপনাকে বোধ হয় কষ্ট দিলাম। আপনার বোধ হয় এই রকম বসাটা অভ্যাস নেই।"

সরমা বলিল, "না, কিচ্ছু না। আমরা এমন কত বসি।"

নিরু। যাক, বাঁচা গেল, আপনার সম্বন্ধেই আমার যা কিছু ভয় ছিল। অভয়দা আর বউদির উপর আমার অত্যাচার করবার অধিকার আছে—ওঁরা কথা কইলে ঝগড়া ক'রতে পারি। কিন্তু আপনাকে কষ্ট দিতে—এই সৌজন্যে বাধতো।"

মায়া বলিল, "স্থধু সৌজন্যে?"

নিরু। তা ছাড়া আর কি বল। আমি নিজে মেঝেয় বসে আরাম পাই, আর একজন যদি তা'তে কষ্ট পায় তবে স্বভাবতঃ তার উপর দরদ হয় না, হয় রাগ। তবে যে দুঃখ দেখাতে হয় সে শুধু সৌজন্যের খাতিরে।

সরমা কোনও কথাই বলিল না। যে অবস্থায় এই লোকটীর সঙ্গে তার আলাপ করিতে হইল তাহাতে তার মনের দুয়ারে চট করিয়া কুলুপ আঁটা হইয়া গিয়াছিল। একটা কঠোর নীরস সৌজন্যের বর্ম্মে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া সে তার সহজ সত্তাকে একেবারে অন্তরের ভিতর লুকাইয়া ফেলিয়াছিল।

কাজেই কথাবার্ত্তাটা কিছুক্ষণ চলিল কেবল নিরুপম, মায়া ও অভয়ের মাঝে, সরমা আবশ্যক মত স্থধু 'হাঁ' 'না' করিয়া বা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া গেল।

সরমার এই সঙ্কোচ নিরুপমের চক্ষে ঠেকিল। সে অনুভব করিল সরমা পণ করিয়া বসিয়া আছে কিছুতেই সে নিরুপমের কাছে আত্মপ্রকাশ করিবে না। তাই তার কেমন একটা জিদ্ ধরিয়া গেল যে তার ও খোলসটা ভাঙ্গিতেই হইবে। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সে সেইজন্য সরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আপনি না কি এম-এস্‌সি প'ড়ছেন?"

সরমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

নিরুপম জিজ্ঞাসা করিল, "আর রাজ্যের এত জিনিষ থাকতে প'ড়ছেন না কি কেমিষ্ট্রি?"

সরমা সংক্ষেপে উত্তর দিল "হাঁ।"

অভয় বলিল, "কেন, কেমিষ্ট্রি জিনিষটা এত তুচ্ছ হ'ল কিসে?"

নিরুপম বলিল, "তুমি থাম অভয়দা। তোমার পক্ষে কেমিষ্ট্রি মস্ত বড় একটা ভারি জিনিষ—তুমি তা' জন্ম জন্ম প'ড়তে থাক, তাতে জগতের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। তোমাদের মত কাটখোট্টা পুরুষ যারা, তাদের কাছে ফ্যাক্টই হ'ল চরম জিনিষ, তোমরা কেমিষ্ট্রি পড়া ছাড়া আর ক'রবে কি? কিন্তু নারীকে ভগবান গ'ড়েছেন জগতের আনন্দ সৃষ্টি ও রক্ষা ক'রবার জন্য; রসের ভাণ্ডারী হ'চ্ছেন তাঁরা, আপনি সেই নারী হ'য়ে ওই টেষ্ট-টিউবে আরক ঢালাঢালি ক'রে কি রস পান তাই ভাবছি।"

অভয় বলিল, "তুমি কেমিষ্ট্রির কিচ্ছু জান না, তাই ভাব বুঝি টেষ্ট-টিউবে আরক ঢালাঢালিই এর সব। যদি জানতে, তবে বুঝতে পারতে এর ভিতর কত রস আছে। একটা অ্যাটম যাকে বল, সেটা যে কি—"

"আরে থাম না অভয়দা, ওঁকে একটা কথা ব'লবার অবসর দাও। তুমি তো কেমিষ্ট্রির রস পাবেই, কেন না রসবস্তুটা যে কি সেইটাই তোমার মগজের আশে-পাশে আসে না। তোমার মত অকালকুষ্মাণ্ড ফ্যাক্টের উপাসক পুরুষদের মধ্যে ঢের আছে—তুমি যে এ নিয়ে বক্তৃতা ক'রতে পারবে ঢের সেও আমি জানি। কি তুমি ব'লবে সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই—আমার কৌতূহলের বিষয়টা এই যে, স্বভাবতঃ যিনি রসের উপাসিকা সেই নারী এতে কি আনন্দ পান। সেটা তাঁর মুখ থেকেই শুনি।"

সরমা বলিল, "আমার কেমিষ্ট্রি বেশ ভাল লাগে।"

অভয় আবার বলিল, "ওই শোন, তুমি যে ভাব মেয়েমানুষ হ'লেই তার বুদ্ধি হবে তাল পাকান, তাদের কথার ধোঁয়া দিয়ে চিরকাল ভোগা দিতে পারবে তা নয়। মেয়েমানুষের বুদ্ধি আছে—চর্চ্চা করলে তাঁরাও বিজ্ঞানকে অনেক দান দিতে পারেন—যেমন মাদাম কুরী দিয়েছেন।"

নিরু। "হাঁ, মাদামকুরী দিয়েছেন—কিন্তু সে তাঁর নারীত্ব ও নারীত্বের সকল সৌষ্ঠব ধ্বংস ক'রে। ভগবান কি তাঁকে নারী ক'রে সৃষ্টি ক'রেছিলেন ল্যাবরেটারীর ধোঁয়ায় জীবন নাশ করবার জন্যে—টেষ্ট-টিউবে ক'রে জীবনের রস নিঙড়ে ফেলে গ্যাসের আগুনে তাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে?"

অভয়। ভগবান যে কেন কি ক'রেছিলেন তাঁর সেই গূঢ় মতলবটা তিনি তোমার কাছে একচেটে সম্পত্তি ক'রে নাও পাঠিয়ে থাকতে পারেন। তোমরা পুরুষেরা যুগযুগান্তর থেকে কাব্যের চাপে নারীর ভিতর মনুষ্যত্বটাকে পঙ্গু ক'রে রেখে এসেছ বলেই যে ভগবানেরও তাই মতলব ছিল এ কথা বলা তোমাদের পুরুষের জবরদস্তী বই আর কিছুই নয়। প্রকৃতির যদি তেমন মতলব থাকতো তবে মেয়েছেলে ঠিক পুরুষেরই মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং পুরুষের মত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মাত না। মস্তিষ্ক যখন আছে, বিজ্ঞান গ্রহণ ক'রবার শক্তি যখন আছে, তখন তার জীবনের উদ্দেশ্য এ হ'তেই পারে না যে বিজ্ঞানের পথ, সত্যের পথ তার কাছে চিররুদ্ধ হবে।

নিরু। কিন্তু—পণ্টিয়াস পীলাতের সেই প্রশ্ন—সত্য কোনটা? ফোটা ফুলটি, না বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে তাকে কেটে ছিঁড়ে মাইক্রস্কোপের তলায় ধরবার জন্য যে টুকরা করা হ'য়েছে সেইটা? তোমরা বিজ্ঞানে সত্যকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে-ছিঁড়ে নাও, কাব্য দর্শন তাকে অখণ্ডভাবে আয়ত্ত ক'রতে চায়। পুরুষের স্বভাব সাধারণতঃ সত্যকে কেটে ছিঁড়ে গ্রহণ করবার দিকে, নারীর ঝোঁক তাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করবার দিকে। সত্যকে সমগ্রভাবে দেখলেই তা' থেকে রস পাওয়া যায়, তাই নারীহৃদয় রসে ভরপুর। কি বলেন? বলিয়া নিরুপম আবার সরমার দিকে চাহিল।

সরমা বলিল, "এ সব কথা আমি কোনও দিন ভেবে দেখি নি।"

নিরু। কিন্তু দয়া ক'রে দেখবেন একটু ভেবে। এই যে সত্যের একটা দিক, যেটা আমি মনে করি তার বড় দিক, সত্যের এই যে রসরূপ, তার দিকে একেবারে মনটাকে বিমুখ ক'রে দেবেন না। এটাও দেখুন, বুঝুন, তার পর তুলনা ক'রে বলুন কোন্‌টায় আপনার মনে বেশী সাড়া দেয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি যদি বিষয়টা ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখেন তবে কিছুতেই আপনি ব'লতে পারবেন না যে, আপনার নারীচিত্তে বিজ্ঞানের আকর্ষণ বেশী। কাব্যটাকে একেবারে অশ্রদ্ধা ক'রবেন না—আপনার কেমিষ্ট্রির বইগুলির ফাঁকে ফাঁকে অন্ততঃ এক-আধখানা কাব্য বা উপন্যাসের জায়গা রাখবেন!

মায়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে বলিল, "হ'য়েছে ঠাকুরপো, তুমি সরীকে ব'লবে তবে সে কাব্য প'ড়বে। কোন্‌টা প'ড়তে বাকী রেখেছে ও। কালিদাস তো ওর মুখে মুখে ঘুরছে, রবিবাবুর এত বড় ভক্ত আছে কি না জানি না, আর শেলী ব'লতে তো ও অজ্ঞান।"

নিরু। তাই না কি? অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন। আমি লেখা-পড়া খুব কমই জানি, কিন্তু জগতের পোনেরো আনা লোক আমার চেয়ে ঢের কম জানে ব'লে আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে সবার কাছে খুব ফয়লাও ক'রে মাষ্টারী করা—আপনার কাছেও তাই ক'রে ফেলেছি। ভাগ্যে

আপনি আমায় জেরা করেন নি, নইলে আমাকে স্বীকার ক'রতে হ'ত যে খুব কম কাব্যই আমি পড়েছি। থুড়ি—আমি নাকে খত দিচ্ছি—লেখাপড়ার কথা আপনার সামনে আর বলছি নে।

সরমা এতক্ষণে একটা লম্বা কথা বলিল। সে বলিল, "দেখুন, অতটা বিনয়ের দরকার নেই, মায়া আর অভয়বাবু আমাকে যতটা বাড়ান আমি তার দশ ভাগের একভাগ হ'লে বর্ত্তে যেতাম। ওঁদের কথা শুনবেন না আপনি।

নিরু। ওমা তাই না কি? তবে তো খাঁটি খবরটা জানা দরকার হ'চ্ছে, নইলে আপনার সঙ্গে কথা কওয়াই আমার কঠিন হবে। আপনি ওসব পড়েন নি কেমন? কালিদাস?

সরমা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "পড়েছি; সে বেশী কিছু নয়, স্থধু মেঘদূত আর শকুন্তলা—আর কুমারসম্ভবের খানিকটা।"

"সংস্কৃতে?"

"হাঁ।"

"ওরে বাপরে! তা হ'লে এইখানেই তো আপনি আমার চেয়ে তিনখানা বেশী বই পড়ে ফেলেছেন। আমি কালিদাস মোটে ছুঁই নি, কেন না আমি সংস্কৃত জানি না। আচ্ছা শেলী?"

"প'ড়েছি কিছু কিছু, খুব বেশী নয়।"

"এইবার বড় মুস্কিলে ফেললেন। আমি যে খুঁটিয়ে জিগ্‌গেস ক'রবো তারও উপায় নেই। শেলীর Skylark ছাড়া আর কোনও কবিতার নামই জানি না।"

অভয় বলিল, "আর ন্যাকামি ক'রতে হবে না। সেদিন শেলী নিয়ে আমার সঙ্গে কত কথা হ'য়ে গেল—আর উনি জানেন না।"

মায়া বলিল, "দেখ ঠাকুরপো, তোমার এই সব বিদ্যার কচকচি থামাও। কাব্য আলোচনা ক'রতে চাও আর একদিন এসো, সেদিন আমি স'রে পালাব। আজকের মত এই নিমকি সিঙ্গাড়াগুলোর আলোচনা ক'রে দেখ।"

জলখাবার আসিয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ নিরুপম অপেক্ষাকৃত স্বল্পভাষী হইয়া সেগুলির সদ্ব্যবহার করিল। তার পর সে বলিল, "আচ্ছা বৌদি, এ নিমকি সন্দেশগুলো কি তোমাদের ল্যাবরেটারীতে হয় না কি?"

মায়া বলিল, "হাঁ, অন্দরে আমার একটা ল্যাবরেটারী আছে, তাকে লোকে অসম্মান ক'রে বলে রান্নাঘর—সেইখানে হ'য়েছে।"

নিরুপম বলিল, "দেখ দেখি অভয়দা, মেয়েছেলেদের তাদের স্বভাব অনুসারে কাজ ক'রতে দিলে কি খাসা জিনিষ তৈরী করে। ঘি চিনি ছানা ময়দা নিয়ে কি সব জিনিষ হয়। আর ঠিক সেই জিনিষ যদি তোমার ল্যাবরেটারীতে যায়, তবে তোমার প্রথম কাজ হবে ঘিটাকে বাষ্প ক'রে উড়িয়ে দেওয়া, চিনি আর ময়দাটাকে কয়লার গুঁড়ো ক'রে ফেলা, আর ছানাটাকে টেষ্ট-টিউবে পুরে কতকগুলো অখাদ্য আরক দিয়ে তার স্বাদ নষ্ট করা। মেয়ের কাজ আর পুরুষের কাজে এই তফাৎ।"

নিরুপম অনেক বকিল, অনেক প্রশ্ন করিল, কিন্তু সরমার অন্তরের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিতে পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত সরমা ঐ 'হাঁ' 'না'র বেশী কোনও কথাই বলিল না। তখন সে নাচার হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

উঠিবার সময় নিরুপম বলিল, "আজ আলিপুরে খুব একটা sensation হ'য়ে গেছে। একটা পুরোণো জোচ্চোর হঠাৎ ধরা পড়েছে। অজয় রায় ব'লে একটা জোচ্চোর অনেকদিন থেকে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল—"

সকলেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। নিরুপম বলিয়া গেল, "সে ধরা প'ড়েছে।"

অভয় ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ধরা প'ড়েছে? কোথায়?"

নিরুপম বলিল, "টালিগঞ্জেই সে ছিল, বেশী দূর যায় নি। ভোল ফিরিয়ে পাঞ্জাবী সেজে ছিল। আজ তাকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছিল আলিপুরে।"

অভয় জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর? জামিন দিয়েছে?"

"অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর হাকিম পাঁচ হাজার টাকা জামিনে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে জামিন দিতে পারে নি।"

অভয় ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সে কি? আমাকে খবর দিলে না কেন? আমি জামিনের ব্যবস্থা ক'রতাম।"

"সে কি? তুমি তাকে চেন নাকি?"

অভয় বলিল, "চিনি, আচ্ছা—এখন জামিনের ব্যবস্থা হ'তে পারে?"

নিরুপম বলিল, সে ঠিক বলিতে পারে না। কিন্তু

আলিপুরের একজন পুরাতন উকীলের নাম করিয়া বলিল যে, তিনি হয় তো চেষ্টা করিলে করিতে পারেন।

অভয় অবিলম্বে নিরুপমকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

মায়ার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না।

সরমা বিশেষ কোনও উদ্বেগ অনুভব করে নাই, আর মায়াও যে এ সংবাদে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবে এ-রকম সে অনুমান করে নাই, তাই সে মায়ার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না।

অনেকক্ষণ পর মায়া বলিল, "গেল আবার কতকগুলো টাকা ঢালতে ঐ অপদার্থ টার জন্যে!"

সরমা বলিল, "তা দোষ কি ভাই? হাজার হ'লেও একদিন ও আমাদের বন্ধু ছিল—ওর বিপদের দিনে একটু সাহায্য করা দোষের নয়।"

"তা নয় ভাই। আসল কথা কি জানিস? ওর মনে মনে এখনও বিশ্বাস যে, অজয়কে আমি সত্যি সত্যি ভালবাসতাম। তার বিপদে আমার কষ্ট হবে ব'লেই ও এত ব্যস্ত হ'য়েছে।—কি অন্যায় দেখ্ দেখি। বেটা ছেলেরা মেয়ে মানুষের মন কিচ্ছু যদি বুঝতে পারে।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "তা বুঝতে যদি একটু কষ্ট হয় তবে ওদের তো দোষ দেওয়া যায় না। তুই নিজেই বা কোন তোর মন বুঝেছিলি। কি খেলাটাই যে ক'রেছিলি তোর মন নিয়ে তা' কি ভুলে গেছিস্?"

মায়া চুপ করিল।

ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, মায়া তাড়াতাড়ি শুইবার ঘরে ছুটিয়া গেল। সরমা সঙ্গে সঙ্গে গেল।

শিশুকে শান্ত করিয়া অনেকক্ষণ পর মায়া বলিল, "আর সে হতভাগা পালালই যদি, তবে টালিগঞ্জে ম'রতে গেল কেন? দূর দেশে পালিয়ে গেলেই তো পারতো!"—সরমা এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

ঘণ্টাখানেক বাদে অভয় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল অনেক চেষ্টায় জামিনে অজয় খালাস হইয়াছে। অভয় তাকে এখানে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সে কিছুতেই আসিল না।

মায়া তীব্রস্বরে বলিল, "তাকে আবার এখানে আসতে বলেছিলে কি ক'রতে? অমন লোককে—কি যে কর তুমি!"

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি অপরাধ ক'রেছেন অজয়বাবু?"

অভয় বলিল, "কি ক'রেছেন ভগবান জানেন, কিন্তু তাঁর নামে একটা মোকদ্দা হ'য়েছে। একটা মাড়োয়ারী নালিস ক'রেছে যে সে চুরী ক'রেছে। মোকদ্দমার কথাটা আমার কাছে ভারী আশ্চর্য্য লাগলো—হীরালাল আগরওয়ালা নালিস ক'রেছে যে অজয় তার স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে হীরা জহরতের গয়না দেখ্‌তে গিয়েছিল। অনেক গয়না তাকে নেড়ে চেড়ে দেখান হ'য়েছিল। তার পর একখানা গয়না খোয়া গেছে দেখা যায়। পরে অজয় সেই গয়না অন্যের কাছে বেচেছে।"

মায়া বলিল "অ্যাঁ!"—তার মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তার পরই সে আত্মসংবরণ করিয়া সংযত হইয়া বসিল।

সরমা বলিল, "অজয়বাবুর স্ত্রী!"

অভয় বলিল, "তাই তো ভাবছি। ব্যাপারটা কি একবার তলিয়ে দেখতে হবে। পরশু তার মোকদ্দমার তারিখ আছে, ভাবছি একবার যাব।"

মায়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর যখন সরমা গাড়ীতে উঠিতে গেল তখন মায়া তার সঙ্গে গিয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ সরমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "সরি!"

সরমা বলিল, "কি ভাই?"

অনেকক্ষণ মায়া চুপ করিয়া রহিল, কিছু বলিতে পারিল না। তার পর সে বলিল, "কিচ্ছু না।"

সরমা তাহাকে ছাড়িল না। সে বলিল, "তুই আমাকে কি একটা কথা লুকোচ্ছিস—একটা খুব কষ্ট আছে তোর মনে। আমাকে ব'লতে হবে সে কথা, আমি ছাড়বো না।"

মায়া কাঠের মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর সে বলিল, "না, আমি ব'লতে পারবো না।"

সরমা মায়াকে সেইখানে রাখিয়া অভয়ের কাছে গিয়া বলিল, "অভয়বাবু, মায়াকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, এই গাড়ীতেই ফিরবে—কি বলেন?"

অভয় বলিল, "এ আবার আমায় জিগ্‌গেস ক'রতে হবে?"

সরমা মায়াকে টানিয়া মোটরে তুলিল। তার পর দুই বোনে চলিল বালীগঞ্জে, সরমার বাড়ী। পথে কেহ কোনও কথা বলিল না।

সরমা তার শুইবার ঘরের ভিতর মায়াকে লইয়া বসাইল।

অনেকক্ষণ সাধ্যসাধনার পর মায়া বলিল, "তোকে ব'লে কোনও লাভ নেই ভাই। ব'লে কি আর হবে। আমার বিষ খেয়ে মরা ছাড়া উপায় নেই।"

"কেন ভাই? কি এমনটা হ'য়েছে যাতে বিষ খেয়ে মরতে হবে? আমাকে বল না খুলে—দেখি দুজনে ভেবে কোনও উপায় ক'রতে পারি কি না?"

মায়া কাঁদিয়া ফেলিল, "কি আর বলবো ভাই? আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ক'রেছি। তুই এত ক'রে নিজের যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে আমায় রক্ষে ক'রতে চেষ্টা করলি, তাও সব পণ্ড ক'রে দিলাম আমি!"

সরমা একটু ভাবিয়া বলিল, "ঐ হীরালাল আগড়-ওয়ালার কাছে তুই গিয়েছিলি তার সঙ্গে?"

মায়া সরমার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "হাঁ—ভাই—আমিই সেই পোড়ার মুখী।" বলিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সরমা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। এখন তার কাছে সমস্ত কথাটা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রমাণে কথাটা যদি প্রকাশ হইয়া যায় যে, মায়া অজয়ের সঙ্গে গিয়াছিল এবং সে অজয়ের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল—তবে সে যে অজয়ের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া ঐ গহনা সরাইয়াছিল সে বিষয়ে লোকের সন্দেহ থাকিবে না। আর চুরীর সঙ্গে যদি তাকে লোকে নাই জড়ায় তবু তো এ কথাটায় তার এক হাট লোকের সামনে মাথা কাটা যাইবে!

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে তুই এ সব ক'রলি?"

চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে মায়া বলিল যে অজয়ের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হইয়া যাইবার পর একদিন মায়া তার পিতার সঙ্গে এক জায়গায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। কান্তিবাবুর বিশেষ প্রয়োজনে সেখানে বেশীক্ষণ থাকিতে হওয়ায় তিনি মায়াকে বাড়ী ফিরিতে বলেন। অজয়ও সেখানে গিয়াছিল, সে মায়ার সঙ্গ ধরিল। ফিরিবার পথে অজয় বলিল, "চল আমার এক বন্ধুর দোকানে তোমাকে নিয়ে যাই—সেখান হ'য়ে বাড়ী যাবে।" মায়া আপত্তি করিল না। তখন অজয় তাকে লইয়া হীরালাল আগরওয়ালার দোকানে গেল। হীরালাল তার পূর্ব্ব-পরিচিত ছিল, অজয় গিয়াই সেখানে মায়াকে তার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় করিয়া দিল। তখন মায়া তাতে কোনও আপত্তির কারণ দেখিতে পায় নাই, কেন না সে তখন অজয়ের বাগ্দত্তা। নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য মায়া বেশ ভাল করিয়া সাজিয়া গিয়াছিল, তার গায় কিছু হীরার গহনাও ছিল।

অজয় হীরালালকে বলিল, "এঁকে হীরার নেকলেস একটা দেখাও তো ভাই।"

হীরালাল মায়াকে আদর করিয়া বসাইয়া অনেকগুলি দামী হীরার গহনা দেখাইল—একটা আলমারী খুলিয়া সে তাকে ও অজয়কে দেখিতে দিল। মায়ার ইহা ভাল লাগিল না, কেন না সে তখন জানে যে অজয়ের তখন হীরার গহনা কিনিবার অবস্থা নয়। এই মিথ্যা আড়ম্বরে সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। অনেকক্ষণ পর হীরালাল তার গহনাপত্র গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল। অজয় যে ইতিমধ্যে কোনও গহনা সরাইয়াছে এ সংবাদ মায়া কোনও দিন জানে না, জানিলে তখনই একটা এস্পার ওস্পার হইয়া যাইত।

সমস্ত কথা শুনিয়া সরমা বলিল, "এতে এত ব্যস্ত হ'চ্ছিস কেন?"

মায়া চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "বলিস কি? আমার নামে আদালতে প্রকাশ হ'য়ে যাবে যে আমি আর একজন পুরুষের স্ত্রী ব'লে নিজেকে পরিচয় দিয়েছি—আর—আমার যে ভাবতেই ম'রে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। তা' ছাড়া উনি কি ভাববেন বল দেখি?—ভাববেন না জানি আরও কত ঢলাঢলি ক'রেছি আমি!—মরা ছাড়া উপায় নেই আমার।

"এই যে সর্ব্বনেশে কাজ ক'রে রেখেছি আমি এই কথা ভেবে ভেবে বিয়ের পর থেকে আমার ভাবনার সীমা নেই। যখন উনি আমায় আদর করেন তখন এই কথা মনে হ'য়ে আমার শরীর হিম হ'য়ে ওঠে। ভাবি যদি উনি একদিন টের পান যে এত বড় বেহায়াপণা ক'রেছি

আমি, তবে কি ভাববেন উনি। এতদিন ও পাপিষ্ঠ ছিল না, অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। ও ধরা প'ড়েছে শুনেই আমার মনে হ'য়েছে আমার মরণ ঘনিয়েছে।"

সরমা বলিল, "সে সব বুঝলাম, কিন্তু আদালতে যে তোর নামে এ কথাটা প্রকাশ হবেই তা' ভাবছিস কেন?"

মায়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এ না হ'য়ে যায় না।"

সরমা জোর করিয়া বলিল, "আমি এ কিছুতেই হ'তে দেব না। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"

"কেমন ক'রে বারণ করবি তুই?"

"যেমন ক'রে হোক—আমি যা পণ করি তা' না ক'রে ছাড়ি না, তা দেখেছিস তো তোর বিয়ের বেলায়।"

ম্লানমুখে মায়া বলিল, "তাতে আর এতে! এ তো ঘরের কথা নয়, আদালতের কথা।"

"হোক আদালতের কথা—দেখিস আমি কি করি।"

শঙ্কিতচিত্তে মায়া বলিল, "তোর কথা শুনে ভাই ভরসা হ'চ্ছেও, হ'চ্ছেও না। কি রকম ক'রে যে তুই কথাটা চাপা দিবি, আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছি নে। আমার মনে হ'চ্ছে পারবি নে তুই।"

"পারবো আমি। তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরে যা। আর যে পর্য্যন্ত না আমি তোকে বলবো যে আমি পারলাম না, সে পর্য্যন্ত তুই এ কথা অভয়বাবু বা আর কাউকে বলবিনে প্রতিজ্ঞা কর।"

"আমি ব'লবো আর কাউকে—অসম্ভব! তার আগে ব্যারেটারী থেকে খানিকটা বিষ নিয়ে খেয়ে ব'সবো।"

"কিন্তু তাও তুই করবি নে, আমার গা ছুঁয়ে বল।"

"আচ্ছা, বলছি ক'রবো না। কিন্তু যদি কথাটা প্রকাশ হ'য়ে যায় ভাই, তবে আর আমাকে ঠেকাতে পারবি নে।"

মায়া ইহার পর অনেকটা সুস্থ চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

৪

মায়া চলিয়া গেলে সরমা অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। অনেক রকম মতলব তার মাথায় খেলিয়া গেল, কিন্তু সে কোনও বুদ্ধিই পাকা করিয়া স্থির করিতে পারিল না।

পরের দিন রবিবার—সোমবার দিন অজয়ের বিচার আরম্ভ হইবে। এই একটা দিনের মধ্যে তার সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। সে সকালে উঠিয়াই গোঁজ হইয়া ভাবিতে লাগিল।

সুনীতি মেয়ের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি বলিলেন, "তোর হ'ল কি সরি? কি ভাবছিস?"

সরমা বলিল, "একটা লোকের নামে একটা মোকদ্দমা ক'রতে হবে তাই ভাবছি মা।"

"কিসের মোকদ্দমা?"

"সে সব তুমি বুঝবে না মা। বিষয় থাকলে মোকদ্দমা ক'রতেই হয়।"

"তা পোড়ারমুখী, তুই মেয়েছেলে হ'য়ে অত ভাবনা ব'য়ে মরিস কেন? বিয়ের বয়েস তো হ'য়েছে—বিয়ে থা' ক'রলেই তো এ-সব ভাবনা যার, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারিস।"

হাসিয়া সরমা বলিল, "কেন মা, এতগুলো পাশ দিলাম আমি, তবু কি একটা বেটাছেলের মত বুদ্ধি হয় নি আমার - এই বুদ্ধিটুকুও হয় নি যে, বিষয় আসয় দেখে রেখে চালিয়ে নিতে পারবো। আর দেখ গে না মায়াকে। অভয়বাবু তো তার বিষয় দেখে খুব—দেখছে তো মায়া।"

"কি জানি বাপু, এ-সব ছিষ্টিছাড়া কথা আমি জানিও না, বুঝিও না।"

সরমা তার বাড়ীর আধখানা ভাড়া দিয়াছিল, আর আধখানায় তারা মা-মেয়েতে থাকিত। সদরের ফটকটা ছিল ভাড়াটিয়ার, সরমার নিজের অংশের জন্য সে একটা স্বতন্ত্র ফটক করিয়া লইয়াছিল।

সেই ফটক দিয়া একটি ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়িয়া প্রবেশ করিল।

ঘোড়া হইতে নামিয়া সে ভদ্রলোক হাট খুলিয়া বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। সরমা দেখিয়া চিনিল—নিরুপম।

সরমা মনে মনে হাসিল। তার মনে হইল কাল বৈকালে দেখা হইবার পরই আজ সকালে যখন এ ব্যক্তি এতদূরে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে সরমার রূপবহ্নিতে পতঙ্গের মত পুড়িতে আসিয়াছে। তাই সরমা মনে মনে হাসিল, একটু বিরক্তও হইল।

সরমা নিরুপমকে স্মিতমুখে সম্ভাষণ করিয়া বসাইল। বলিল, "আপনি যে এতদূর এসেছেন এই সকালে?"

নিরুপম সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আমি প্রায়ই আসি বালিগঞ্জে ঘোড়ায় চড়বার জন্য। এটা আমার অনেক দিনের বাতিক। আজ ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে যাই। অপরাধ ক'রেছি কি?"

সরমা সৌজন্যের সহিত বলিল, "কিছুমাত্র নয়।" তার পর সে তার মাকে বলিল, "মা ইনি মায়ার দেওর নিরুপমবাবু, আলিপুরের উকীল।"

সুনীতি বলিলেন, "এসো বাবা এস। তোমাকে এতদিন তো দেখিনি কখনও।"

নিরুপম বলিল, "এতদিন আমরা এ দেশে ছিলাম না। বাবা পশ্চিমে থাকেন সেইখানেই ছিলাম। কিছুদিন হ'ল এখানে এসেছি, প্র্যাকটিস ক'রতে।"

সুনীতি তার পরিবারস্থ প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর বিস্তৃত পরিচয় ও ইতিহাস সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া শেষে নিরুপমকে কিছু আহার করিতে অনুরোধ করিলেন।

নিরুপম বলিল, "দেখুন, আপনার মেয়ে জানেন যে খাবার জিনিষটার উপর আমার লোভের অন্ত নেই। কিন্তু এখন আমার খাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বরং অনুমতি করেন তো আর একদিন এসে খেয়ে যাব।"

সুনীতি বলিলেন, "তা বেশ বাবা, বেশ, কালই এসো না, কাছারীর ফেরত—চা খেয়ে যেও।"

হাসিয়া নিরুপম সরমাকে বলিল, "কি বলেন? প্রস্তাব মন্দ নয়!"

সরমা বলিল, "বেশ তো, আসবেন, চা খেয়ে যাবেন।"

সুনীতিকে নিরুপম বলিল, "সুধু কালকেই? না পরেও আসা চ'লবে?"

সুনীতি। ওমা সে কি কথা! যখন খুসী তুমি আসবে।

নিরুপম। আর এলেই খেয়ে যাব। কেমন? পাকা standing নেমন্তন্ন রইলো। তবে এখন উঠি।

হঠাৎ সরমা বলিল, "দেখুন, আপনাকে দিয়ে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে।"

নিরুপম উঠিতেছিল, বসিয়া বলিল, "খুব আশ্চর্য্য কথা, আমার মত অকেজো লোককে দিয়েও দরকার থাকতে পারে কারো। বেশ, হুকুম করুন।"

সরমা নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল, "দরকার ঠিক নয়, একটা কথা জানবার আছে। কাল থেকে কথাটা আমার মাথায় ঘুরছে। কাল যে আপনারা ঐ অজয় রায়কে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে এলেন, ও ব্যাপারটা কি আমি বুঝতে পারি নি। লোককে জেলে নিয়ে গেলে আবার তাকে টাকা দিয়ে খালাস করে কেমন ক'রে?"

"ও, এই কথা—এটা বুঝি আপনার অদম্য জ্ঞান-পিপাসার একটা পরিচয়! এর উত্তর বুঝতে আপনার কেমিষ্ট্রির বিদ্যার প্রয়োজন হবে না। কথাটা এই যে, বিচার হ'য়ে যদি কারও কয়েদ হয় তবে তার খালাস হয় না। কিন্তু বিচার শেষ হবার আগে যখন আসামীকে ধরে, তখন হাকিম তাকে জেলে রাখতে পারেন কিম্বা জামিনে ছেড়ে দিতে পারেন, যে পর্য্যন্ত না বিচার শেষ হয়।"

সরমা। কিন্তু জামিনে ছেড়ে দেওয়া মানে কি?

"একজন অন্য লোক যদি আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে হাজির ক'রে দেবার জন্য দায়ী হয় তবে তাকে জামিন হওয়া বলে।"

"ও—কিন্তু যদি তার পর আসামী পালিয়ে যায়?"

"তবে যে হতভাগ্য তার জন্য জামিন হ'য়েছিল তার টাকাটা মারা যায়।"

"টাকাটা আবার কিসের?"

"জামিনের। যে, জামিন হয় তাকে একটা প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে দিতে হয় যে সে আসামীকে বিচারের তারিখে হাজির ক'রে দেবে। যদি না দেয় তবে সে এত টাকা দণ্ড দেবে। অজয় বাবুর যে জামিন হ'য়েছে সে যেমন পাঁচ হাজার টাকার জামিন হ'য়েছে—অজয় যদি হাজির না হয় তবে তার পাঁচ হাজার টাকা দণ্ড যাবে।"

"সুধু এই—তাকে জেলে দেবে না?"

"না জেলে দেবে কেন? সুধু জামিন জব্দ ক'রে টাকা আদায় ক'রবে।"

"তবে তো অভয়বাবু ভারী অন্যায় ক'রেছেন। অজয় পালালে তাঁকেই তো পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে!"

"তা' হবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ও আর পালাবে না।"

"যদি পালায়! আপনারা তো জানেনও না সে কোথায় গেছে। সে যদি এতক্ষণ পালিয়ে থাকে।"

"জানবো না কেন? আমরা তাকে তার বাসায় রেখে তবে ফিরেছি।"

"আমি ঠিক ব'লছি সে এতক্ষণ পালিয়েছে। বাজী ফেলুন আপনি।"

"বাজী ফেলতে পারি না, কিন্তু এতটা নিমকহারামী ক'রবে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।"

"আচ্ছা নেই ফেললেন বাজী। চলুন দেখে আসি—কার কথা সত্যি—আমি বলছি সে কক্ষণও সেখানে নেই। চলুন, আছে কি না দেখে আসি।"

নিরুপম সানন্দ চিত্তে এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। সরমার মালী নিরুপমের ঘোড়া Riding Schoolএ লইয়া গেল। সরমার নিজের একখানা মোটর ছিল, কিন্তু তাহা মিস্ত্রীখানায় গিয়াছিল, তাই সে ট্যাক্সি করিয়া চলিল।

ট্যাক্সি করিয়া নিরুপমের সঙ্গে একলা যাইতে সরমার একটু সঙ্কোচ বোধ হইল, নিরুপমের চিত্তও এই সহযাত্রা বিষয়ে মোটেই নির্ব্বিকার ছিল না। প্রথমটা দুজনেরই এতটা বাধ বাধ ঠেকিল যে, কেউ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারিল না। এই অশোভন নীরবতায় তাদের দুজনেরই চিত্তের সঙ্কোচ বাড়াইয়া দিল।

সরমা স্থির দৃষ্টিতে গাড়ীর সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিরুপম তার পাশে অনেকটা তফাতে বসিয়া বাহিরের দিকেই চাহিয়া রহিল, কিন্তু এক একবার অপাঙ্গে তার পার্শ্ববর্ত্তী সুন্দরীর দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে নিরুপম বলিল, "দেখুন, এই অজয়ের সঙ্গেই বউদির বুঝি বিয়ের কথা হ'য়েছিল?"

সরমা ইহার সোজা উত্তর দিতে পারিল না—সে বলিল, "কে বল্লে?"

"কাল ফেরবার সময় অভয়দা ব'লছিল।"

সরমা বলিল, "হাঁ হ'য়েছিল কথা, কিন্তু সে একেবারে বাজে কথা। মায়ার ওঁকে বিয়ে করবার একটুও ইচ্ছা ছিল না।"

নিরুপম বলিল, "কি সর্ব্বনাশ হ'ত তা' হ'লে বলুন তো?"

সরমা একটু হাসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ আর এমন কি হ'ত। সবই সয়ে যেতো। বাঙ্গালীর মেয়ের না সয় কি?"

"কিন্তু স'য়ে যাওয়াটাই তো আরও বেশী সর্ব্বনাশের কথা হ'ত। সয়ে' যাওয়া মানে হ'চ্ছে একটা অমূল্য জীবন ব্যর্থতার চাপে মারা যাওয়া। তার চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ মানুষের আর কি হ'তে পারে বলুন।"

"অথচ তাই সবারই হ'চ্ছে দিন রাত। হাসিমুখে যারা সংসারে ঘোরা-ফেরা ক'রছে, আমার মনে হয় তার মধ্যে শতকরা নিরেনব্বই জন জীবনভরা ব্যর্থতার বোঝা ব'য়ে বেড়াচ্ছে। এমনি ক'রে সেই বোঝা হাসিমুখে সইতে পারবার মধ্যে একটা বীরত্ব আছে ব'লে আমার মনে হয়।"

নিরুপম বলিল, "আমি সে বীরত্বের ভক্ত নই। সইবার বীরত্বটা কাপুরুষতার নামান্তর। অন্যায় বা অত্যাচার বা ব্যর্থতা যা' কিছু অদৃষ্টে থাকুক সেটাকে সহ্য না ক'রে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাই আমি বড় বীরত্ব মনে করি।"

সর। কিন্তু তাতে প্রায়ই লাভের মধ্যে সুধু জীবনটা ছারখার হ'য়ে যায়, আর কিছুই হয় না।

"হোক জীবন ছারখার। কিন্তু লড়াই ক'রে যাক নষ্ট হ'য়ে, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু মুখ বুজে পৃথিবীর বা ভগবানের অত্যাচার স'য়ে স'য়ে যাওয়া—Jobএর ধর্ম্ম যেটা—তার ভিতর না আছে সার্থকতা না আছে আনন্দ!"

সরমা বলিল, "আমার মনে হ'চ্ছে আপনার জীবনে আপনি ব্যর্থতার আস্বাদ তেমন ক'রে পান নি। এমন কিছুই আপনি জীবনে প্রাণ-মন দিয়ে কখনও হয় তো চান নি, যা না পেয়ে আপনার জীবনটা ব্যর্থ মনে হ'য়েছে।"

"বোধ হয় তাই। জীবনে হতাশ কখনও হইনি এ কথা ব'লতে পারি না, কিন্তু সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে বোধ হয় কোনও দিন কোনও জিনিষ আমি তেমন ক'রে চাই নি। সে-রকম ক'রে চাওয়াটা বোধ হয় আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ—তেমন ক'রে চাইবার মত মনের একাগ্রতাই বোধ হয় আমার নেই।"

"তার মানে এই যে আপনি এখনও প্রাণ-রসে ভরপুর।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণশক্তির জোর খুব বেশী থাকে, ততক্ষণ লোকে চঞ্চল হ'য়ে ছুটেই বেড়ায়। হোঁচট খেয়ে যদি পড়ে, তবে অমনি উঠে আবার ছোটে। হোঁচটের ঘা'টা লাগেই না। যাদের ভিতর প্রাণটা অত প্রবল নয় তারা প'ড়ে গেলে ব'সেই পড়ে।"

হাসিয়া নিরুপম বলিল, "অর্থাৎ আপনি খুব ভদ্রভাবে এই কথাটা ব'লতে চান যে আমি অতি হালকা লোক! তা কিন্তু আমি নই।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "যার যেখানে দুর্ব্বলতা আছে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে সেখানকার সেই দুর্ব্বলতাটাই খুব জোর ক'রে অস্বীকার করে।"

নিরুপমের মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "সে ভাবতে পারেন আপনি, কিন্তু আমার আশা আছে যে একদিন আপনাকে আমি বিশ্বাস করাতে পারবো যে আমি মোটেই হালকা লোক নই।—এই ড্রাইভার থাম।"

তারা রসা রোডের উপর টালিগঞ্জের কাছাকাছি একটা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপম ও সরমা গাড়ী হইতে নামিল। সরমা নিরুপমের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই ট্যাক্সি-ভাড়া মিটাইয়া দিল।

নিরুপম একটা টিনের চালার ঘর দেখাইয়া বলিল, "এইখানে অজয়বাবু থাকেন। সে একটা দোকান ঘর; তাতে মোটরের পেট্রল তেল টায়ার টিউব প্রভৃতি সাজান আছে। তার পশ্চাতে একটা খোলা জায়গা; তাতে আর একটা চালায় কিছু যন্ত্রপাতি আছে; আর সামনে খোলা জায়গায় দু'খানা মোটর পড়িয়া আছে।"

সরমা চাহিয়া দেখিল দোকানের ভিতর ময়লা কাপড় ও জামা পরিয়া আস্তিন গুটাইয়া একটি লোক একটি ছোকরার সাহায্যে একখানা মোটরের চাকায় টায়ার পরাইতেছে। তার মুখ চোখ দীনতায় ভরা, চেহারা অপরিচ্ছন্ন, দাড়ি গোঁফ প্রচুর পরিমাণে আছে এবং তার মাথার চুল শিখদের মত লম্বা হইয়া তার পিঠের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে। প্রথমে সরমা তাকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু নিরুপম বলিল, "ঐ অজয়।"

তখন সরমা তার চোখের দিকে চাহিয়া অজয়কে চিনিল। তাকে দেখিয়া সরমার মনের ভিতর একটা বিষম ধাক্কা লাগিল। একদিন বেশের পারিপাট্য ছিল অজয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—তাহার উপর সে প্রতিষ্ঠিত করিত তার কালচারের দাবী। যারা বেশভূষায় অপরিচ্ছন্ন, তাদের প্রতি অজয়ের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার অবধি ছিল না। তার পর মাত্র তিনটি বৎসর গিয়াছে—ইহারই মধ্যে অজয় হইয়াছে এই!

সরমা নিরুপমকে বলিল, "যাক বাঁচা গেল। এ দোকানটা কি ওঁরই না কি?"

নিরুপম। হাঁ। অজিৎ সিং নাম দিয়ে পাঞ্জাবী সেজে উনি এই দোকানখানা ক'রেছেন।

সরমা। তা' হ'লে বোধ হয় চট ক'রে দোকান ছেড়ে পালাবে না। আপনারই জিত হ'ল তবে।

নিরুপম। আপনি যাবেন ওর কাছে?

সরমা বলিল, "থাক, আমি আর গিয়ে কি ক'রবো? আমি এখন বাড়ী ফিরি, আপনিও বাড়ী যান, অনেক বেলা হ'য়েছে।"

"আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।"

"না, না, আমি আপনি যাব, আপনি বাড়ী যান।"

অগত্যা নিরুপম বাড়ী ফিরিবার জন্য একটা বাসে চড়িল।

সরমা খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া নিরুপমের বাস যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, তখন আবার অজয়ের দোকানের দিকে ফিরিল।

তখন অজয়ের টায়ার লাগান শেষ হইয়াছে। সে উঠিয়া একটা গামছা দিয়া তার কপালের ঘাম মুছিতেছে।

সরমা দোকানে ঢুকিয়া ডাকিল, "অজয় বাবু!"

অজয় তাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি! আপনি এখানে!"

সরমা শান্তভাবে বলিল, "হাঁ, আপনার কাছে এসেছি, বিশেষ দরকার আছে আপনার সঙ্গে।"

অজয় নিজের বেশভূষার দিকে একবার চাহিল। নিজের বেশের দৈন্যে যে সে সঙ্কোচ বোধ করিল, তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল।

সরমা বলিল, "এখানে কোথাও আপনার সঙ্গে নিরিবিলি কথা কওয়া যাবে কি?"

অজয় বলিল, "এখানে আপনাকে ব'সতে দি এমন কোনও জায়গা আমার নেই"—

"আমি এইখানেই ব'সছি।" বলিয়া সরমা একটা কাঠের বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। অজয় অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

"আপনার এই ছোকরাটিকে তবে একটু বাইরে যেতে বলুন।"

অজয় তার ছোকরাকে ভিতরে পাঠাইয়া দিল।

সরমা তখন তাকে মৃদুস্বরে বলিল, "দেখুন আপনাকে আবার পালাতে হবে।"

বিস্মিত হইয়া অজয় বলিল, "সে কি? আমি পালাব কেমন ক'রে?—আর পালিয়ে লাভই বা কি? পালাব, আবার শেষে ধরা প'ড়বো। তাড়া খাওয়া কুকুরের মত পালিয়ে বেড়াতে আর আমি চাইনে। তার চেয়ে শাস্তি যা' হবার, একবার হ'য়ে যাক!"

"একবার ধরা প'ড়েছেন ব'লেই আবার প'ড়বেন তার কোনও মানে নেই। বিদেশে কোথাও চ'লে যান যেখানে ধরা প'ড়বেন না।"

অজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, আমি পালাব না।"

"আপনি অভয় বাবুর টাকা নষ্ট হবে ব'লে ভাবছেন? সে ভাবনা ক'রবেন না। অভয় বাবুর যে টাকা লোকসান হবে তাতে তাঁর লাভই হবে। আপনি পালান।"

অজয় বলিল, "দেখুন, আমাকে অনুরোধ ক'রবেন না।—আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছি। আমার অপরাধের শাস্তি আমি গ্রহণ ক'রবো। আমাকে দয়া ক'রে পালাতে অনুরোধ ক'রবেন না।"

সরমা বলিল, "আপনি সুধু আপনার কথা ভাবছেন—আর একজনের কথা ভাবছেন না। আপনার মোকদ্দমা যদি চলে তবে মায়ার কি সর্ব্বনাশ হবে ভেবে দেখেছেন?"

অজয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল। তার পর সে বলিল, "হুঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তিনি যে আমার সঙ্গে ছিলেন সে কথা তো কেউ জানে না।—সে কথা প্রকাশ হবে না।"

"কিন্তু যদি প্রকাশ হ'য়ে যায়!"

অজয় কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "দেখুন, আপনার ভগ্নীকে রক্ষা ক'রবার জন্য আমার যা' ক'রতে হয় ক'রবো। আমি এখনি যাচ্ছি আমার উকীল বাড়ী। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা' করা দরকার হয় কাল ক'রবো।"

"কিন্তু উকীল কি বলেন তা' আমি জানবো কেমন ক'রে?"

একটু স্তব্ধ থাকিয়া অজয় বলিল, "আচ্ছা সে খবর আমি আপনাকে বৈকালে দিয়ে আসবো—আপনি আছেন কোথায়?"

"সেই বাড়ীতেই—সেখানা মামা আমাকে দিয়ে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা, বেলা তিনটার সময় আমি আপনাকে খবর দিয়ে আসবো।"

সরমা বাড়ী ফিরিল; কিন্তু সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। আহারাদির পর সে ভাবিয়া চিন্তিয়া হীরালাল আগরওয়ালার কাছে টেলিফোন করিল—বলিল, তার কিছু জড়োয়া গহনা বিক্রয় করিতে হইবে, দর কষিবার জন্য একবার হীরালাল বাবু স্বয়ং আসিতে পারেন কি? হীরালাল সম্মত হইয়া অবিলম্বে আসিতে স্বীকৃত হইল।

হীরালাল আসিবার পূর্ব্বে সরমা খুব সাজিয়া গুজিয়া তার জন্য বসিয়া রহিল। সে আসিলে সরমা তাকে হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইল।

সরমা বলিল, "আমাকে চিনতে পারছেন না হীরালাল বাবু?"

"আজ্ঞে না হুজুর।"

হাসিয়া সরমা বলিল, "চিনবেন কেমন ক'রে? মাত্র একদিন দেখা, তাও বড় সুবিধার অবস্থায় নয়। দেখুন দিকিনি ভাল ক'রে!"

হীরালাল কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না।

সরমা বলিল, "আমি অজয় বাবুর স্ত্রী—একদিন আপনার দোকানে গিয়েছিলাম—যেদিন আপনার একখানা গহনা খোয়া যায়।"

হীরালাল বলিল, "হাঁ, হাঁ, ঠিক। এতক্ষণ ঠাহর ক'রতে পারিনি।—কিন্তু—"

"কিন্তু আমি আপনাকে ডেকেছি কেন তাই জিগ্‌গেস ক'রছেন?—ডেকেছি, গয়না বেচবার জন্য নয়, আপনার পায় ধ'রবার জন্য"—বলিয়া সে ধপ করিয়া হীরালালের পা জড়াইয়া ধরিল। হীরালাল ত্রস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। সরমা তার পা ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিল, "বাবুজী, আমার

স্বামীকে ছেড়ে দিন, আপনার যা লোকসান হ'য়েছে সব আমি পুষিয়ে দিচ্ছি।"

হীরালাল সরমার হাত ধরিয়া আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। সরমা তাকে ছাড়িল না।

সরমা বলিল, "আমার স্বামীর টাকা নেই বাবুজী, কিন্তু আমার আছে। আপনার পাঁচ হাজার টাকা লোকসান হ'য়েছে; পাঁচ হাজার টাকাই আমি দিচ্ছি—আপনি ওঁকে ছেড়ে দিন।"

হীরালাল মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "দেখুন—পা ছাড়ুন, আমি বুঝিয়ে ব'লছি আপনাকে শুনুন।—"

সরমা কিছুতেই ছাড়ে না দেখিয়া সে শেষে বলিল, "আচ্ছা, আপনার কথা রইলো—আমি একবার উকীল বাবুকে সুধিয়ে আসি।"

"না বাবুজী—উকীল বাবুকে কিছু সুধাবেন না। আমার কথা শুনুন, আপনি সুধু আদালতে গিয়ে বলুন যে আপনার ভুল হ'য়েছিল। যে গয়নাটা খোয়া গিয়েছিল, সেটা পরে খোঁজ ক'রে আপনি পেয়েছেন।"

হীরালাল বলিল, "লেকিন সে গয়না যে অন্য লোকের কাছে বিক্রী হ'য়েছে—"

"ব'লবেন সেও ভুল—যেটা বিক্রী হ'য়েছে সেটা আমারই গয়না—দেখতে অনেকটা আপনার মতন।"

হীরালাল বলিল, "উকীল বাবুকে একবার জিগ্‌গেস ক'রে—"

কিন্তু সরমা কিছুতেই ছাড়িল না। হীরালাল বাবুকে স্বীকার করিতে হইল। সরমা তখন তার পা ছাড়িয়া চেক লিখিতে বসিল।

হীরালাল তখন বলিল, "কিন্তু এই মামলায় আমার পান সাত শ' টাকা খরচা হইয়া গেছে—"

সরমা বলিল, "বেশ, তবে সাড়ে পাঁচ হাজারের চেক দিচ্ছি।"

চেক লইয়া হীরালাল চলিয়া গেল।

বেলা তিনটার সময় অজয় আসিল। সরমা তাহাকে স্মিতমুখে সম্ভাষণ করিয়া ভিতরে বসিতে বলিল। অজয় সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "মাপ ক'রবেন—আমি ভিতরে আসবার যোগ্য নই। আমি এখান থেকেই আমার কথাটা ব'লে যাই।"

সরমা তার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া একটা কুশন চেয়ারে বসাইল।

অজয় বলিল, "আমি উকীলের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি ব'ল্লেন যে, আমি কবুল জবাব দিলে আর কোনও কথাই উঠবে না—আমি তাই দেব।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "হয় তো তা' দরকার হবে না। আপনি আগেই কবুল জবাব দিয়ে ব'সবেন না।"

বিস্মিত হইয়া অজয় বলিল, "কেন? এ কথা ব'লছেন কেন?"

"কারণ আছে—সে কথা কাল ব'লবো। যদি দরকার হয় তবে আমি আপনাকে আগেই খবর দেবো যে আপনার কবুল জবাব দেবার দরকার।"

অজয় বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে আর জিজ্ঞাসা ক'রিল না। সে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরমা বলিল, "বা, উঠছেন বড়, চা খেয়ে যান।"

অজয় ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "মাপ ক'রবেন—আমি চা খাব না।"

"সেও কি হয়, এতদিন পর এলেন আপনি, এক পেয়ালা চা না খেয়ে যাবেন?"

"সে হবার জো নেই—মাপ ক'রবেন। আমার যে একটা প্রতিজ্ঞা আছে সেটা ভঙ্গ ক'রতে ব'লবেন না।"

"কি প্রতিজ্ঞা?"

নতমস্তকে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া অজয় বলিল, "সে কথা ব'ল্লে আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না।"

"তবু, শুনি!"

"থাক, আমায় মাপ ক'রবেন," বলিয়া নমস্কার করিয়া অজয় চলিয়া গেল।

সরমা বিস্মিত হইল। এ যেন সে অজয়ই নয়।

(৫)

নিরুপম ছিল জাত উকীল। প্র্যাক্টিস তার বেশী দিনের নয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে সে উকীল-ধর্ম্মের অনেক-গুলি অঙ্গ আত্মসাৎ করিয়াছে। সে মনে মনে জানে যে জগতের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধিমান জাতি উকীল। এবং উকীল ছাড়া আর সমস্ত জাতকে সে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে। হাকিমেরা নির্ব্বোধ, মাষ্টারেরা কাণ্ডজ্ঞানহীন;

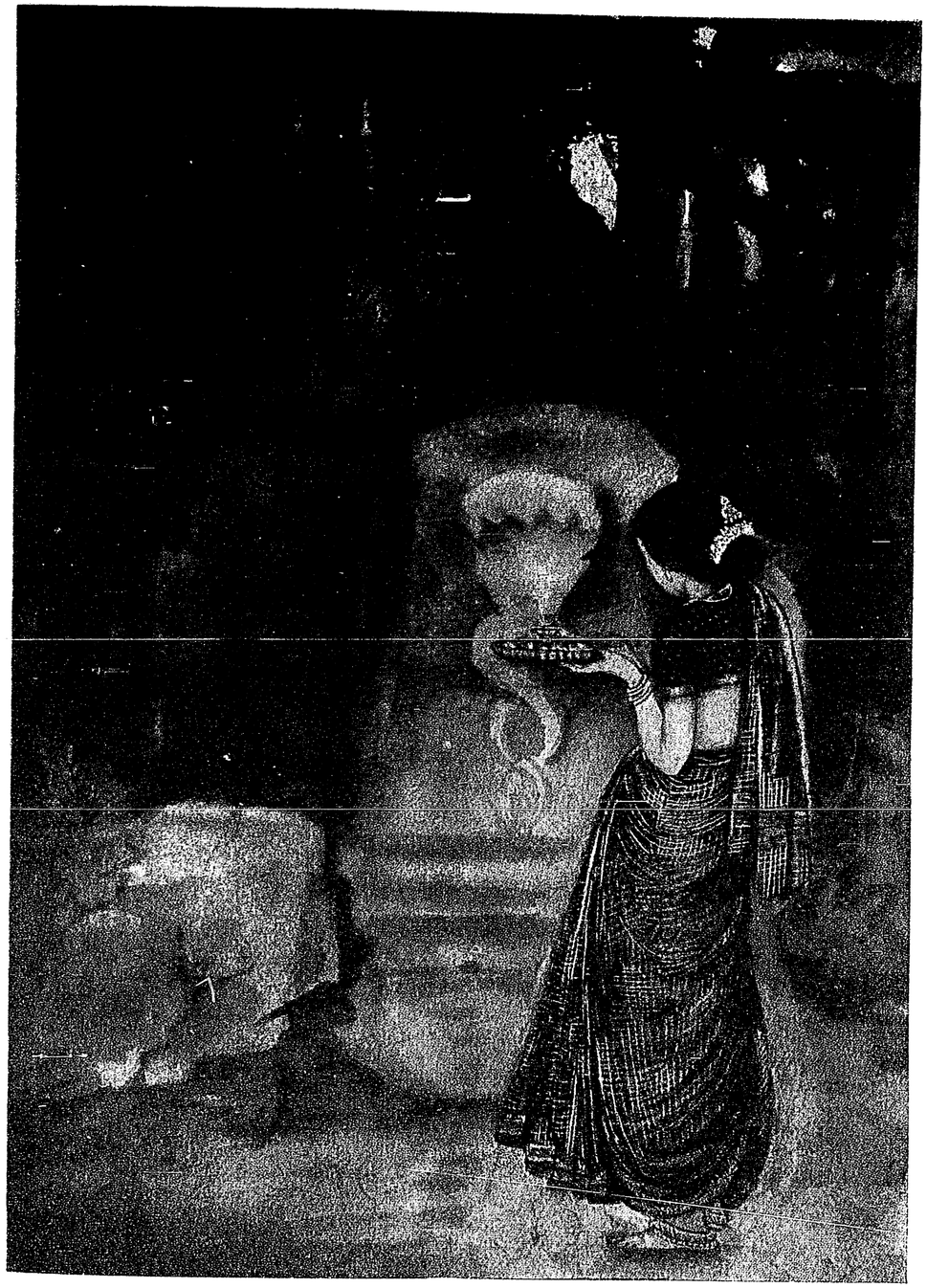

নাগপূজা

শিল্পী—এম, ভি, সুব্বা রাও
মান্দ্রাজ, আর্ট স্কুল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

এবং অন্যান্য সকল পেশার লোকই অল্প-বিস্তর উকীলদের চেয়ে বুদ্ধি ও বিদ্যায় হীনস্তরের লোক।

তা ছাড়া নিরুপমের বিশ্বাস, সে লোকচরিত্র বোঝে খুব ভাল। এবং কোনও লোক বা কোনও ব্যাপার সম্বন্ধে তার যাহা মতামত তাহা এত নিঃসন্দিগ্ধ সত্য যে, অন্য কেহ যদি সে সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করে তবে তাহা সে নিছক নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। কাজেই কথায় কথায় সে রাজা উজীর মারে, লম্বা লম্বা কথা কয়, আর সমস্ত দুনিয়ার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে চায়।

আজ সকালে যে সরমা হঠাৎ তাকে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া শুধু অজয়কে দেখিবার জন্য এতটা রাস্তা ঘুরিল, ইহা হইতে সে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিল যে, অজয়কে দেখিতে যাওয়া একটা ছল, সরমার আসল উদ্দেশ্য নিরুপমকে গাঁথিয়া তোলা।

সে ভাবিয়া দেখিল ইহাতে তার আপত্তির কোনও কারণ নাই। সরমা দেখিতে সুন্দরী—তা ছাড়া তার টাকাকড়ি আছে। ঐ বালিগঞ্জের বাড়ীখানা বাসের পক্ষে চমৎকার! তা ছাড়া সরমার বুদ্ধি-সুদ্ধি মেয়েছেলের পক্ষে মন্দ নয়। লেখাপড়া শিখিয়াছে, কিন্তু লেখাপড়া জানা অন্য মেয়েদের মত অযথা ফড়্‌ফড়্‌ করে না—বেশ শান্ত ও নম্র। সরমা তার স্ত্রী হইলে সে বশে থাকিবে।

তা ছাড়া ট্যাক্সিতে সে যতক্ষণ সরমার সঙ্গে ছিল, ততক্ষণ সে তার রক্তের ভিতর বিলক্ষণ চাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছিল। এবং তাহার পর সারাদিন ধরিয়াই সেই সহযাত্রার মনোজ্ঞ স্মৃতি তার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া বার বার তার অন্তরের ভিতর সেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। তার মনে হইল, সে সরমাকে সত্য সত্যই ভালবাসিয়াছে, আর সরমাও তাহার প্রতি একদিনেই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং সে আর বিশেষ ভাবনা চিন্তা করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাইল না। বৈকাল বেলায় সে মায়ার সহিত দেখা করিতে গেল।

অভয় তখন তার ল্যাবরেটারীতে একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিল। মায়া উপরে তার ছেলে লইয়া বিব্রত ছিল।

নিরুপম আসিয়া প্রথমে প্রবেশ করিল অভয়ের পড়িবার ঘরে। সেখানে তাকে না পাইয়া ল্যাবরেটারীর ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিতে পাইল অভয় একটা যন্ত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন দেখিতেছে। নিরুপম অভয়ের কাছে গিয়া তার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আরে এই রাক্ষুসে বেলায় ব'সে এ-সব কি ক'রছো অভয়দা—"

অভয় গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"চুপ!" আর বলিষ্ঠ বাহুতে নিরুপমকে এমন একটা ঠেলা দিল যে নিরুপম পাঁচ পা পিছাইয়া গেল। অভয়ের চক্ষু বরাবরই নিবদ্ধ রহিল তার পরীক্ষার যন্ত্রের উপর—নিরুপমের অস্তিত্ব সে গ্রাহ্যই করিল না।

নিরুপম অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, অভয়ের বহির্জগৎ সম্বন্ধে কোনও সংজ্ঞা আছে বলিয়া মনে হইল না। তার পর সে আস্তে আস্তে অসন্তুষ্টভাবে ল্যাবরেটারী হইতে বাহির হইয়া আবার অভয়ের পড়িবার ঘরে গেল।

মায়া তখন সেখানে অভয়ের খাবার লইয়া বসিয়া ছিল। সে বলিল, "ঠাকুরপো যে, কি ভাগ্যি! ওরে ভজুয়া, মাকে ব'লে আর এক থালা খাবার সাজিয়ে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য উপরে ছুটিল, নিরুপম বলিল, "যা' হ'ক; হাঁ বউদি, অভয়দার হ'য়েছে কি? আমি কাছে যেতেই গর্জ্জন ক'রে উঠলো, ব্যাপার কি?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "আ কপাল, তুমি বুঝি ল্যাবরেটারীতে গিয়েছিলে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে। ওখানে উনি অমনি। বাইরে উনি মাটির মানুষটি, কিন্তু ওঁর ওই সাধনার বেলায় বিঘ্ন হ'লে যেন চোখ দিয়ে মানুষকে ভস্ম ক'রে দিতে পারেন। ঠিক যেন মহাদেব। আজকে তো কথাই নেই। অনেক দিন চেষ্টার পর ওঁর একটা experiment আজকে প্রায় সফল হ'য়ে এসেছে—পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে ঐ যন্ত্রটার উপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আছেন। আমি তিনবার এসে গেছি, টেরও পান নি।"

"তোমার এমন ক'রে চলে কি ক'রে বউদি? রাগ হয় না তোমার?"

"রাগ হ'ত আগে—হিংসেও হ'ত ঐ ল্যাবরেটারীর উপর। কিন্তু, কি জান ভাই, জেনে শুনে যখন ঐ সতীনের ঘর ক'রতে এসেছি, তখন রাগ ক'রে আর কি ক'রছি বল?"

"তা বুঝতে পেরেছি। ঐ তোমার দিদি যা' বলছিল

তোমারও দেখছি সেই ভাব—বাঙ্গালীর মেয়ে সুধু সব স'য়েই যায়।"

মায়া বলিল, "কোন্ দিদির কথা ব'লছো ?"

নিরুপম বলিল, "তোমার বালিগঞ্জের দিদি,—আজ সকালে যে গিয়েছিলাম তাঁর ওখানে !"

হাসিয়া মায়া বলিল, "ওমা—সরি—তোমরা দেখছি 'দিদি' 'দিদি' ক'রে ওর মাথাটা খাবে। তার কাছে গিয়েছিলে ?—আজই, একটা দিনেরও তর সইলো না ?"

নিরুপম বলিল, "না, না, যা ভাবছ তা' নয়, আমি তাঁর কাছেই যাব ব'লে যাই নি। আমি ওখানে Riding schoolএ প্রায় যাই, ঘোড়ায় চ'ড়ে খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে আসি। আজ ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছুলাম তোমাদের বাড়ীর সামনে, তাই গেলাম।"

মায়া। এমনি ক'রেই ঘুরতে ঘুরতে মাছি গিয়ে মাকড়সার জালে পড়ে। তা' বেশ, কি কথাবার্ত্তা হ'ল তার সঙ্গে।

"ওঃ, সে অনেক কথা। তাঁর সঙ্গে ট্যাক্সি ক'রে টালিগঞ্জ বেড়িয়ে এলাম, কত কথাবার্ত্তা হ'ল! তোমার বিয়ের কথা—বাঙ্গালীর মেয়ে স্বভাবের কথা—সে অনেক কথা।"

মায়া বলিল, "তাই না কি ? এতদূর হ'য়ে গেছে—ট্যাক্সি ক'রে বেড়ান। র'স, আসুক এইবার সরি, তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছি—কি নেকী সে ভেবে অবাক্ হ'চ্ছি। তা বেশ, খুসী হ'লাম। তা সরিকে লাগলো কেমন তোমার ?"

নিরুপম বলিল, "কেন বেশ, খাসা মেয়ে তোমার দিদি। দিব্যি কথাবার্ত্তায় দুরস্ত—আর আমার সঙ্গে মেলামেশায় কোনও রকম সঙ্কোচ ক'রলেন না। আমার এমনি মেয়েই লাগে ভাল। ঐ সব জুজুকাত বাঙ্গালী মেয়ে যারা একটা ভদ্রলোক দেখলে মুখড়ে পড়ে—দু'চক্ষে দেখতে পারি নে আমি তাদের। প্রায় দু' ঘণ্টা কাটালাম তাঁর সঙ্গে—কোনও রকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ দেখতে পেলাম না।"

মায়া—"দু' ঘণ্টা ? ট্যাক্সিতে ?"

নিরু। না—ট্যাক্সিতে সব সময় নয়। বাড়ীতেই কথা হ'চ্ছিল, তার পর তিনি ব'ল্লেন টালিগঞ্জে যাবার কথা, তাই ট্যাক্সি ক'রে বেরুলাম দুজনে।

অভয় তখন আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিরুপমকে বলিল, "নিরু যে, কখন এলে ?"

নিরুপম বলিল, "কখন এলাম ? আসবামাত্র তুমি এমন একটা বিপুল ধাক্কা মেরে আমায় সরিয়ে দিলে, আর জান না কখন এলাম ?"

"ওঃ সে বুঝি তুমি গিয়েছিলে ? আমি ভেবেছিলাম বুঝি মায়া।"

অবাক হইয়া নিরুপম বলিল, "সে কি ? বউদিকে তুমি অমনি ধাক্কা দেও না কি ? তুমি একটা পশু !"

"কি জান ভাই, আমি একটা ভয়ানক interesting জিনিষ দেখছিলাম। জার্ম্মাণীর একজন কেমিষ্ট Kathode Rays দিয়ে পরীক্ষা ক'রে কতকগুলো elementএর atomic construction সম্বন্ধে কতকগুলো নূতন result পেয়েছেন ব'লছেন। আমি সেই experimentটা যাচাই ক'রবার চেষ্টা ক'রছি। আজ এতদিন পর result পাবার মত হ'য়েছিল—তাই"—

"থাম দাদা, আর তোমার ব্যাখ্যায় কাজ নেই। বরং আর দুটো ঘুসি লাগিয়ে দাও সইতে পারবো ; কিন্তু Kathode raysএর আঘাত আমার সইবে না।"

মায়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ফলটা মিললো তোমার ?"

অভয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সামান্য একটু তফাৎ দাঁড়িয়ে গেল। ওটা যদি impurityর ফল না হয়, তবে আমার বিশ্বাস যে theoryটা"—

নিরুপম বলিল, "বউদি, তবে আমি চ'ল্লাম। তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর এ অভিনব প্রেম-সম্ভাষণ তোমাদের কাছে যতই মনোহর হ'ক, আমার মস্তিষ্কের ভিতর এ সব কথা হাতুড়ির মত ঘা' দিচ্ছে।"

অভয় বলিল, "আরে, না, না, ব'স। থুড়ি ব'লছি, ভূতের কাছে রাম নাম আর ক'রবো না। তার চেয়ে মায়ার হাতের তৈরী সিঙ্গাড়া পানতুয়ার চর্চ্চা করা যা'ক।"

ভজুয়া আর এক রেকাবী খাবার আনিয়াছিল, দু'জনে বসিয়া সেগুলির সদ্ব্যবহার করিল। তার পর চা আসিল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নিরুপম বলিল, "দেখ অভয়দা, তুমি যে ব'লছিলে সেদিন—এই আমার

বিয়ের কথা, তোমার এই সিঙ্গাড়া ও পানতুয়া খেয়ে মনে হ'চ্ছে, ওটা ক'রে ফেলাই ভাল।"

অভয়। তা বেশ তো—মেয়ে পছন্দ হ'য়েছে তো ?

নিরু। হাঁ তা হ'য়েছে। তোমার শালীটি খাসা মেয়ে। আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি, তুমি বিয়ের উদ্যুগ ক'রতে পার।

অভয় বলিল, "তাই না কি ? এতদূর এগিয়ে প'ড়েছে এরই মধ্যে, দিদিকে ব'লেছ ? রাজী হ'য়েছেন তিনি ?"

নিরু। তাঁর রাজী না হবার তো কোনও কারণ দেখতে পাই নে। আমি চোর ডাকাত নই—চেহারা-খানাও একেবারে মুদ্দোফরাসের মত নয়।

অভয়। ওরে ভাই, তাতেই কুলোয় না আজকাল। আমারই বা চেহারা কোন্ মুদ্দোফরাসের মত। কিন্তু তোমার বউদি আমার প্রস্তাবে প্রথমে বড় বড় অক্ষরে এক No লিখে পাঠিয়েছিলেন। অতটা ভরসা ক'রো না, তুমি যত বড় কন্দর্পই হও, মেয়েছেলেরা তবু অম্লানবদনে 'না' ব'লতে পারে। তবে তিনি যদি তোমাকে ব'লে থাকেন, সে কথা স্বতন্ত্র।

মায়া। আমার বোধ হ'চ্ছে তোমাদের বোঝা-পড়াটা বোধ হয় হ'য়ে গেছে, কেমন ? আজ সকালে ট্যাক্সিতে ?

নিরু। না বউদি, এ কথা যে তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রতে হবে এটা আমার খেয়াল হয় নি।

মায়া। ওমা, তবে কি ? গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল। কাঁটাল পাকুক, তাকে পাড়, তবে না তেল।

নিরু। তোমরাই আমার হ'য়ে তাঁর মাকে ব'লে কথাটা পাকা ক'রে ফেল না বউদি ?

অভয়। ও ভাই, ও পথে যেও না। আমি তাই ক'রতে গিয়েই নাকাল হ'য়েছিলাম। মায়াকে চিঠি না লিখে আমার শ্বশুরকে লিখেছিলাম, তাই ও চ'টে মটে একেবারে আমাকে তো 'না' বল্লেই, তা ছাড়া ছুটে গিয়ে অজয়কে—

মায়া। থাম, আর রঙ্গ ক'রতে হবে না। কি ছিরির চিঠি লিখেছিলে সে কথা ভুলে যেও না। কর্ত্তব্যানুরোধে তুমি জ্যাঠাম'শায়ের আজ্ঞা পালন ক'রে দয়া ক'রে আমাকে বিয়ে ক'রতে রাজী এই কথা লিখেছিলে। এমন চিঠি দেখে কার না রাগ হয় ? শোন ঠাকুরপো, আমরা কেউ কথা পাড়লে সুবিধা হবে না। সরিটা ভয়ানক একগুঁয়ে। ও আমাদের কাছে চিরদিন গেয়ে রেখেছে যে, ও বিয়ে ক'রবেই না। তাই আমরা ব'ল্লে সে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার ক'রবে। কিন্তু তোমার আজকের কথা যা শুনছি, তাতে তুমি যদি গুছিয়ে বল তবে সে রাজী হবে।

নিরুপম সাহসের সহিত বলিল, "আচ্ছা বেশ, কালই কথাটা পাকা ক'রে ফেলবো।"

মায়া বলিল, "এই যে মেঘ না চাইতেই জল। সরি এসে হাজির।"

সরমা গাড়ী হইতে নামিয়া সেই ঘরের সামনে আসিয়া অভয় ও নিরুপমাকে নমস্কার করিয়া সে মায়াকে বলিল, "তুই একটু উঠে আয় মায়া—একটা কথা আছে।"

মায়া ত্রস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া সরমার সঙ্গে উপরে চলিয়া গেল।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই ? কি ক'রলি ?"

সরমা হাসিয়া বলিল, "সব ঠিক, তোর কোনও ভাবনা নেই।"

"কি ক'রেছিস বল দিকিনি।"

"ক'রেছি অনেক কিছু, সে সব পরে শুনবি। প্রথমে অজয়বাবুকে গিয়ে ব'ল্লাম, আপনি পালান। সে কিছুতে রাজী হ'ল না।"

"The Brute ! তার বোধ হয় মতলব যে আমাকে না ডুবিয়ে ছাড়বে না !"

"তা ঠিক নয়। সে অভয়বাবুর জামিনের টাকাগুলো লোকসান হ'তে দিতে চায় না।"

"ঈস্, দরদ দেখে বাঁচি নে। এখনো তার পেটে ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গজ্ গজ্ ক'রছে। ও সব বাজে কথা। আমাকে জব্দ করাই তার মতলব। তা' তুই কি ক'রলি।"

"আমি সব ঠিক ক'রেছি। হয় কাল ওর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলে নেবে, না হয় তো অজয়বাবু কবুল জবাব দেবে। তোর নাম কিছুতেই উঠবে না। তা' ছাড়া তুই মিথ্যে ভয় খাচ্ছিস, তুই যে সেই মেয়ে, সে কথা কেউ জানেই না। হীরালাল আগরওয়ালা তো আমাকেই অজয়-বাবুর স্ত্রী ব'লে সাব্যস্ত ক'রে ব'সে আছে।"

"তাই না কি ? তুই গিয়েছিলি তার কাছে ?"

"যাই নি, তাকেই আনিয়েছিলাম। সে দেখেই চিনে ফেল্লে যে, আমিই অজয়ের সঙ্গে তার দোকানে গিয়েছিলাম।"

"ওমা, তা' তুই কি বল্লি?"

"কিছুই বলি নি, সে এখনও জানে যে আমিই সে। কাজেই কথাটা যদি ওঠে সে আমার নামেই উঠবে—তোর কোনও ভাবনা নেই।"

"ধন্যি মেয়ে তুই!—কিন্তু ভাই, যদি ঠিক না হয় —যদি—"

"সে জন্য ভয় খাচ্ছিস কেন? নিন্দে হয় আমার হবে। আমার তো আর সেজন্য বিষ খেতে হবে না—আমার তো আর একটা স্বামী নেই, যার কাছে জবাবদিহি দিতে হবে।"

"না, কিন্তু তাহ'লে ভারী মুস্কিল হবে। তোর সোয়ামী নেই বটে, কিন্তু হ'তেও তো বড় বেশী দেরী নেই।—সে সব হয় তো ভণ্ডুল হ'য়ে যাবে।"

"কি পাগলের মত বক্‌ছিস? হ'তে দেরী নেই কি য়ে? তুই কি এখনও ভাবছিস আমি কোনও দিন বিয়ে ক'রবো?"

"আহা ও-সব নেকামী আমার জানা আছে। এদিকে আমার কাছে ওই কথা বলিস, ওদিকে তো ঠাকুরপোর সঙ্গে দিব্যি ট্যাক্সি চ'ড়ে টালিগঞ্জে হাওয়া খেতে যাওয়া হ'চ্ছে! তোর পেটে যে কত বিদ্যা আছে তার ঠিকানা নেই।"

সরমা হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ট্যাক্সিতে টালিগঞ্জে হাওয়া খাওয়া? তোর দেওর ব'লেছে বুঝি। পুরুষ-গুলো কি বোকা। একটা মেয়ে যদি তার সঙ্গে একটু হেসে কথা কইলো, অমনি সে ঠাওরায় সে ম'রেছে!"

"রাখ, রাখ, তোর রঙ্গ রাখ। একটু হেসে কথা কওয়া, আর নিজের গাড়ী ফেলে ট্যাক্সিতে বেড়াতে যাওয়া এক কথা নয়। ও সব ঠেকার করিস অন্য লোকের কাছে। আমার তো ও সব বিদ্যে অজানা নেই।"

সরমা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "আচ্ছা সে কি বলেছে ভাই? বল না?"

"সে সব কথায় কাজ কি তোর? তোর তো আর তাকে দিয়ে দরকার নেই! তুই হবি চিরকুমারী—কোথায় কোন মিন্সে তোর কথা কি ব'লেছে সে খবরে কাজ কি তোর?"

"দরকার নেই? বলিস কি? এখনো আমার তাকে দিয়ে অনেক দরকার আছে। শুনিই না কি ব'লেছে?"

"আর কি বলবে? ঐ ট্যাক্সি চ'ড়ে তার মাথা ঘুরে গেছে—সে তোকে বিয়ে ক'রতে চায়, আমায় ব'লেছে ঘটকালী ক'রতে।"

"ঘটকী বিদায়টা ঠিক ক'রেছিস তো?"

"সেটা তুই দিস, বিয়ে হ'লে!"

"আচ্ছা, সেই পিত্যেশে ব'সে থাক্। যাক গে, এখন ওদের ডাক। অভয় বাবু বোধ হয় এতক্ষণ তোর কাছ ছাড়া হ'য়ে থেকে ধড়্‌ফড়াচ্ছে।"

"ব'য়ে গেছে তার ধড়ফড়াতে। তা' হ'লে আর আজ ঝাড়া সাত ঘণ্টা ল্যাবরেটারীতে ব'সে থাকতো না। কার প্রাণ ধড়ফড়াচ্ছে, তা দেখতেই পাচ্ছি। আর ধড়্‌ফড়িয়ে কাজ নেই ভাই, আমি ঠাকুরপোকে এক্ষুনি ডাকছি।"

নিরুপম ও অভয় মায়ার আহ্বানে উপরে আসিয়া বসিল। অভয় বলিল, "দেখুন দিদি, আপনি যাবার আগে আপনাকে একটা কথা ব'লবো—আমাকে মনে ক'রে দেবেন আপনি। নিরু পাষণ্ডটার জ্বালায় এখানে কেমিষ্ট্রীর কথা বলবার উপায় নেই তো!"

সরমা বলিল "আচ্ছা, কিন্তু নিরুপম বাবু আপনি কেমিষ্ট্রীর উপর এত চটা কেন?"

নিরু। তার সহজ কারণ একটা এই মনে ক'রতে পারেন যে, আমি ঐ বিষয়টা কিছু জানি না। এবং যারা কেমিষ্ট্রী খুব ক'রে জেনেছে তারা যে খুব একটা মাথা কেনবার মত কিছু ক'রেছে, তা আমি মনে করি না। আমার কথাটা হ'চ্ছে এই যে জীবনটা বিজ্ঞানের জন্য নয়, জীবনের জন্যই বিজ্ঞানের দরকার। অভয়দার মত কতকগুলি পণ্ডিতমূর্খ এই সত্যটাকে একেবারে উল্টে ফেলেছে। জীবনটা উপভোগ করবার কোনও আগ্রহই নেই ওদের—ওরা যেন দাসখত লিখে দিয়েছে কেমিষ্ট্রীর কাছে—দিন রাত তাই সেই প্রভুর গোলামী ক'রছে। আমি কোনও কিছুরই কাছে দাসখত লিখতে রাজী নই।

সরমা। কিন্তু জীবন উপভোগ করা বলেন কাকে? যাতে যার আনন্দ, সেইটা ক'রতে পারাই তো জীবনের সার্থকতা। অভয়বাবুর আনন্দ প্রকৃতির পেট চিরে তার পেটের খবর বের করায়; উনি তাই ক'রছেন। জ্ঞানের আনন্দ যে খুব একটা বড় রকম আনন্দ, সেটা বোধ হয় আপনি অস্বীকার ক'রবেন না।

নিরু। খুব জোর ক'রে অস্বীকার ক'রবো যদি তার মানে এই হয় যে, তার জন্য জীবনটাকে পিষে ফেলতে হবে।

অভয়। কিন্তু আমি তো জীবনকে মোটেই পিষে' ফেলছি নে। তাকে প্রসারিত ক'রছি।

নিরু। তুমি এ কথা ভাবছো এই জন্যে যে, প্রকৃত জীবন যে কি তার আস্বাদ তুমি কোনও দিনই পাও নি। Life ব'লতে যা বোঝায় তার আভাস মাত্র তোমার জীবনে কোনও দিন দেখা দেয় নি।

সরমা। জীবন মানে—খাও দাও ফূর্ত্তি কর—কেমন?

নিরু। আপনি ঐ খাওয়া দাওয়া ফূর্ত্তি করা জিনিষটাকে যত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উল্লেখ ক'রলেন, সেটা তত তাচ্ছিল্যের জিনিষ মোটেই নয়। ব'লতে গেলে সেইটাই হ'ল জীবনের লক্ষ্য—আমরা যত যা করি তার এক লক্ষ্য হচ্ছে জীবনে এই আনন্দ বাড়ান—প্রাণের আনন্দ —যাকে আপনি ব'লবেন ফূর্ত্তি করা।

সরমা। তবে তার জন্যে লেখাপড়া শেখা একটা বাজে খরচ। আমি দেখেছি সাঁওতাল পরগণায় নিরক্ষর অর্দ্ধ-উলঙ্গ সাঁওতালরা যে ফূর্ত্তি করে, তার তুলনায় আমাদের আনন্দ নেই ব'ল্লেই চলে।

নিরু। সে কথা ঠিক। অসভ্য বর্ব্বরদের ভিতরই সত্যিকারের Life দেখতে পাবেন—তারা জীবনের আনন্দে ভরপুর। আমাদের সভ্যতা এই মৌলিক আনন্দের ধারাটা রুদ্ধ ক'রে জীবনটাকে কেবলি উজান ঠেলে শুষ্ক বন্ধুর পথে চালিয়ে নিচ্ছে। কতকগুলো ভুল আদর্শ সামনে রেখে civilisation আমাদের ক্রীতদাসের পালের মত ঠেলে নিয়ে চলছে, আর জীবনের আনন্দটা পিষে মারছে। সভ্যতার মোট ফলটা যাচাই ক'রে দেখুন, এতে হাজার কৃত্রিম আয়োজন হ'য়েছে মানুষের সুখের জন্য, কিন্তু আনন্দ তাতে বাড়ে নি।

মায়া এই কথার মাঝখানে উঠিয়া চলিয়া গেল। এবং কিছুক্ষণ পর একটা ভৃত্য আসিয়া অভয়কে বলিল, মায়া ডাকিয়াছে। অভয়ও উঠিয়া গেল।

সরমা তাহা লক্ষ্য করিল না। সে বলিল, "তাই যদি আপনার মনের কথা, তবে মিছেমিছি এতগুলো লেখাপড়া ক'রলেন কেন আপনি?"

"সত্যি কথা ব'লতে গেলে ব'লবো, দায়ে প'ড়ে। সংসারটা এমন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর ভিতর লেখাপড়া না শিখলে দাঁড়াবার ঠাঁই হয় না—লোকের সঙ্গে কথা কওয়াই দায় হয়। এই আবেষ্টনের সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে চালাবার জন্য লেখা পড়া দায়ে প'ড়ে শিখতে হয়। কিন্তু আপনাকে পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে চালাবার জন্য যতটুকু দরকার, তার বেশী লেখা পড়া আমি কোনও দিনই করিনি—করা আবশ্যক বোধ করিনে। বিদ্যা আমার জীবনকে পিষে মারবে এমন ক'রে বিদ্যা অর্জ্জন আমি করিনি।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "দেখুন, আপনার কথা শুনে আমার মনে হ'চ্ছে যে উদ্ভট কথা বলার একটা মোহ আছে আপনার। নইলে, সত্যি সত্যি আপনি এ কিছুতেই মনে করেন না যে, কোনও কিছু না জানাটা একটা গর্ব্বের বিষয়।"

"জানি নে এইটা নিয়ে গর্ব্ব ক'রছি নে আমি। কিন্তু আমার গর্ব্ব এই যে আমি একটা জ্যান্ত মানুষ, মরা বইয়ের পোকা নই। জ্যান্ত মানুষের যাতে আনন্দ সে সব পরিপূর্ণরূপে উপভোগ ক'রবার শক্তি আমি হারাই নি বিজ্ঞানের কাছে দাসখত লিখে। আর যাদের ভিতর তেমনি ক'রে জীবন উপভোগ করবার শক্তি ও উপাদান আছে তারা যে মিছিমিছি তা থেকে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে রাখবে এ দেখলে আমার রাগ হয়। ধরুন আপনি —আপনার অসামান্য রূপ, পরিপূর্ণ যৌবন, অর্থের আপনার অভাব নেই। আপনি যে জীবন উপভোগ করবার এতবড় প্রকাণ্ড শক্তি নিয়ে নিজেকে শুকিয়ে মারবেন টেষ্ট-টিউব ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে, এটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পারি নে।"

নিরুপম দেখিল মায়া ও অভয় সেখানে নাই—এই সুযোগ!

সরমা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি যদি তাতে আনন্দ পাই তবু আমাকে তা' ক'রতে দেবেন না, এ যে আপনার বেজায় জবরদস্তী।"

"তাতে আপনি আনন্দ পেতে পারেন না। আপনি

যে মনে ক'রছেন তাতে আনন্দ পাবেন, এটা আপনার মনের একটা বিকৃত অবস্থার ফল। এতখানি রূপ শুধু ল্যাবরেটারীর গ্যাসের ধোঁয়ায় পচবার জন্য তৈরী হয় নি। আপনি আপনার স্বভাবকে নিপীড়িত ক'রে একটা বিকৃত আনন্দ বোধ ক'রছেন। যদি আপনার ভিতর আপনার নারীত্ব একবার পরিপূর্ণরূপে জেগে ওঠে তবেই আপনি এই সব শুকনো জিনিষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবেন—প্রকৃত জীবনের আনন্দের আস্বাদ ক'রবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠবেন। একদিন সে বিদ্রোহ জাগবেই আপনার মনে, কিন্তু হয় তো তখন যৌবন ফুরিয়ে যাবে, রূপের সৌরভ ঘুচে যাবে, জীবনটা আস্বাদ ক'রবার প্রকৃত শক্তি হয় তো আর থাকবে না। তখন যদি আপনার জাগরণ হয়, তবে তার ফল হবে হা হুতাশ। সেই সর্ব্বনাশ থেকে আমি আপনাকে রক্ষা করতে চাই—আপনাকে জাগাতে চাই আপনার জীবনের রস ভরপুর থাকতে।"

সরমা মনে মনে হাসিল। সে আর তর্ক না করিয়া একটু মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "আপনার মতে তবে আমার কি করা উচিত?"

"উচিত—প্রথমতঃ বিয়ে করা।"

"তাই না কি? কথাটা কখনও ভাবি নি—ভেবে দেখবো।"

"এর ভিতর ভাববার বিশেষ কিছু নেই। এ কথা আপনি নিশ্চয় অনুভব ক'রবেন যে, নারীজীবনের প্রকৃত সার্থকতা বিবাহে—সংসারে। সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—জননী ক'রে বিধাতা নারীকে গ'ড়েছেন। সেই পরিণতি থেকে যে নারী আপনাকে বঞ্চিত করে, সে আপনার স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে।"

"তা হয় তো হবে!"

"হয় তো নয়—নিশ্চয়। অমূল্য সময় আপনার ব'য়ে যাচ্ছে—একে অযথা নষ্ট হ'তে দেবেন না। বিয়ে করুন—"

"কিন্তু নারীর যদি বিয়ে করাটা এমন দরকারী হয়, তবে সেই জন্যেই তো পুরুষেরও তাড়াতাড়ি বিয়ে করা দরকার। তা' হলে আপনি এতদিন করেন নি কেন?"

নিরুপম এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া কথাগুলি মনে মনে গুছাইয়া লইল। তার পর সে হাসিয়া বলিল, "তার সোজা কারণ এই যে, এতদিন আমি আপনার দেখা পাই নি। এখন দেখা পেয়েছি। আপনি অনুমতি করেন তো অবিলম্বে আমি বিয়ে ক'রতে প্রস্তুত আছি।"

সরমা একটু সলজ্জ ভাবে বলিল, "তা' হ'লে আপনি আমাকে এতক্ষণ যে উপদেশ দিলেন তার ভিতর একটু স্বার্থের যোগ আছে, না?"

"কিচ্ছু না! আমি উপদেশটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেই দিয়েছি—তার পরে যে প্রার্থনাটা, সেটা হ'ল সেই উপদেশের ক্রোড়পত্র।"

"তাইনা কি?—তা বেশ। আপনার কথাটা ভেবে দেখবো।"

"কেন, আমাকে কি আপনি অযোগ্য মনে করেন?"

সরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "মোটেই না। আপনার মত যোগ্য পাত্র কোথায় পাব? কিন্তু আমার খটকা লাগছে এই যে কেমিষ্ট্রীর উপর আপনার বিষম রাগ—আর আমার ঐটাই বড্ড ভাল লাগে।"

বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া ডাকিল, "মায়া।"

মায়া পাশের ঘরেই ছিল। সে বাহির হইয়া আসিল। সরমা বলিল, "আমি যাই এখন ভাই, বড্ড দেরী হ'য়ে গেল। অভয়বাবু গেলেন কোথা?"

মায়া বলিল "তিনি ল্যাবরেটারীতে গেছেন। তোকে একবার সেখানে যেতে ব'লে গেছেন।"

"চল যাই—নমস্কার নিরুপম বাবু।"

সিঁড়ির মাঝামাঝি গিয়া সরমা আর হাসি চাপিতে পারিল না; সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মায়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল—propose ক'রেছে না কি?"

সরমা বলিল, "হাঁ। তুই যদি শুনতিস তার কথা, তবে হাসি চাপতে পারতিস না।"

"তুই কি বল্লি?"

"ব'ল্লাম ভেবে দেখবো।"

"তার পর? মতলবখানা কি তোর?"

"ঠিক বলতে পারছি নে, কিন্তু একেবারে ওকে হাত-ছাড়া করবার ইচ্ছা নেই।"

মায়া বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, "সে তো তোর মুখের কথা,—পেটের কথাটা কি?"

"পেটের কথাই তাই ভাই। সত্যি বলছি।" ক্রমশঃ

মানসকৈলাস তীর্থে—বঙ্গ মহিলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদীনবন্ধু রায়

৩রা আষাঢ়—ভয়াবহ নির্পাগীয়া অভিমুখে—

আজ অমাবস্যা—প্রত্যূষে উঠিয়াই যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। কুলী-বিভ্রাট মীমাংসা করিতে করিতেই অনেক বেলা হইয়া গেল। কালীর তীর দিয়া যাইতেছি, পরপারে নেপাল রাজ্য। দুপুর বেলায় জুমা এবং রাঁধীঁ গ্রামের নিচে একটা ঝরণার নিকটে তাঁবু খাটান হইল। আজ সকলে খিচুড়ী ভোজে পরিতৃপ্ত হইলেন। এই স্থানের লোকেরা ঝরণার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া চাকি চালাইয়া গম পিষিয়া আটা প্রস্তুত করিতেছে। আজ বিকালে সকলেই অগ্রসর হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সম্মুখে বেশ চড়াই। আমরা কালী তীর দিয়া গমন করিতেছি। "খেলার" পথের চড়াই উঠিতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। আকাশ মেঘমুক্ত। দূরে আকাশের কোলে দুপাঁচটা বড় বড় নক্ষত্র। পশ্চিম আকাশে অস্তমিত তপনের লোহিত রাগ অতি সামান্য প্রকাশ পাইতেছিল এবং আমাদের আগে পাছে চারিদিকে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী বিরাট পাষাণ প্রাচীরের মতন দাঁড়াইয়া ছিল। সেই গগনস্পর্শী স্তূপাকার ঘনান্ধকার রাশির দিকে তাকাইয়া ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। খেলার পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয় আমাদের থাকিবার জন্য পোষ্টাফিসের ঘর ছাড়িয়া দিলেন, আমাদের এই বিপদসঙ্কুল যাত্রায় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। আজকে চড়াই অতিক্রম করিয়া সকলেই অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেজন্য সোমবার যাওয়া স্থগিত রাখিয়া সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয় বিনয়ী, সদালাপী ও সেবাপরায়ণ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে খেলা প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে। স্থানটী মন্দ নহে, পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত। নিম্নে ধবলী বা ধৌলি গঙ্গা প্রবাহিত। এ স্থান হইতে হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার পোষ্ট-মাষ্টারের নিকট বিদায় লইয়া রওনা হওয়া গেল। এখান হইতে ধবলী গঙ্গার তট প্রায় ১০০০ ফিট নিচে। ধবলীর পুল পার হইয়া আমরা চড়াই উঠিতে লাগিলাম। ধৌলী গঙ্গা ক্ষুদ্র রেখার ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কালীর সহিত মিলিত হইয়া কি চমৎকার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিকে হিমালয়ের অসমান শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে ধবলী গঙ্গা নির্ম্মল জলপ্রবাহে উপল-খণ্ড ধৌত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। দুই এক জায়গায় বড় বড় প্রস্তর-স্তূপ পড়িয়া প্রবাহের গতি ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেখানে স্রোতের বেগ কি ভয়ঙ্কর। নদীর পাড়ে এবং অসমতল পর্ব্বত-উপত্যকায় নানা রকমের গাছ। ফুলের গাছ যে কত রকম তার সংখ্যা নাই। এ দৃশ্য-শোভার মধ্যে মোটেই বিলাসের ভাব নাই। তাই মন প্রাণ সেই বিরাটের দিকে আপনি নত হইয়া পড়ে। আমাদের এক দল "শশা" নামক স্থানে হাজির হইল। আমরা উত্তরপাড়ানিবাসী যাত্রীর জন্য অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া পাঙ্গু নামক পল্লীতে এ অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পান সিংহ মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। কিয়ৎকাল পরে সেই ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত উঁচুতে উঠিতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার বড়ই শ্বাস-কষ্ট হইতেছিল। পথে তাঁহার পর্ব্বত-পীড়া হইয়াছিল। পাহাড়ী হাওয়ায় একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আহারের পর পান সিংহ দম্পতীর নিকট হইতে

বিদায় লইয়া শশা ও সিরদাং গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। শশা নামক পল্লী চৌদাশ পট্টির অন্তর্গত একটী বড় ভুটিয়া গ্রাম। বাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে ধ্বজা প্রোথিত আছে। এ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে আট হাজার ফিট উপরে অবস্থিত। কাজেই এখানে বেশ একটু শীত অনুভব করিলাম। সন্ধ্যার সময় সিরদাং গ্রামের স্কুল-ঘরে আস্তানা লওয়া গেল।

৬ই আষাঢ় বুধবার সিরদাং গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম। গত রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। ভোরে আকাশ বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন; পথ চলা খুবই কষ্ট-কর। সামখেলা নামক স্থানে আজ যাইতে হইবে। রাস্তা গভীর বনের ভিতর দিয়া গিয়াছে। আমরা যখন নিবিড় অরণ্য ও ঘন গুল্মবনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, তখন আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিতেছিল; কারণ সামখেলা যাইতে পর্ব্বতবর্ত্মে হিংস্র জানোয়ারের দর্শন মিলিতে পারে। এ স্থানে নিয়ত বৃষ্টি হয় বলিয়া বৃক্ষগুলি ঘন শৈবালে আবৃত। সামখেলা গ্রামে বসন্ত রোগের প্রকোপ হওয়ায় গ্রামের ভিতরে না গিয়া একটা ঝরণার ধারে তাঁবু ফেলা গেল।

আসকোট হইতে প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে ভয়াবহ নির্পাণী পড়াও। এই পড়াও ১৩ মাইলের উপর লম্বা। ইহার মধ্যে কোন স্থানে একবিন্দু জলও পাওয়া যায় না। নির্পাণীর প্রাচীন রাস্তা বড়ই দুর্গম ও ভয়াবহ। আমাদের সেদিন প্রায় ৯০০০ ফিট উচ্চে উঠিতে হইয়াছিল এবং ৬০০০ ফিট নিম্নে নামিতে হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে খাড়া পাহাড় চড়িতে হয়। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে কাটা সিঁড়ি। সেখান হইতে একবার পা পিছলাইয়া পড়িলে একেবারে কালীর গর্ভে,—বিক্ষোভিত স্রোতে।

৭ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার—সামখেলা ত্যাগ করিয়া নদী পার হইয়া প্রায় দুই মাইল দূরে গলাগাড় নামক স্থানে আসিলাম। এখানে ডাক পিয়নদের একটা আড্ডা আছে। খানিক অগ্রসর হইয়া উৎরাই আরম্ভ হইল। এই স্থানের নাম গামা। ইহার পর মিরপানিরায় চড়াই। এই পথের নাম নাজাং। ক্রমে ক্রমে উচ্চ স্থানে আরোহণ করা গেল। এই স্থানের নাম হরভিটা। এই দিকের তিব্বতের প্রথম পল্লী তাকলাকোট সহরে ব্যবসায়ের জন্য কুমায়ূনী এবং ভুটিয়া ব্যবসায়ীরা ছাগল ও ভেড়ার উপর মালপত্র বোঝাই দিয়া এই পথে গতায়াত করিয়া থাকে। ক্রমে শৈল শিখর হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। এই স্থানের নাম তাতাপাণী। কতিপয় মাইল উৎরাই করিয়া আমরা কালী-তীরে আসিলাম। শীতকালে এইখানে ভুটিয়ারা প্রস্তর ও কাষ্ঠ সংযোগে কালী নদীর উপর সেতু প্রস্তুত করিয়াছে। সেতু নদীমধ্যস্থ সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর সংস্থাপিত। দুই দিকের পাহাড়ই ইহার অবলম্বন। এই পারে ইংরাজ রাজ্য—পরপারে নেপাল রাজ্য। বর্ষার জলে কালীর স্রোত অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে এই সেতু স্রোতে ভাসিয়া ও ভাসাইয়া লইয়া যায়। তখন নির্পাণীয়া পুরাতন পথ ব্যবহারে আসে। আজ কয়েক বৎসর এই সেতু স্রোতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। সেতু পার হইয়া নেপাল রাজ্য দিয়া কালীর তীরে তীরে যাইতেছি। প্রায় আধ ঘণ্টা পথ অতিক্রম করিলে সরচা নামক নেপাল রাজ্যের এক স্থানে আসা গেল। নেপালের এই দিকটায় রাস্তা নাই বলিলেই হয়। কোন রকমে প্রস্তর খণ্ড হইতে অন্য প্রস্তর খণ্ডে লাফ দিয়া যাইতে হয়। বৃষ্টি হইলে এই রাস্তায় পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ে এবং তাহাতে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা। কালী বেগে প্রবাহিত হইতেছে; তীরে তীরে বিপদ্‌সঙ্কুল পথ ধরিয়া হইতেছি, এমন সময় বজ্র-নিনাদে ইংরাজ রাজ্যের দিক হইতে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িল। এইরূপ ভয়ঙ্কর প্রলয়-কালীন শব্দ আমরা কখনও শুনি নাই। অল্পের জন্য বড় বাঁচিয়া গিয়াছি। আমাদের সম্মুখে কিছু দূরে কয়েকটী প্রস্তর-খণ্ড কালীর তরঙ্গে সশব্দে নিক্ষিপ্ত হইল। সকলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলাম। আমরা আরও খানিক কালীর তীরে অগ্রসর হইয়া নেপাল রাজ্যে একটা জলপ্রপাত দেখিতে পাইলাম। যেখানে জল পতিত হইতেছে সে স্থলের প্রস্তর ক্ষয় হইয়া গহ্বরের আকার ধারণ করিয়াছে। কিয়ৎকাল গমনের পর পুনরায় সেতু পার হইয়া ইংরাজ সীমানায় পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়া একটা বড় জলপ্রপাত দেখিতে পাইলাম। ইহা হইতে প্রায় ১৫০।২০০ হাত নিম্নে প্রচুর ধারায় জল পতিত হইতেছে। বহু পর্ব্বত নদ নদী চড়াই উৎরাই অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত দেহে প্রায় ৩।৪ টার সময় মালপায় তাঁবু ফেলা গেল। এখানে লোকালয় নাই। ডাক পিয়নদের একটা আড্ডা আছে।

আজ দুপুরের পর হইতে আকাশটা বেশ মেঘলা। মাঝে মাঝে অল্প অল্প বর্ষণ হইতেছে; পথও বেশ পিছল হইয়াছে। তাই আমাদের সতর্ক হইয়া গিরি পথে অগ্রসর হইতে হইতেছিল। কালীর পার্শ্বেই তাঁবু খাটান হইয়াছে। পাছে রাত্রে বেশী বৃষ্টি হয় সে জন্য তাঁবুর পাড় কাটিয়া দেওয়া গেল। আজ সন্ধ্যার দৃশ্য বড়ই ভীতিপ্রদ। প্রকৃতি যেন ভৈরবী মূর্ত্তিতে দুলিতেছে। কালী ঘোর রবে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ,—মনে হইতেছে, পলকে দুনিয়াটি উলট পালট হইয়া যাইবে। পার্ব্বত্য নদী পার্ব্বত্য জাতির মতই তেজস্বী। ডাকপিয়নদিগের আড্ডা হইতে কাঠ কিনিয়া আনা হইল। ভিজা কাঠে উনান জ্বালা কি কষ্টকর। মেঘলার জন্য আজকে রাত্রে একটু শীত অনুভব করিলাম।

৮ই আষাঢ় শুক্রবার—মালপা ত্যাগ করিয়া কাটার-পাণী চড়াই পথে অগ্রসর হইলাম। সকালে আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। নীল গগন যেন আমাদিগের দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিতেছে। সূর্য্যকিরণসম্পাতে পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলি স্বর্ণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। চতুর্দিকের দৃশ্য কি মনোরম। শৈল-শোভা সন্দর্শনে অভ্যস্ত হইলেও আমাদের নেত্র এই স্বভাব সৌন্দর্য্য অবলোকনে একটু ক্লান্ত হইল অতঃপর সুনিবিড় বন অতিক্রম করিয়া বিছাতি গোপের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে তুষার-আচ্ছাদিত স্থানে আসিলাম। কালীর তলদেশ জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। ভিতর দিয়া বরফগলা স্রোত পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানের নাম লামারি। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে সিঁড়ি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা উৎরাই পথে নামিতে লাগিলাম। এই সিঁড়ি-ওয়ালা গিরিপথের নাম পেলসিখি। এই পথে ভুটিয়া ব্যবসায়ীরা বোঝাই মেষ ও ছাগলের দল লইয়া গমনাগমন করিতেছে। মাঝে মাঝে ইহাদের বিশ্রামের জন্য আড্ডা আছে। বলবান মেষের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া আছে। ইহারা শৃঙ্খলার সহিত পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে। বেলা প্রায় ৪টার সময় বুধি নামক স্থানে আসিয়া স্কুল ঘরে আশ্রয় পাওয়া গেল। বুধিগ্রাম প্রায় ১হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত।

গার্ব্বিয়াং।—৯ই আষাঢ় শনিবার সকালে বুধির নিকট বিদায় লইয়া গার্ব্বিয়াং অভিমুখে যাত্রা করা গেল। আজ খুব চড়াই চড়িতে হইবে। বুধি হইতে গার্ব্বিয়াং ৪।৫ মাইলের বেশী নহে। এই পথটী মোটেই বিপদ্‌জনক নহে। কিন্তু এই অল্প পথ অতিক্রম করিতে আমাদের যৎপরো-

পাঙ্গু—শ্রীযুক্ত পানসিং মহাশয়ের বাটী

নাস্তি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এখন আমরা গিরিপথে ঊর্দ্ধ দিকে উঠিতে লাগিলাম। আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন।

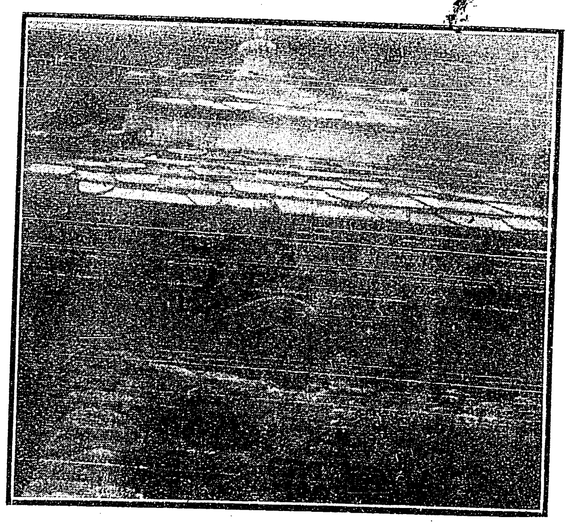

ধারচুলা—বড় রাস্তার উপর এই গৃহ গ্রামের প্রধান ঠিক করিয়া দিলেন

আমরা যেন মেঘলোকে যাত্রা করিয়াছি। আমাদের চারিদিকে ঊর্দ্ধে এবং পদতলে মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে।

সম্মুখে পশ্চাতে নভে এবং পদতলে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বনস্পতি সকল অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ জটিলতার মধ্য দিয়া স্বপ্নাবিষ্টের এখন আমরা গলদ্‌ঘর্ম্ম দেহে পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইলাম। তখন আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। উপর হইতে চতুর্দ্দিকের মনোরম দৃশ্য আমাদের নয়ন-পথে

নিরপাণীয়া নিচের রাস্তা। ভূটিয়া পুল পারে নেপাল রাজ্যের সীমানা

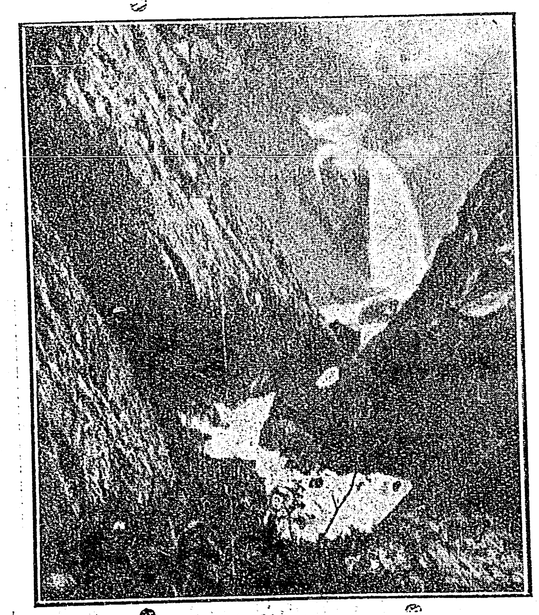

নীরপাণীয়া—ইংরাজ সীমানায় একটী বড় জল-প্রপাত

মত বিচরণ করিতে করিতে সূর্য্যালোকে ইন্দ্রজাল কাটিয়া গেল। তখন আমরা পর্ব্বত-শিখরে উত্থিয়াছি। বহু কষ্টে পতিত হইল। বুধি গ্রাম একটী বিচিত্র বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। দূরে—বহুদূরে বনস্পতি-মণ্ডিত পর্ব্বত-শিখর-গুলি কেমন শোভা পাইতেছিল। এই বিচিত্র দৃশ্যগুলি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পর্ব্বতের উপর অনেকটা সমতল ভূমি। তাহাতে শ্বেত, লোহিত, নীল, পীত, বিবিধ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। নিকটস্থ প্রস্তরস্তূপ ও ছোট মন্দির এ স্থানটাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। এ স্থানে দেবোদ্দেশে ভুটিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিরা পূজা অর্চ্চা করিয়া থাকে। প্রস্তরস্তূপ-সংলগ্ন বংশদণ্ডে ছিন্ন শ্বেত ও রক্ত-বস্ত্র দোদুল্যমান দেখিলাম। সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের শিখর হইতে অবতরণ করিয়া একটী ঝরণার নিকটে আসিলাম। পর্ব্বতশীর্ষ হইতে এই জল-প্রপাত সবেগে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। শীতকালে এই প্রপাত জমিয়া যায়। তখনও খানিক তুষার বর্ত্তমান ছিল। এই তুষার অতিক্রম করিয়া অবতরণকালে কালী নদী-তীরস্থ উচ্চ সমতল ভূমি

মালার উপরিস্থিত দূরবর্ত্তী গার্ব্বিয়াং গ্রামের মোহন দৃশ্য সন্দর্শন করিলাম।

গার্ব্বিয়াংয়ে পৌঁছিলাম তখন দুপুর। এই স্থানের ধনী ও বিজ্ঞ বড়লোক ব্যবসাদার নন্দরামজী ও কল্যাণ সিংহের উপর আসকোটের রাজওয়াড়া সাহেব চিঠি দিয়াছিলেন। সেই পরিচয়-পত্র পাইয়া এঁরা বেশ খাতির করিলেন। স্কুল-বাড়ীর একটা কামরায় পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। গ্রামবাসীরা দুপুরবেলায় আসিয়া ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার শ্রীকিষণজীকে ঘেরিয়া চিঠিপত্র টাকাকড়ি আদান প্রদান করিতেছে। পোষ্টমাষ্টারজী এই স্থানের স্কুলের হেডমাষ্টারের পদ পাইয়াছেন।

স্কুলঘরের আঙ্গিনায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁবু ফেলিয়াছেন। তিনি আমাদের কয়েক দিন পূর্ব্বে আলমোড়া হইতে পদব্রজে গার্ব্বিয়াংএ আসিয়াছেন। সঙ্গে একটী-মাত্র পাঁড়েজী। আলমোড়ার পোষ্টমাষ্টার মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই লোকটীকে দিয়াছেন।

গার্ব্বিয়াংএ পৌঁছিয়াই কাকাবাবু পূজনীয় গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার সহিত মানস-কৈলাস পথের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। বঙ্গ মহিলা এ তীর্থে আসিয়াছেন দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। স্কুলবাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একজন ভুটিয়ার দ্বিতল বাড়ীতে থাকা স্থির হইল। এখান হইতে জলের ধারা বেশী দূরে নয়।

গার্ব্বিয়াংএ অনেক লোকের বাস। পুরুষেরা অধিকাংশই ব্যবসা করিবার জন্য তিব্বতে গিয়া থাকে। মেয়েরা খুব বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ—মাঠে সারা দিন চাষবাসের কাজ করে। কিন্তু পুরুষরা ভারী কুঁড়ে। একটা জায়গা আছে রাস্তার ধারে—সেখানে জটলা করে, খোস গল্পে সময় কাটায়। আড্ডার জায়গাকে "রংবং" বলে। যারা ব্যবসা করে, তাদের গৃহগুলি অধিকাংশই দ্বিতল ত্রিতল। অনেকটা জায়গা লইয়া ঘেরা উঠান আছে। তাতে প্রায় ৫০০।৭০০ ভেড়া ছাগল থাকিতে পারে। ঐ সকল জানোয়ার হইল তাহাদের ব্যবসার মূল সম্পত্তি বা দল হিসাবে ছোট বড় সওদাগরি জাহাজ।

এ দেশের মেয়েরা বেশ সুন্দরী; লজ্জা তাদের

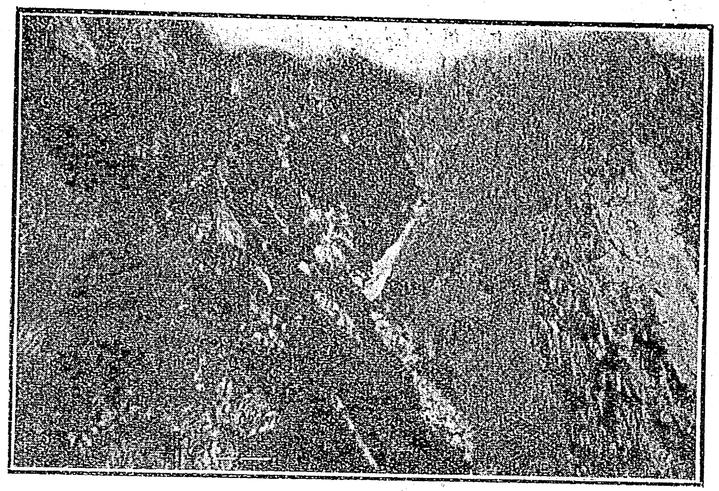

মালপা হইতে পথে পাহাড়ের কঠিন রাস্তা

ভূষণ। পুরুষের সঙ্গে সলজ্জ হাসি সহ আলাপ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক গৃহে বর্ষিয়সী গৃহিণী পদ লইয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক গৃহে মদ্য চোলাইয়ের ব্যবস্থা আছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সন্ধ্যাকালে আহারের সহিত

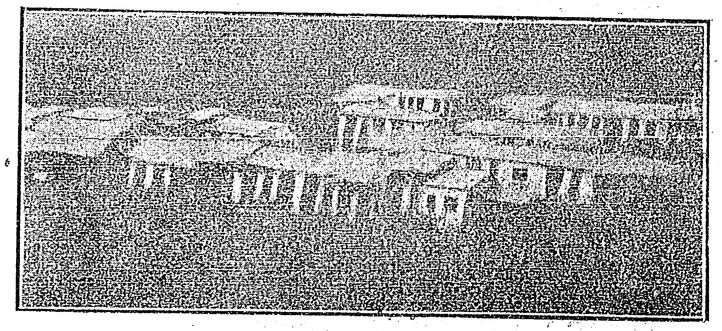

সিরদাং গ্রামের গৃহগুলি

মদ্যপান করিয়া থাকে। এই পর্ব্বতবাসীদের শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকে ডুডুং উৎসব বলা হয়। ইহা বেশ নূতন ধরণের। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে ঘরের মধ্যে একটা বেদী করা হয়। তাহার উপর মৃতের অনুরূপ শরীর নির্ম্মাণ করা হয়। পুরুষ হইলে ঐ

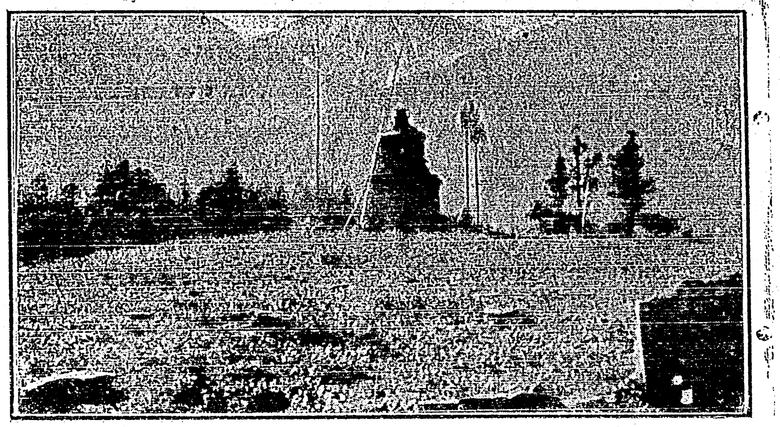

মূর্ত্তির সঙ্গে বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি দেওয়া হয়। সেই বেদীর সামনে অগ্নি প্রজ্বালিত করা হয়। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা যবভাজা লইয়া মূর্ত্তির সম্মুখে কিছু দেন এবং যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত আছেন, তাঁহাদেরও দেওয়া হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা মূর্ত্তির নিকটে শোক প্রকাশ করেন এবং মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন। পুরুষ এবং মহিলারা আসিয়া মদ্য পান করেন। আমাদের দেশের বৃষোৎসর্গের মত চামরী বৃষ মৃতের আত্মার মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। মৃতের নিকট-আত্মীয় সেই গরুটিকে ঘাস খাওয়ান এবং কাঁদিতে থাকেন। যাঁহারা এই উৎসবে যোগ-দান করেন, তাঁহারা তলোয়ার লইয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকেন। পুরস্ত্রীরা ঐ উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহারা তলোয়ারের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত তলোয়ার ও অপর হাতে রংবেরংয়ের রুমাল লইয়া নৃত্য করেন। মেয়েদের নাচ বেশ সুন্দর।

ছোট মন্দির ও প্রস্তর স্তূপ

গার্ব্বিয়াং ১১০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত সমতল ভূমিতে নানা রকমের উজ্জ্বল বর্ণের ফুলে চারিদিক পরিপূর্ণ কাটা গোলাপ প্রভৃতি ফুল, এই সমতল ভূমির চারিদিকে তুষার-ধবল শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে

নন্দরামবাবু ও তাঁহার ভাই দিলীপসিং (Kgess) কিং নামক এক ব্যক্তি ও তাহার ভাইকে মানস-কৈলাস যাত্রার Guide বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। (Kgess) কিং হিন্দি ও বাংলা বেশ বুঝিত ও অল্প অল্প বলিতে পারিত। তিব্বতীদের ভাষা ও ভাব বুঝিবার জন্য এ ব্যক্তিরা আমাদের খুব কাজে আসিয়াছিল। একদিকে বোকরা পাহারা ও অপর দিকে তিব্বতে দোভাষীর কাজ করিয়াছিল।

Sub-divisional officer শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় এই সময়ে গার্ব্বিয়াং পরিদর্শনার্থ আসেন। বাঙ্গালীর মেয়ে এ তীর্থে যাইতেছেন দেখিয়া তিনি আনন্দপ্রকাশ করিলেন। এই সময়ে কাকাবাবু Hill Diarrhoea অসুখে আক্রান্ত হন। ত্রিবেদী মহাশয় ঔষধাদি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি যতদিন গার্ব্বিয়াংয়ে ছিলেন, প্রত্যহ দুই তিনবার আসিয়া রোগীর সংবাদাদি লইয়া যাইতেন। এঁর সাহায্য ব্যতিরেকে তিব্বতের পথের জন্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইত।

গার্ব্বিয়াং—সাব্ ডিবিসান অফিসার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ত্রিবেদী ও তাহার সঙ্গী

গাঙ্গুলি মহাশয়ের পরামর্শ মত ঔষধ ও পথ্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। এই মরণাপন্ন অসুখে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাকাবাবু অল্প নিরাময় হইলে তিনি বলকারক পথ্য দান করিয়াছিলেন। তাহাতে কাকাবাবু অচিরে বল ও স্বাস্থ্যলাভ করেন।

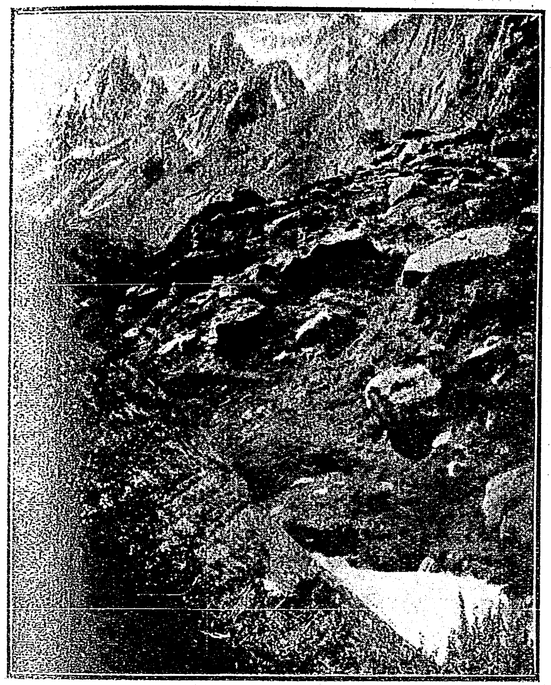

লিপুধুরার তুষার দৃশ্য—কর্ণালীতীরে তাকলাকোট

প্রায় ১৫।১৬ দিন অবস্থান করিবার পর লিপুধুরা পাসের তুষারের উপর পথ খুলিবার খবর আসিল। পাসের রাস্তা না খুলিলে যাত্রীদের আদৌ যাইতে দেওয়া হয় না। বরফ গলিয়া কমিয়া না গেলে ভুটিয়া ব্যবসায়ীরা যায় না।

২২শে আষাঢ় শুক্রবার বেলা ১২৷৷০টার সময় গার্ব্বিয়াং ডাকবাংলা হইতে তকলাকোট অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা কাল্লা নামক স্থানে পৌঁছিলাম। গার্ব্বাং হইতে কালী নদীর পুল পার হইয়া নেপাল রাজ্যের রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। এখানকার রাস্তা বড়ই সঙ্কীর্ণ—কোথাও বড়ই উঁচু, কোথাও বড়ই নীচু; কোন জায়গায় রাস্তা নাই, কোন রকমে যাওয়া যাইতে পারে। রাস্তা এত খারাপ, কারণ—রোজই কিছু কিছু বসিয়া যায়; নিত্যই নূতন রাস্তা তৈয়ার করিয়া যাইতে হয়। অল্প দূর যাইয়া

পরমার্থিক ক্যাম্প, কর্ণালীর তার, রায় বাহাদুর ক্যাম্প, আমাদের তাঁবুর সম্মুখে নন্দবাবুর দোকানঘর, পর্ব্বতের উপরে রাণী সাহেবার গৃহ ও তাকলাকোটের প্রসিদ্ধ মঠ

নেপাল রাজ্যের পুল পার হইয়া ইংরাজ রাজ্যে আসিলাম। এদিকে রাস্তা মন্দ নহে। পাহাড়ের গা কাটিয়া কোথাও

রাবণ হ্রদ ও হ্রদে দ্বীপপুঞ্জ

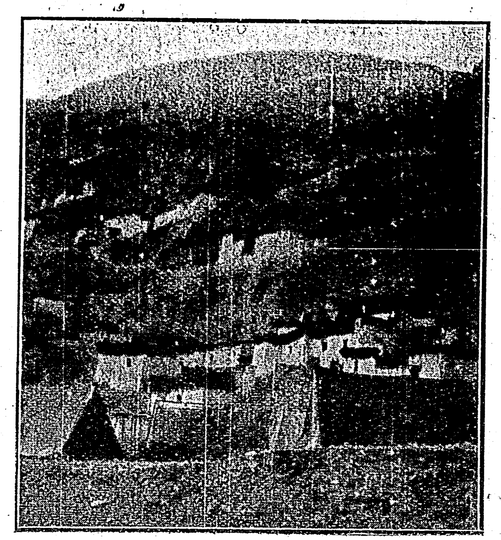

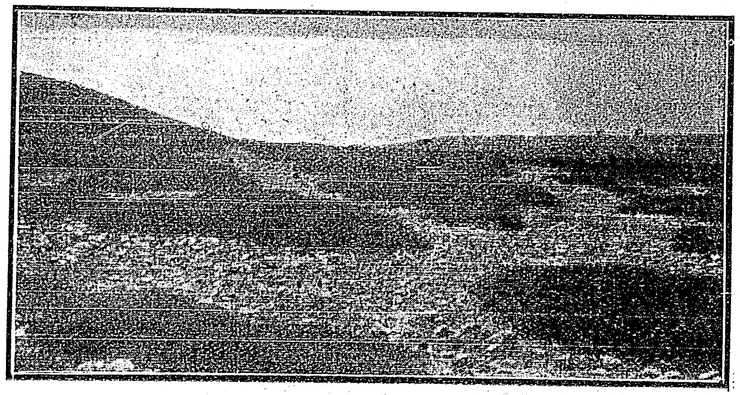

এক হাত কোথাও দুই হাত রাস্তা আছে। অনেকগুলি পার্ব্বত্য ঝরণা পার হইয়া বরফের কাছে আসিয়া হাজির

হইলাম। এখানে রাস্তা বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে—কালী নদীর এপার ওপার বরফে সমাচ্ছন্ন। সেই প্রকাণ্ড বরফের নিম্ন দিয়া জল ভীষণ গর্জ্জনে বহিয়া যাইতেছে। বরফ পার হইয়া খানিক আসিয়া ভুটিয়ার পোল পার হইয়া কাল্লায় তাঁবু ফেলা গেল। এই স্থানে জল পাহাড়ের ভিতর হইতে আসিতেছে। রাত্রে বেশ একটু শীত বোধ

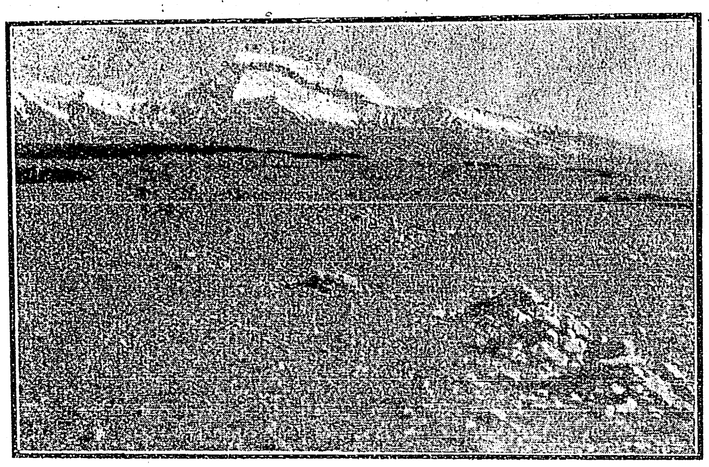

গরলা-মান্ধাতা

হইল। পরদিন প্রাতে সূর্য্যের আলোকে পাহাড়ের চূড়ায় বরফগুলি চিক চিক করিয়া উঠিল। আহারাদি করিয়া রওনা হওয়া গেল। ক্রমেই চড়াই উঠিতেছি,—রাস্তার

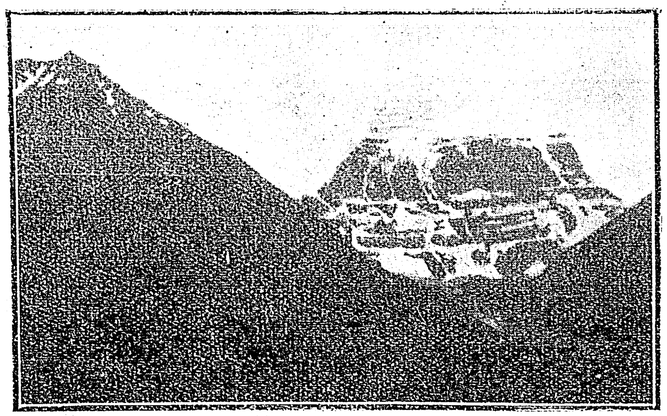

কৈলাস শৃঙ্গ

দুধারে কাঁটা গোলাপের জঙ্গল। আমরা যত লিপুপাসের কাছাকাছি যাইতেছি, ততই বরফ বেশী হইতে চলিয়াছে এবং ততই ঠাণ্ডা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা এখন ১২০০০ ফিটের উপর উঠিয়াছি। বড় গাছ নাই; এখন কেবল গোলাপের জঙ্গল আর মাঝে মাঝে প্রস্ফুটিত ভার্ব্বিণার ঝোপ। রাস্তার দুধারে নানা রংয়ের কাঁটা গোলাপ পাহাড়ের গাত্র আলো করিয়া আছে। গোলাপগুলির পাপড়ী বেশী নাই বটে, কিন্তু অনেক ফুটিয়া আছে—গাছের পাতা দেখা যায় না। সন্ধ্যার সময় ১৫০০০ ফিটের উপর সঙ্গাচান নামক স্থানে আসা গেল। জায়গাটা বড় স্যাঁতসেতে। আমাদের ডান পাশে বরফের নদী। জল কি ঠাণ্ডা—হাত দিলেই হাত বাঁকিয়া যায়, মোটেই সাড় থাকে না। এই স্থান হইতে কালী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

ঐ স্থান লিপু গিরিসঙ্কটের প্রবেশ দ্বার। গত বৎসর অত্যধিক তুষারপাত হওয়ায় এখনও বরফ গলিয়া যায় নাই। রাত্রে ঠাণ্ডায় ঘুমাইতে পারা গেল না। ভোর ৫টায় লিপু পার হওয়ার জন্য রওনা হওয়া গেল। লিপুপাসে যতই বেলা বাড়ে ততই ঝড় বৃষ্টি বাড়িয়া যায়। সে জন্য লিপু পার হওয়া ভোরের বেলাই সঙ্গত। আজকে ভোরেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। পাস পার হওয়া বড়ই সঙ্কটাপন্ন। বিশ হাত দূরে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না—এত কুয়াশায় চারিদিক ঢাকিয়া গিয়াছে। খানিক দূর আসার পর বরফের উপর দিয়া চলা সুরু হইল। ভারবাহী ছাগল-ভেড়ার দল বাণিজ্যের দ্রব্য-সম্ভার লইয়া বরফের উপর দিয়া যে স্থান দিয়া গিয়াছে, সেই রেখাতেই মানুষ চলাচলের পথ পড়িয়াছে। ভারবাহী পশুরা বরফে চলাচল করায় নরম বরফ কিছু কিছু শক্ত হইয়াছে। রেখা ছাড়া অপর দিক দিয়া যাইলে বিপদের সম্ভাবনা। বরফে চলিবার আগে মাল-বোঝাই ঘোড়গুলিকে আগাইয়া দিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোড়ার পা বরফে ডুবিয়া যাইতে

লাগিল। ইহা দেখিয়া আমরা সকলে ঘোড়া হইতে নামিয়া পদব্রজে লিপুধুরা পার হইবার জন্য অগ্রসর হইলাম। আমাদেরও পা বরফে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

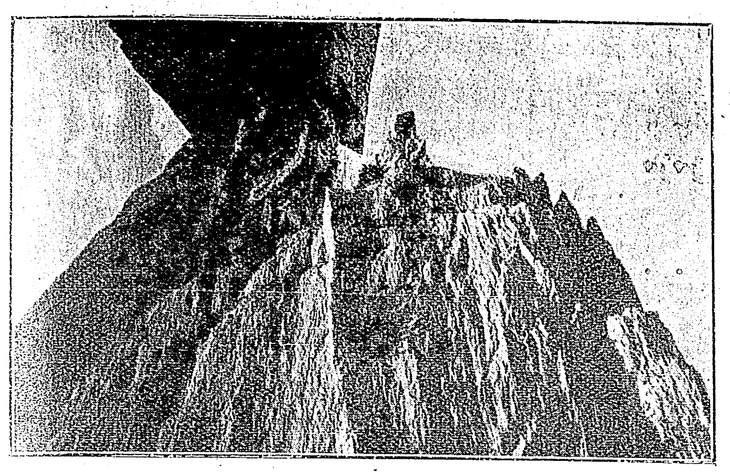

কৈলাস পরিক্রমা পথে বরফ-গলা নদী

বহুক্ষণ চেষ্টার পর আমরা শক্ত বরফে আসিয়া পৌঁছিলাম। ক্রমে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ও বৃষ্টিতে বরফে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল। প্রায় বেলা ১২টার সময় লিপুপাসের উচ্চ শিখরে উঠিলাম। ১৬০০০ ফিট উপরে আমরা লিপুপাসের পথে পেঁজা তুলার বলের মত এক রকম ফুল, বরফের খুব কাছেই পাইলাম।

এখানে ভুটিয়াদের ছোট ছোট প্রস্তরের স্তূপ আছে; তাহাতে বিস্তর নিশান আছে। আমাদের সঙ্গী ভুটিয়ারা দেবতার উদ্দেশে প্রস্তর স্তূপে নত হইয়া দেবতাদের স্তুতি পাঠ করিল। লিপুলেক পাস সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২৬০০০ ফিট উচ্চ। এতক্ষণ কেবল বরফের চড়াই উঠিতেছিলাম। এইবারে আমাদের উৎরাই করিতে হইবে। নামিবার সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমরা শনৈঃ শনৈঃ বরফ হইতে নামিতে লাগিলাম। অত্যন্ত ঠাণ্ডায় শ্বাস রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। অল্প দূর যাইতে না যাইতেই হাঁপাইতে হইল। প্রায় ১৷৷০টার সময় অভিমুখে যাওয়া গেল। তিব্বতে পৌঁছিয়াই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। এতদিন আমাদিগকে অতি বন্ধুর পর্ব্বত-ভূমির উপর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু হিমালয় পার হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করার পর আমরা প্রায় ১৪০০০ ফিট উচ্চে এক প্রকাণ্ড সমতল উপত্যকায় পৌঁছিলাম। যতদূর দেখা যায়—হিম-শৃঙ্গগুলি দক্ষিণে যেন ঢেউ খেলিয়া রহিয়াছে। ক্রমেই অল্প অল্প গরম বোধ হইতে লাগিল। এ স্থানে অল্প অল্প চড়াই, উৎরাই,—মেঘ বা বৃষ্টি নাই, বেশ রৌদ্র দেখা দিল। আমাদের শীতের অসাড়তা কাটিয়া গিয়াছে। কাপড় শুষ্ক

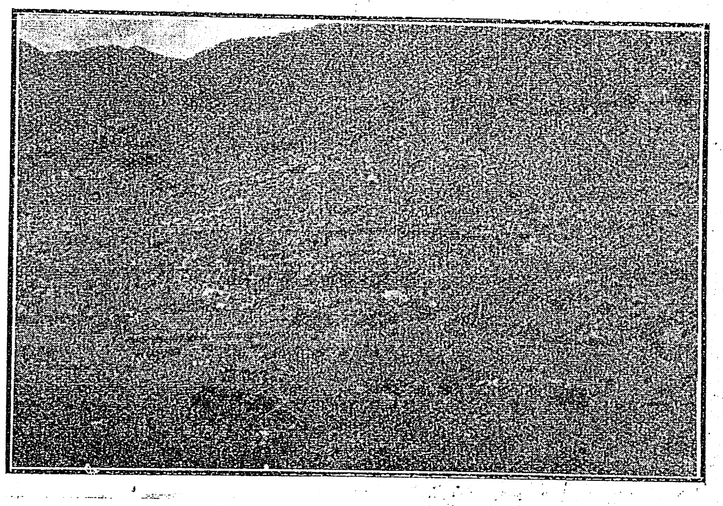

পরিক্রমা পথে জনটুল ফুক গুম্ফা

হইয়া গিয়াছে। প্রায় বেলা ৩টার সময় তাকলাকোট সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। তাকলাকোট, তাকলাকার বা পুরাং জনপদ এই রাস্তায় তিব্বতের প্রথম বসতি।

আসকোটের রাজোয়াড়া সাহেব গার্ব্বিয়াং অধিবাসী নন্দরাম বাবুকে একখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। ইনি তাকলাকোটে ব্যবসায় করেন। তাকলাকোটে পৌঁছিলে

স্বামী কার্য্যান্তরে গিয়াছেন বলিয়া বন্দুক হাতিয়ার বা লোক দিতে পারিলেন না।

রাণী সাহেবার বাটীর অপর দিকে তাকলাকোটের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ। এই মঠের ছাদের সোনালী কলসগুলি (Spires) অনেক দূর হইতে বেশ চমৎকার দেখায়। প্রবেশ-দ্বারের ভিতরে বৃহৎ ধ্বজা প্রোথিত করা আছে। এই মঠে প্রায় ২০০।২৫০র অধিক বিদ্যার্থী থাকে। মঠটী বেশ বড়; অনেক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। বিদ্যার্থীদের থাকিবার স্বতন্ত্র ঘর আছে। ইঁহারা সকলেই মঠের শাসন মানিয়া চলেন। যাঁহারা স্থবির, তাঁহারা নির্ব্বাণের পথে থেকে তপস্যা করেন। এই মঠে অনেকগুলি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। কোন প্রকোষ্ঠে তথাগত প্রশান্ত মুখে শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ

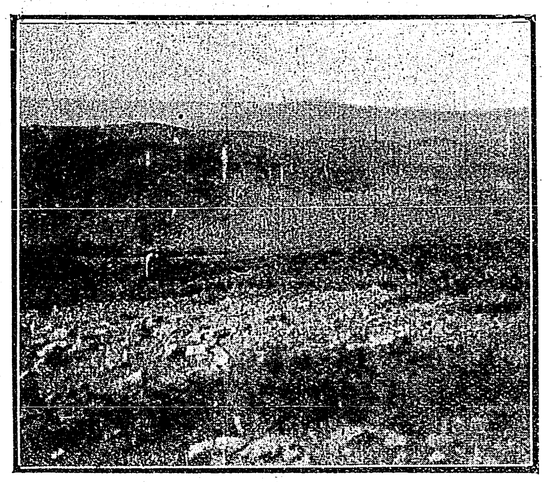

দূর হইতে মানস-সরোবর

দিতেছেন। এক স্থানে বুদ্ধদেব মারকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতেছেন এবং সাফল্যের দৃঢ় ছায়া মুখে অঙ্কিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে ধাতুপাত্র স্থাপন করা আছে। তাহাতে প্রত্যহ প্রত্যূষে জল ভরিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হয়। দীপাধার ঘৃত-সংযোগে আলোকিত করা হয়। এই আলোক আদৌ নিভিয়া যাইতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেক মূর্ত্তির সম্মুখে একটী করিয়া ধর্ম্মচক্র (wheel of life) রাখা আছে। মঠের স্থানে স্থানে (wheel of prayer) প্রার্থনাচক্র আছে। এই মঠে বড় গ্রন্থাগার আছে। পুস্তকগুলি অতি যত্ন সহকারে রাখা হইয়াছে। দুন্দুভী তুরী, ভেরী ও নানাপ্রকার বাদ্য যন্ত্র, হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য ও তিব্বত-নির্ম্মিত ধাতুপাত্র-সম্ভারে প্রকোষ্ঠগুলি পরিপূর্ণ। এ দেশীয় নূতন ও পুরাতন বহু অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ালে টাঙ্গান আছে। মঠের লামারা আমাদের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা এঁদের বিহ্বল করিতে পারে নাই। এঁরা প্রাচীন আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন।

তাকলাকোটের লোকেরা শ্রমজীবী চাষা শ্রেণীর। পুরুষ অপেক্ষা নারীরা সর্ব্ব কর্ম্মে অধিক পরিশ্রমী। পুরুষেরা তিব্বতী বন্দুকে সজ্জিত হইয়া দল বাঁধিয়া শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত পরস্বাপহরণ, নরহত্যা এবং ডাকাতি লুণ্ঠন প্রভৃতি করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। প্রত্যেক বালক ও যুবক একটী করিয়া ছোরা, ছোট ছুরি, চকমকি, সূতা ও সূচ প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যাদি রাখিয়া থাকে। নারীগণ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া না থাকিয়া ছাগল ভেড়া প্রভৃতির লোম হইতে সূতা প্রস্তুত করে এবং তাহা হইতে ভাল ভাল ভোটিয়া কম্বল তৈয়ারী করে। তাকলাকোটবাসীদের মুখের রং তামাটে। ইহাদের গায়ের ভিতরের রং মুখ অপেক্ষা অনেক সাদা। পুরুষগণ রক্তবর্ণ এবং খয়ের রংএর পোষাক পরিয়া থাকে। নারীগণের নীলবর্ণের পোষাক বিশেষ প্রিয়। ইহারা শীতকালে শক্ত চর্ম্ম-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করে।

অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই। বিবাহিত হইলে পুরুষগণ কেশ মার্জ্জন ও বেশের নানা প্রকার পারিপাট্য করিয়া থাকে এবং টুপি পরিয়া থাকে। রূপসিগণও নানা প্রকারে চুল বাঁধিয়াও বেশের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন; এবং নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া থাকেন। অধিকাংশ রমণীর হাতে শাঁখের গহনা দেখিয়াছি। ইহারা প্রবাল, নানা বর্ণের প্রস্তর, শামুক, কড়ি, শাঁক প্রভৃতি দ্রব্যই অলঙ্কারে ব্যবহার করিয়া নিজ দেহের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তিব্বতবাসীদের চা প্রস্তুত প্রণালী বেশ নূতন ধরণের। ইহারা দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রণের পরিবর্ত্তে চায়ে লবণ ও মাখন সংযোগ করিয়া পান করিয়া থাকে। প্রথমে কেটলিতে কাঁচা চা-পাতার জল (liquor) প্রস্তুত হয়। পরে ঐ চা-জল একটা দুই ফিট লম্বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চোঙ্গের মধ্যে ঢালিয়া লবণ ও মাখন

সংযোগে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ভাঁটি দিয়া মথিত করা হইলে পুনঃ অন্য কেটলিতে উত্তমরূপে ফুটাইয়া পানের যোগ্য করে। ইহারা ঐ চায়ে ছাতু গুলিয়া আহার করিয়া থাকে। মদ্য, শুষ্ক মাংস, রুটি প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। মৃগয়ালব্ধ পশুর কাঁচা রক্ত পান করিতে ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে।

তাকলাথার মণ্ডীতে ব্যবসায় মুদ্রা বিনিময় অপেক্ষা দ্রব্য বিনিময়ে অধিক হইয়া থাকে। তিব্বতবাসীরা তিব্বতী ও নেপালী মুদ্রায় আদান-প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা ভারতবর্ষের রৌপ্য মুদ্রা অধিক পছন্দ করে না। এখানে ভারতীয় নোটের প্রচলন নাই। এ দেশীয় প্রচলিত মুদ্রাকে "তঙ্কা" এবং ভারতীয় মুদ্রাকে "কোম্পানী" কহিয়া থাকে। তঙ্কার আকার ভারতীয় আধুলি অপেক্ষা কিছু বড়। ওজনে অতিশয় হালকা। ইহাতে রৌপ্য নাই বলিলেও চলে—খাদের ভাগ খুব বেশী। রাণী সাহেবার নিকট হইতে নন্দরাম বাবু আমাদের কয়েক শত টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া এ দেশীয় মুদ্রা দিয়াছিলেন। নোট প্রতি ২৲ টাকা হারে বাঁটা দিতে হইয়াছিল। সকল সময়ে তঙ্কার মূল্য সমান থাকে না। এ বৎসর টাকা প্রতি ছয়টা তঙ্কা মিলিয়াছিল।

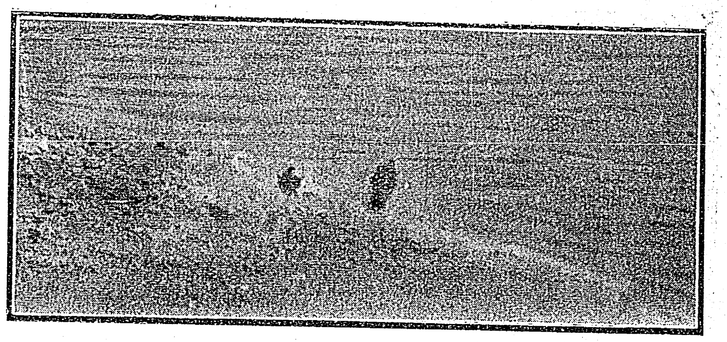

মানস-সরোবরের তীরে স্নান

তকলাকোট হইতে মানসকৈলাস অভিমুখে

নন্দরামজী আমাদের জন্য ঘোড়া ও চামরী বৃষর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মানস-কৈলাস ঘুরিয়া আসিতে প্রায় কুড়ি দিনের রসদ জোগাড় করিয়া যাত্রা করিতে হইয়াছিল।

২৭শে আষাঢ় বুধবার আহারাদি সারিয়া মানস-কৈলাসের দিকে রওনা হওয়া গেল। পথে প্রসিদ্ধ শিখ সেনাপতি জোরাওর সিংহের সমাধি দেখা গেল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জোরাওর সিং লাদাক হইতে তিব্বত জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন। সন্ধ্যায় রঙ্গুণ নামক স্থানে তাঁবু ফেলা গেল। কাছেই একটা বরফ-গলা জলের বড় ঝরণা। তিব্বতে অত্যন্ত দস্যুভয়; এজন্য আমাদের বন্দুক কয়টাই সজ্জিত রাখিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। বিলাতী বন্দুক এ দেশীয় দস্যুরা বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখে। পথে ছাগল, ভেড়া, এমন কি মনুষ্যের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম।

২৮শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে রঙ্গুণ ত্যাগ করিলাম। আমরা মান্ধাতা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়াই নিম্নে রাক্ষসতাল নামক প্রকাণ্ড হ্রদ ও উত্তর দিকে কৈলাস পর্ব্বতের প্রথম দর্শন পাইলাম। বিকালবেলা রাক্ষস হ্রদের তীরে তাঁবু ফেলিলাম। পথেই বালীনিবাসী অক্ষয়-কুমার গাঙ্গুলী মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাকলাকোটে নন্দরামজীর নিকটে ঔষধ ছিল। Keessকে একটা ঘোড়া দিয়া তখনই ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সূর্য্য অস্ত যাইলে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিল। জোর বাতাস ক্রমে থামিয়া যাইতে লাগিল। জলের হিল্লোলও কমিয়া যাইতে লাগিল। পরদিন বিকালে keess আবশ্যক ঔষধাদি আনিল। অসুস্থতা নিবন্ধন আজ শুক্রবার ২৯শে আষাঢ় রাক্ষস হ্রদের তীরে যাপন করিতে হইল। পরদিন অক্ষয় বাবু অসুস্থতা সত্ত্বেও মানসতীরে যাইবার বাসনা করিলেন। এই স্থান হইতে মানস-তীর প্রায় ৬।৭ মাইল। তাঁবুর লাঠি দড়ি ও কম্বল সাহায্যে একটা ষ্ট্রেচার প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খানিক দূর লইয়া যাওয়া হইল। পরে চামরীর পৃষ্ঠে অক্ষয় বাবুকে তুলিয়া দেওয়া হইল। মানসের পশ্চিম তীরে গোসল গুম্ফার সন্নিকটে সন্ধ্যাবেলা তাঁবু ফেলা হইল।

আজ আমাদের জীবনের বিশেষ স্মরণীয় দিন। সম্মুখে নীল সরোবর, দক্ষিণে মান্ধাতা পর্ব্বত ধাপে ধাপে যেন সরোবরের জলে নামিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা হ্রদকে বেষ্টন করিয়া আছে, উত্তরে কৈলাস এই মহাতীর্থের

তিনি আসিয়া অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রত্যেক যাত্রীকে শুকনা খড়খড়ে নারিকেল, কিস্‌মিস্, পেস্তা, মিছরী ও খেজুর প্রভৃতি দিলেন।

কর্ণালীনদী তীরে তাকলাকোট অবস্থিত। নন্দরামজী

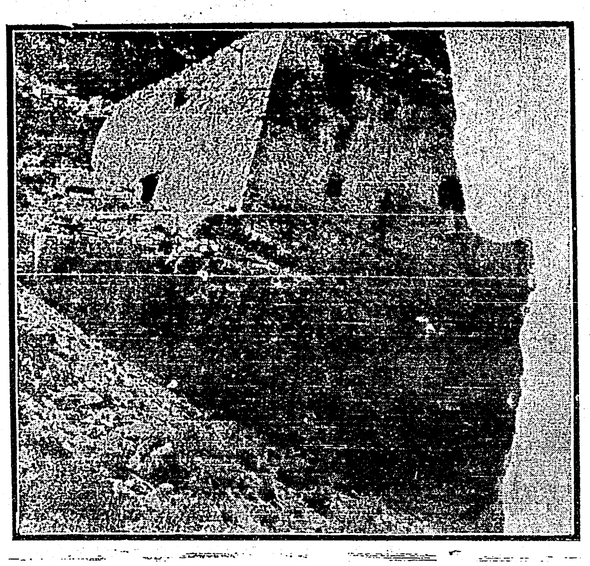

নন্দী গুম্ফা

বাবু তাঁহার দোকানের সামনে কর্ণালী তীরে তাবু ফেলিতে বলিলেন। এখানে কর্ণালী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া

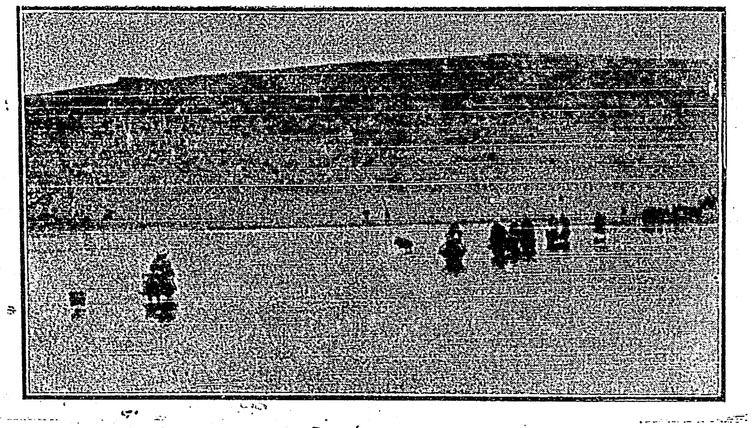

'সু' গুম্ফার নিকটে জলপার অপর দৃশ্য
জলসেত মানসসরোবর হইতে রাবণ হ্রদে গিয়াছে, যাত্রীদল ঝব্বু ও ঘোড়ায় ঐ স্রোত পার হইতেছে

বড় বড় বাজার বসে। শীতের শেষে বরফ কমিলে, এখানে নানা স্থান হইতে বণিকেরা আসিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিয়া থাকে।

এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বা জংপং (Gongpong) লাসা হইতে আসিয়াছেন। তাকলাকোটের মণ্ডি বা হাটের উপর এক উচ্চ পাহাড়ের চূড়ার যে প্রসিদ্ধ মঠ আছে, তাহার অপর দিকে এঁর বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। তাকলা-কোটের বাজারের রাজস্ব আদায়ের ভার এই শাসনকর্ত্তার উপর ন্যস্ত। তিনি কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়ায় আমাদের সহিত দেখা হইল না। ইঁহার স্ত্রী আমাদের খুব যত্ন করিলেন। শুনিলাম জংপং দেখিতে বেশ সুপুরুষ। তাঁহার স্ত্রীও সুন্দরী। তাঁহাকে সকলে রাণীমা বলে। পশ্চিম তিব্বতের লোক বেশীর ভাগই বড় বিশ্রী দেখিতে। তা'ছাড়া ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফাটিয়া না যায়, এজন্য মুখে খয়ের মাখিয়া থাকে। সেজন্য ইহাদের দূর হইতে ভূতের মত দেখায়। তাঁবুর মধ্যে জিনিষপত্রাদি গুছাইয়া রাখিয়া আহার প্রস্তুত করিবার জন্য ষ্টোভ জ্বালা হইল। ইতোমধ্যে এদেশবাসী বালক-বালিকারা আসিয়া উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল। যুবক-যুবতীগণ কৌতূহলপরবশ হইয়া টাকুতে পশমের সূতা প্রস্তুত করিতে করিতেই আমাদের তৈজস ও আসবাবপত্র টানাটানি করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ নির্ব্বাক হইয়া তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ বা জপযন্ত্র এবং জপমালা লইয়া, কেহ বা সূতা প্রস্তুত করিতে করিতে দোভাষীকে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইল। গরীব দুঃখীরা বদ্ধমুষ্টি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইল।

কর্ণালীর দুই তীরে দুইটী বাজার বসে। যেটী উঁচু বাজার নামে খ্যাত, গিয়াছে। ইহার জল অতি সুস্বাদু, ক্ষুধার উদ্রেককারক। সেই বাজারে অনেকগুলি ছাদহীন গৃহ আছে। বণিকেরা কিন্তু জল অতি অপরিষ্কার। এই নদীর উভয় তীরে দুইটী আসিয়া ঐ সকল গৃহের ছাদে তাঁবু খাটাইয়া স্ব-স্ব

দ্রব্য-সম্ভার সাজাইয়া ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এখানে জিনিষের দাম অত্যন্ত অধিক; কিন্তু কলিকাতার অনেক জিনিষই পাওয়া যায়।

দুই এক দিনের মধ্যেই নন্দরাম বাবু আমাদের জন্য নূতন যান-বাহনের বন্দোবস্ত করিলেন। ব্যবসা-ক্ষেত্রে নন্দরাম বাবুর খুবই প্রতিপত্তি। অতিরিক্ত দুইটা বন্দুক ও হাতিয়ার বহিবার জন্য নন্দরাম বাবুর সহিত তাকলাকোটের রাণী দর্শনে যাত্রা করিলাম। রাণী সাহেবার বাটী কর্ণালী তীর হইতে চড়াই প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। যতই চড়াই উঠিতে লাগিলাম, ততই বাতাস বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সিংহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাণী সাহেবার হুকুম মত দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। বাতাসে রাণী সাহেবার বাড়ীর ধূলা উড়িয়া বাধা দিতে লাগিল। বাড়ীর প্রাঙ্গণে নিশান বা ধ্বজা পতপত শব্দে উড়িতেছিল। এক দিকে গরু গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর থাকিবার ছোট ছোট ঘর; অপর দিকে গারদঘর; কয়েকটী কয়েদীও আছে। রাণী সাহেবার বাড়ী দ্বিতল,—অনেকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। যে প্রকোষ্ঠে আমাদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী ছিল। কক্ষটি বেশ সুসজ্জিত। সভায় উচ্চ আসনে রাণী সাহেবা বসিয়া আছেন। অপর দিকে অন্যান্য অভ্যাগত এবং আমরা তাঁর সম্মুখের আসনে স্থান গ্রহণ করিলাম। রাণী সাহেবা আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। চা পানের আয়োজন হইল। উপঢৌকনের প্রতিদান স্বরূপ পরদিন আমাদের তাঁবুতে দুধ ও দধি পাঠাইয়া কৃতার্থ করিলেন। রাণী সাহেবা স্বল্প-ভাষী এবং গম্ভীর প্রকৃতির।

খুড়িমা বলিলেন "রাণীমা, আমরা বাংলার পুরন্ধ্রী—বাহিরে পথ চলা আমাদের অভ্যাস নাই। তাহার উপর হিমালয়ের শিখর হইতে শিখরান্তরে তুষার অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও বিপজ্জনক; এবং তিব্বতের পথে দস্যুভয়ও যথেষ্ট আছে। অনুগ্রহ করে অন্ততঃ দুইজন শান্ত্রী পাহারা আমাদের জন্য দিবেন; আমরা তাহাদের সমস্ত ভার বহন করিব।"

রাণীমা। আপনাদের ভয় নাই, দস্যু তস্কর আপনাদের ত্রিসীমানায় আসিতে পারিবে না। এ দেশ আমরা বেশ সুশাসনে রাখিয়াছি। আপনাদের যাহা হাতিয়ার আছে তাহাতেই চলিয়া যাইবে, আর দরকার হইবে না।

পিসিমা। আপনাদের লোক হাতিয়ার না লইয়া কেবল নিশান লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইলে আমরা যথেষ্ট ভরসা পাই।

রাণীমা। কৈলাসের পথে তিব্বত সরকারের প্রেরিত

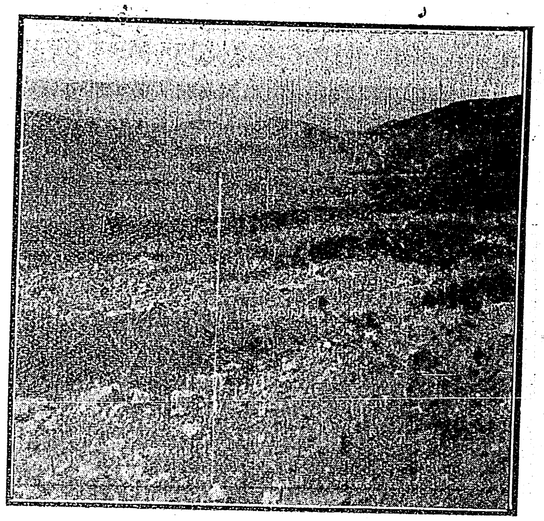

বর্থা হইতে দারচীপ পথে

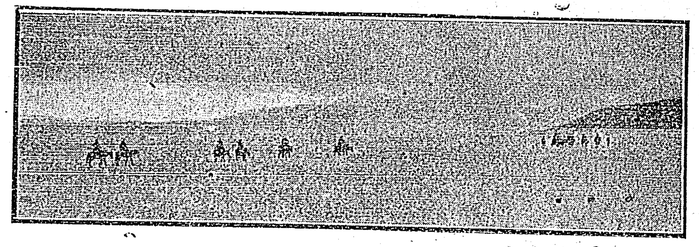

মানসকৈলাস-পথে মরুভূমি। যাত্রীদল

লোক আছে, তাহারা যাত্রীদের ও ব্যবসায়ীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। মা, আপনাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

মা ও পিসিমা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি এবং আপনার যথেষ্ট সময় নষ্ট করিয়াছি, সেজন্য ক্ষমা করিবেন। এখন তবে বিদায় দিন, নমস্কার।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় বিরাজমান। এই অতুলনীয় প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখিয়াই আমাদের পথ-কষ্ট, এমন কি, জীবন সার্থক হইল। Sven Hedin এই মঠের গোসল গুম্ফার অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন। পরদিন প্রাতে সরোবরে স্নান করিলাম এবং আহারান্তে মানসের তীর দিয়া "যু" গুম্ফকার সন্নিকটে মানসের তীরে তাঁবু লাগাইলাম।

৩২এ আষাঢ়ঃসোমবার। একটা স্রোত মানস হইতে বাহির হইয়া যু গুম্ফা মঠের পাশ দিয়া বহিয়া গিয়া রাবণ হ্রদে গিয়া মিলিয়াছে। ঘোড়া ও চামরী গরুপৃষ্ঠে আমরা ঐ নদী পার হইয়া কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই নদী গভীর নহে। কিন্তু স্রোত অত্যন্ত প্রখর।

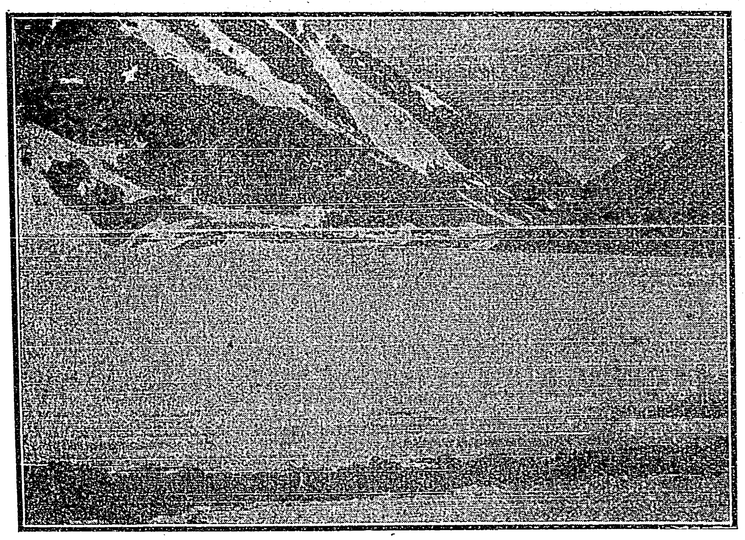

মানসের অপর দৃশ্য ; নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের তুষার গলিয়া যায় নাই

বিকালে বর্থা নামক এক তিব্বতী পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথে ছাগল, ভেড়া, গাধা প্রভৃতি জানোয়ারের মৃত-দেহ পড়িয়া আছে। গত বৎসর তিব্বতে অত্যধিক তুষারপাত হওয়ায় ঐ সমস্ত প্রাণী মারা পড়িয়াছে।

বর্থাতে আসিতে না আসিতেই অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাত আরম্ভ হইল। তাঁবু খাটানর সময় বাতাসে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল। যত অধিক উচ্চে উঠিতেছি ততই আমাদের আহার স্পৃহা কমিয়া যাইতেছে এবং গা বমি বমি করিতেছে। ক্রমে এত বেশী অরুচি হইতে লাগিল যে ক্ষুধা সত্ত্বেও খাইতে পারিলাম না। ভাত ও আলু বিস্বাদ লাগিত বলিয়া ভাতের মাড় খাইতে লাগিলাম। গার্ব্বিয়াং এবং তাকলাকোটে ভাল খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মুখরোচক দ্রব্য যাহা ছিল পথেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। খাদ্য দ্রব্য এরূপ লওয়া দরকার, যাহা অল্প আয়াসে এবং কম সময়ে প্রস্তুত হইতে পারে। শুকনা খাবার (dry food) যাহা লইয়াছিলাম তাহার মধ্যে "গুড়-পাপড়ী" ও ছাতু উল্লেখযোগ্য। "গুড়-পাপড়ী" এক অদ্ভুত জিনিষ। গুড় বা চিনি ঘৃত এবং আটা বা সুজী ইহার উপাদান। তিব্বতে ভাল ঘৃত বড় পাওয়া যায় না। ছাগল, ভেড়া ও চামরি গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃত পাওয়া যায়। ঐ ঘৃত অধিকাংশই পচা ও লোমযুক্ত। গার্ব্বিয়াংএ প্রায় ৩/ মণ গুড় পাপড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল ঐ শুষ্ক খাবারটী বিস্বাদ হইতে লাগিল। এই গুড় পাপড়ীতে গুড় ত যথেষ্টই ছিল ; কিন্তু পাপড়ী ছিল না। খালি পেটে বরফ জল পান করিলে উদরের পীড়া হইবার (Hill Diarrhœa) সম্ভাবনা। পথ চলিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলে বরফ-গলা জল পানের পূর্ব্বে গুড় পাপড়ী খাইতে হইয়াছিল। অরুচি নিবারণের নিমিত্ত পুরাতন তেঁতুল ও রাই-সরিষার গুঁড়া বিশেষ দরকার। গাঙ্গুলী মহাশয় ভাল সোনামুগ ভাজাইয়া গুড়া করতঃ চিনি সংযোগে শুষ্ক অবস্থায় লইয়াছিলেন। ঐ ডাল অল্প চেষ্টায় বেশ উৎকৃষ্ট খাদ্য হইয়াছিল। তিব্বতে রন্ধনের জন্য কাঠ পাওয়া যায় না। এই স্থানের লোকেরা পাহাড়ী কাঁটাযুক্ত লতা গুল্ম হাপর সাহায্যে জ্বালাইয়া থাকে। কষ্ট লাঘবের জন্য নন্দরামজী বাবু একটা হাপর দিলেন।

পরদিন (১লা শ্রাবণ) বর্থা ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দুধ বেশী পাওয়া গেল না। যাহাও পাওয়া যায় তাহার অত্যন্ত দুর্মূল্য। বর্থা হইতে কৈলাস বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। দৃশ্য কী গভীর, অপূর্ব্ব, মহান্।

কৈলাস সাধারণ পর্ব্বতের মত নহে। দেখিলেই ইহার বিশেষত্ব বুঝা যায় ; যেন কোন এক অজ্ঞাত নিপুণ শিল্পী এই

শ্বেত প্রস্তরের শিব-মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন। পর্ব্বত-শিখর হইতে একটা হিমশিলা (Glacier) বহু নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দারচীন বা কৈলাস পরিক্রমার প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন গ্রামরক্ষক কুকুরগুলি বিকট স্বরে গ্রামবাসীদিগকে নূতন পথিকের আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া দিল। এরূপ বৃহৎ লোমযুক্ত বলিষ্ঠ কুকুর আমাদের দেশে মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা যেমন প্রভুভক্ত, তেমনি শিকারপ্রিয়। অত্যধিক তুষার-পাতে মনিব বিপদে পড়িলে ইহারা ফেলিয়া পলায়ন করে না। পল্লীর সম্মুখে একটী চমৎকার প্রপাত ; তাহা হইতে অনেক নদী বহিয়া গিয়াছে। জলধারার সন্নিকটে ছাউনি ফেলিয়া থাকা হইল। এই স্থানে তিব্বত সরকারের লোক ছিলেন ; তাঁহারা আমাদের অভয় দান করিলেন। প্রতি বৎসর, পাহারা দিবার জন্য ইঁহারা অনেক-বার কৈলাস পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

২রা শ্রাবণ শুক্রবার দারচীন হইতে কৈলাস পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম। কৈলাস পরিক্রমার পথে চারি কোণে চারিটা মঠ বা গুম্ফা আছে। প্রায় বেলা ২টার সময় নন্দী গুম্ফায় উপস্থিত হইলাম। এই গুম্ফা ভুটানের অধিপতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাধারণ গুম্ফা যেরূপ হইয়া থাকে ইহা সেইরূপ। ধ্যানরত বুদ্ধমূর্ত্তি, বাদ্যযন্ত্র, দুন্দুভী, অস্ত্রশস্ত্রাদি, প্রার্থনা চক্র ইত্যাদি আছে। ধ্যান-স্তিমিত বুদ্ধমূর্ত্তির কিছু দূরে সম্মুখে একটা মুকুর এমনভাবে সন্নিবেশিত করা আছে যে, ভগবান বুদ্ধ যেন কৈলাস পর্ব্বতকে ধ্যান করিতেছেন। বহু ছোট ছোট নদী পার হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে চেড় গুম্ফার তলদেশে কৈলাস পর্ব্বতের একেবারে গায়ে তাঁবু ফেলা গেল। কৈলাস পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত কিরীট কোহিনূর হীরকের ন্যায় জ্বলিতেছে।

আজ রাত্রে কি প্রচণ্ড শীত! এত শীত সহ্য করা বড়ই কষ্টদায়ক। শীতে সর্ব্বশরীর জমাট বাঁধিয়া যাইবার মত হইতে লাগিল। ভোর প্রায় ৪টার সময় তাঁবু ভাঙ্গিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। আজ আমাদের গৌরীকুণ্ডুর চড়াই উঠিতে হইবে। বেলা বেশী হইলে ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা এবং তাহাতে কষ্টের সীমা থাকিবে না। বরফ গলিয়া যাওয়ায় পথচলা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়াছিল। পা হিমানীতে অবসন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। প্রায় ৬।৭ মাইল বরফের মধ্যে গমন করিয়া গৌরীকুণ্ডুর চড়াই—সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৯০০০ ফিট উচ্চে দলমলা নামক স্থানে

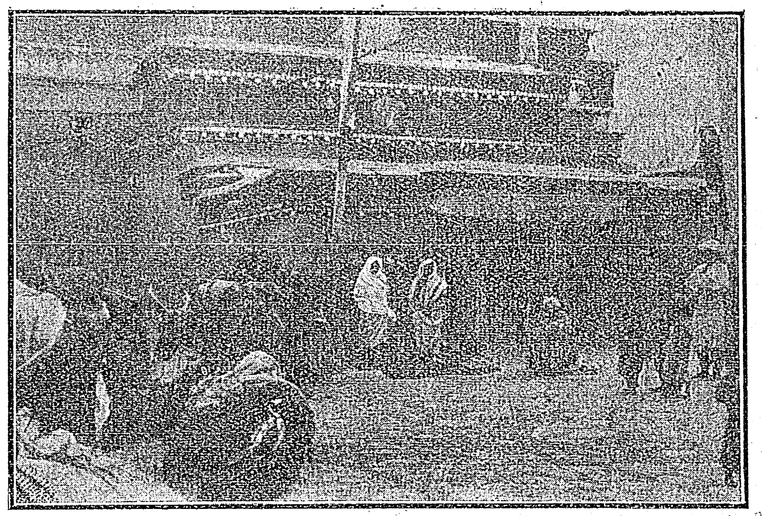

খেচরনাথ চারি গরু ও ঝব্বু এবং তাকলাকোটের নরনারী দণ্ডায়মান আছেন
১। মা ২। পিসিমা ৩। রায় বাহাদুর ৪। কাকাবাবু ৫। উপবিষ্ট দরবারী চৌধুরী

পৌঁছিলাম। এ স্থান হইতে কৈলাস পর্ব্বতের তুষার-শৃঙ্গ রৌদ্রে ঝক ঝক করিতেছে দেখিলাম। কৈলাস পর্ব্বতের উপরিভাগে তুষারসমূহের ঠিক নিচে একটা বৃত্তাকার রেখা সমস্ত কৈলাস শিখর বেষ্টন করিয়া আছে। অনেকে বলেন ইহা রাবণের দড়ির চিহ্ন। লঙ্কাধিপতি দশানন কৈলাস পর্ব্বতকে দড়ী বাঁধিয়া উপড়াইবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। দলমলা নামক স্থানটি অতি উচ্চ। নিকটস্থ প্রস্তর-স্তূপ এ স্থানটীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে শ্বেত, লোহিত, পীত ও নীল ইত্যাদি বর্ণের কাপড়ের টুকরা দেবতার উদ্দেশে তিব্বতের প্রথা অনুসারে বাঁধিয়া দেওয়া

হইল। অবতরণের পথ এবার বড়ই বিপদসঙ্কুল। এ পর্য্যন্ত আকাশ বেশ পরিষ্কার,—সূর্য্যরশ্মিতে কৈলাস-শিখর বেশ জাজ্বল্যমান ছিল। এক্ষণে আকাশে অল্প অল্প মেঘ সঞ্চার হইল। ক্রমে চঞ্চল মেঘ-মালা সূর্য্যের উপর দিয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মস্তকের উপরিস্থিত আকাশটী যেন একেবারে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। এই মেঘগুলি শীঘ্রই ঘনীভূত হইয়া তুষারে পরিণত হইয়া আমাদের মস্তকে পতিত হইবে।

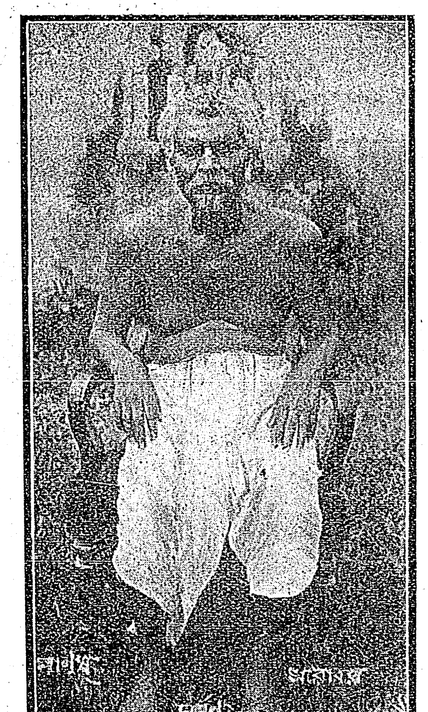

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ রায় (কাকাবাবু)

আমাদের পথপ্রদর্শক Keess তুষার ঝটিকার লক্ষণ বুঝিয়া কতিপয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইল।

চড়াইয়ের চেয়ে উৎরাই পথই আমাদের বেশী সঙ্কটময় বলিয়া মনে হইল। প্রথমেই গৌরীকুণ্ড নামক জমা হ্রদের নিকটে পৌঁছিলাম। ইহার তলদেশ জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। কি প্রাণোন্মাদকারী বিরাট দৃশ্য! কি ভীতি-সঞ্চারিণী নিস্তব্ধতা। শাদা বরফে ও কাল জলে এক অলৌকিক দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। এ দৃশ্যের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

মহাদেবের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে গৌরী এখানে বরফের ভিতর তপস্যা করিয়াছিলেন। আমরা গৌরীর পুত বারি স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা আশা পূর্ণ হইল। অতঃপর আমরা বরফাচ্ছাদিত শৈলের পর শৈল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। উৎরাই অত্যন্ত বিপজ্জনক। বরফে পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল। বরফে চলিতে চলিতে আমাদের সমস্ত শক্তি যেন ক্ষয় হইয়া গেল; অগ্রসর হইতে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। আমাদের মাথা ভীষণভাবে ঘুরিতে লাগিল; এবং মাঝে মাঝে শ্বাস-কৃচ্ছ্রতার উপক্রম হইল। নিতান্ত ক্লান্ত হওয়ায় দেহটাকে কোন রকমে টানিয়া লইয়া চলিলাম। তখন কণ্‌কণে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আকাশে দ্রুত সঞ্চরণশীল নীরদমালা। অল্পক্ষণ পরেই শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। অল্প বর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া সূর্য্যালোক দেখা দিল। অপরাহ্ণে জুনটুলফুক্ গুম্ফার সন্নিকটস্থ স্থান বিশ্রামের জন্য স্থির হইল।

৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার—আহারের পর জুনটুলফুক্ গুম্ফা ত্যাগ করিয়া দ্বারচীনের কাছে পৌঁছিলাম এবং কৈলাস পরিক্রমা শেষ করিলাম। ভগবান কৈলাসপতির পরিক্রমা আরম্ভ করিবার সময়ে বর্ষায় বরফ বৃষ্টিতে আমাদের স্নান হইয়াছিল, পরিক্রমা শেষেও জুনটুলফুক্ গুম্ফার পথে স্নান হইয়া গেল। অপরাহ্ণে বর্ষায় আসিয়া রাত্রি যাপন করা গেল।

পরদিন প্রাতে যখন আমরা আহার প্রস্তুত করিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময়ে ভীষণ-দর্শন দুইজন তিব্বতী লোক আসিয়া আমাদের তাঁবুতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। একজনের কাছে ঐ দেশীয় বন্দুক এবং অপরের কাছে তীক্ষ্ণ তরবারী ছিল। তাহা দেখিয়া আমরা আমাদের বন্দুক লইয়া কসরত আরম্ভ করিয়া দিলাম। তিব্বতের লোকেরা বিলাতী বন্দুককে বড়ই ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। দোভাষী Keessএর সাহায্যে আমরা করাইবার বিনিময়ে কি করিয়া ইহারা বন্দুকে অগ্নি সংযোগ করে তাহা দেখাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হইল। ইহারা বন্দুক জমীতে গাড়িয়া প্রতিবার গাদিয়া চকমকির সাহায্যে আগুন লাগাইয়া থাকে।

৫ই শ্রাবণ শনিবার—বর্ষা হইতে জুগুম্ফার আসিয়া মানসের মৃত মৎস্য সংগ্রহ করা হইল।

৬ই শ্রাবণ রবিবার—প্রাতঃকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কণ্‌কণে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। আমরা বেলায় স্নান করিব বলিয়া তাঁবুতে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গাঙ্গুলী মহাশয় মানসে স্নান করিয়া শরীরের উত্তাপ কমিয়া অচেতন ও সম্বিৎহারা হইয়া পড়েন। বহু কষ্টে তাঁর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। আমরা মানসের এই তীরে জল সংগ্রহ করি।

মানস সরোবর

মানস সরোবরের মত প্রসিদ্ধ স্থান পৃথিবীতে বিরল। ইহার অবস্থানটী বড়ই চমৎকার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজ্যে এসিয়ার মধ্যস্থলে হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তরে দেবভূমি কৈলাস পর্ব্বত, দক্ষিণে সুউচ্চ পর্ব্বত "গরলা মান্ধাতা," তাহার উচ্চতা ২৫৩০০ ফিটের বেশী, পশ্চিমে রাবণ হ্রদ; ইহার অপর নাম রাক্ষসতাল। Hedin সাহেবের মতে মানস সরোবর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৫০৯৮ ফিট উচ্চে অবস্থিত এবং রাবণ হ্রদ ১৫০৫৬ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। মানস সরোবর প্রায় বৃত্তাকার এবং উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত;—পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম। ইহার পরিধি Hedin সাহেবের মতে প্রায় ৪৫ মাইলের উপর এবং ব্যাস প্রায় ১৫।১৬ মাইল। ইহার গভীরতা মাপিবার জন্য Hedin সাহেব একটা টিন নির্ম্মিত নৌকা যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অনেকবার হ্রদের চারিদিকের গভীরতা মাপিয়াছিলেন। Maximum (বেশী) গভীর মাপ হইয়াছিল ২৬৮ ফিট। এবং Minimum (কম) গভীর মাপ হইয়াছিল ৮২ ফিট।

মানস সরোবরের চারি দিকে যে সকল উচ্চ পর্ব্বতাদি আছে তাহা হইতে বহুসংখ্যক স্রোতস্বতী বাহির হইয়া নিয়ত হ্রদের পুষ্টি সাধন করিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে হিমবারা হইতে একটা নদী বাহির হইয়া মানসে প্রবেশ করিয়া জলের সহায়তা করিতেছে। হিমালয়ের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। বর্ষণের অনুপাতে হ্রদের জলের পরিমাণ বাড়ে কমে। পার্ব্বত্য জলধারা হ্রদের বক্ষে আসিয়া প্রস্রবণ রূপে বাহির হইয়াছে।

শীতকালে এখানে দুর্জ্জয় শীত পড়ে এবং তুষারপাত হয়। হেডিন সাহেব বলেন, রাবণ হ্রদের জল অল্পে অল্পে জমে কিন্তু মানসের জল হঠাৎ জমিয়া যায়। হেডিন সাহেব গ্রীষ্মকালে জুলাই আগষ্ট মাসে জলের তাপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাপমান যন্ত্রে বেশী তাপ (Maximum তাপ) ৫৫।৫৬° ডিগ্রি। সরোবরে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। মানস সরোবর ও রাক্ষসতালের মাঝামাঝি একটা উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিয়াছি। সরোবরের মধ্যে যদি

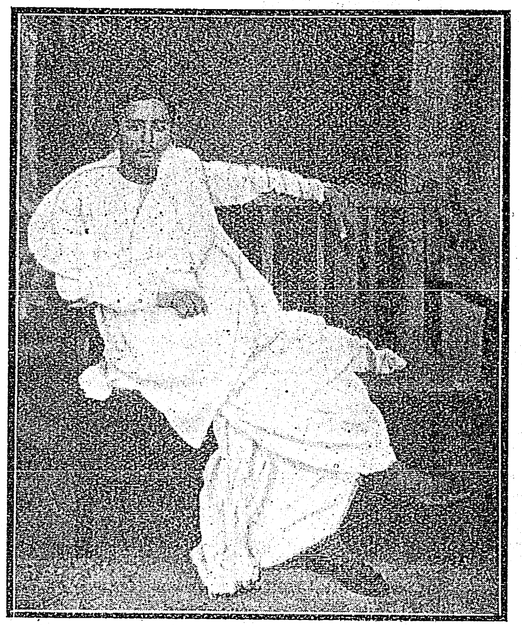

ফটোশিল্পী—শ্রীবিমল রায়

উষ্ণ প্রস্রবণ না থাকিত তাহা হইলে উহার জল বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় জমিয়া থাকিত।

শীতের সময় হ্রদের জল জমিয়া যায় এবং জলের সংপ্রসারণে আবর্জ্জনারাশি, পচা উদ্ভিদাদি তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। হ্রদের তীরে কোন কোন স্থানে ঘাসবন আছে; তাহাতে শশক বাস করে। যাত্রীরা শশকদিগকে তাড়া করিয়া থাকে কিন্তু মারিয়া ফেলে না। সরোবরে জলজ-তৃণাদি দেখা যায়। জল মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মৎস্য খেলিয়া বেড়ায়; কিন্তু কেহ মারে না। মানস সরোবরকে সকলে

অত্যন্ত পবিত্র চক্ষে দেখে বলিয়াই কেহ কোনরূপ হিংসা করে না। তরঙ্গ-তাড়িত মানসের মৎস্য সকল তীরে নিক্ষিপ্ত হইলে যাত্রীরা অতি যত্নের সহিত সংগ্রহ করে। রাজহাঁস এবং অন্যান্য জাতের হাঁস, নানা জাতির বক, Seagull এবং অন্যান্য পাখাও দেখা যায়। পর্ব্বতগাত্রে বেশ বড় জাতের চিল ও দাঁড়কাক দৃষ্ট হয়।

মানস সরোবরের নৈসর্গিক বর্ণনা করা বড় দুঃসাধ্য।

লেখক—শ্রীদীনবন্ধু রায়

দুই চারি রাত্রি মাত্র তীরে কাটাইয়া সবিশেষ বর্ণনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। নিশাবসানে ঊষার আঁধার-যবনিকা সরিয়া গেলে বিরাট দৃশ্যপট নয়ন গোচর হয়। প্রভাতে তুষারের উপর অরুণ উদয়ে কি বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে। মধ্যাহ্নে সরোবরের সলিলরাশি দূর হইতে একেবারে নীল দেখায়। দিবাবসানে সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণ-জাল দিগন্ত-বিস্তৃত তুষার-রাজ্যে যে মোহময় দৃশ্যপটের অবতারণা করে, তাহা পৃথিবীতে অতুলনীয়। দিনের বেলায় সরোবরে তুফান উঠে; দিবাশেষে আর তুফান থাকে না। বিজনতা এবং রিক্ততার রাজ্য বলিয়াই যে এখানে প্রকৃতি সকল সময়েই শান্ত সমাহিত অবস্থায় থাকে তাহা নহে। বাত্যা-বিক্ষোভে সরোবরের ভৈরবী মূর্ত্তিও একটী দেখিবার জিনিষ। তামসী নিশীথে নিস্তব্ধতার দৃশ্য কি ভয়াবহ! জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সরোবরের সলিলরাশি গলিত রজতধারার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এরূপ বিশ্ববিমোহন অপূর্ব্ব দৃশ্যে মনপ্রাণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। মানসের জল সুস্বাদু ও স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। এইরূপ পবিত্র জল জগতে দুর্লভ। অবগাহন স্নান করাতে শরীর স্নিগ্ধ ও সকল ক্লেশ নিবারিত হইল। পান করাতে নূতন বলের সঞ্চার করিল, এতদিনে আমাদের বহুদিন সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল। Sven Hedin শ্যাম্পেনের সহিত মানসের জলের তুলনা করিয়াছেন।

মানস সরোবরের তীরে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন বৃক্ষাদি নাই। কেবল ছোট ছোট কাঁটা গুল্ম ঘাস জাতীয় এবং বিছাতি জাতীয় গাছ আছে।

হেমাম্ভোজ প্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখ পট প্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুম কিশলয়ান্যুশুকানীববাতৈ-
র্হানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈ নির্ব্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥

পূঃ মেঃ ১।৬৩

কালিদাসের বর্ণনা হইতে আন্দাজ করিতে হয় যে হিমালয়ে মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কল্প বৃক্ষ আছে। অজানা যুগে কোন এক সময়ে এখানে বৃক্ষাদি হয় ত বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু নৈসর্গিক কারণে সে বৃক্ষাদি লুপ্ত হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

লামারা মানস সরোবরের তীরে ও কৈলাস পর্ব্বতের পরিক্রমার পথে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ সকল মঠ হইতে প্রত্যহ প্রভাতে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হয়। মঠগুলি লামাদিগের হইলেও হিন্দু তীর্থযাত্রীরা ধর্ম্মমন্দির হিসাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা লামা দেবতাদের প্রণাম করেন এবং মঠের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের নিকট প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। মানস সরোবর হিন্দু ও লামাদের অতি পবিত্র তীর্থস্থান। তীর্থযাত্রীদের এখানে

আসিয়া সরোবরে স্নান এবং হ্রদের তটভূমি এবং দেবভূমি কৈলাস পর্ব্বত পরিক্রমা করা প্রধান কার্য্য। নেপাল, লাদাক প্রভৃতি হিমালয়ের অন্তর্গত পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক, এমন কি চীন, জাপান প্রভৃতি দেশবাসী, তীর্থ উপলক্ষে দলে দলে মানস সরোবরের তীরে আসিয়া থাকেন। অনেক যাত্রী মানত অনুযায়ী দণ্ডী কাটিয়া পরিক্রমা করেন। এই মঠগুলির মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের কোন চিহ্ন মাত্রই নাই। সমস্ত লামাদের প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক মঠেই অনেকগুলি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক মঠে ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। সেখানে তথাগতের বিভিন্ন ধ্যান-মূর্ত্তি আছে এবং পূজার ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া লামাদের থাকিবার ঘর, অস্ত্রশালা, ছোট-ছোট যাদুঘর, (Museum) মিউজিয়াম, বাদ্যযন্ত্রাদি, একটা গ্রন্থাগার এবং প্রার্থনা-চক্র ইত্যাদি আছে।

৬ই শ্রাবণ রবিবার—জুগুম্ফা ত্যাগ করিয়া ৮ই শ্রাবণ মঙ্গলবার তাকলাকোটে আসিয়া হাজির হইলাম। এখন কর্ণালী তীরে বাজার বেশ জমকাইয়াছে। তিব্বতের নানা স্থান হতে বহু লোক বিকি-কিনি করিতে আসিয়া থাকে।

৯ই শ্রাবণ বুধবার—ভোরে খোজরনাথ (Khojarnath) যাত্রা করা হইল। পথক্লান্ত বলিয়া সকলে গেলেন না। খোজরনাথের পথে তিনটা ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া যাইতে হয়। রাস্তা অত্যন্ত নির্জ্জন, পথিক বড় একটা দেখা যায় না। পথের দুধারে শ্যামল শস্য ক্ষেত্র। বহুদূর হইতে জলধারা আনয়ন করিয়া ঐ সকল ক্ষেত্র সিক্ত করিয়া শস্য উৎপাদন করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও দুই একজন মেষপালক ছাগ ও মেষ চরাইতেছে। এবং মাঝে মাঝে ঐ দেশীয় বড় বড় কুকুর বিকট রবে পথের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া পথিকগণের ত্রাস উৎপাদন করিতেছে। পথের মাঝে মাঝে ওঁ মণিপদ্মে হুঁং প্রভৃতি মন্ত্র-অঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড সকল পড়িয়া আছে এবং তাহা তিব্বতবাসীদের ধর্ম্ম-ভীরুতার পরিচয় দিতেছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোজরনাথ দর্শন করিয়া আসা গেল। পূর্ব্ব দিবসে নন্দরাম বাবু যান-বাহনাদি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাকলাকোট হইতে খোজরনাথ প্রায় ৯ মাইল। ইহা একটী বৌদ্ধ মঠ। মঠটি দ্বিতল। কর্ণালীর বাঁকের উপর স্থাপিত হওয়াতে দৃশ্যটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। এই মঠে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অতি সুন্দর তাম্র-মূর্ত্তি আছে। হিন্দু সন্ন্যাসীরা এই মূর্ত্তিত্রয়কে রাম লক্ষ্মণ সীতা বলিয়া পূজা করেন। ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ।

নিপুণ শিল্পী মূর্ত্তিত্রয়ের মুখ-শ্রীতে উৎসাহ, দৃঢ়তা, বিক্রম-ব্যঞ্জক ভাব বেশ ভাল করিয়া ফুটাইয়াছেন। মঠের অধ্যক্ষ একজন বৃদ্ধ লামা। মূর্ত্তির সম্মুখে ও পার্শ্বে বহু দীপাধার সন্নিবেশিত আছে।

১১ই শ্রাবণ শুক্রবার—প্রত্যাবর্ত্তন

তাকলাকোটে নন্দরামজী বাবুর নিকট যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিয়া গার্ব্বিয়াং অভিমুখে যাত্রা করা গেল। লিপুপাসে নন্দরামজী বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দিলীপ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি কলিকাতার কয়েকখানি চিঠি দিলেন।

এখন লিম্পুলেখে আর বেশী বরফ নাই; রাস্তা তেমন বিপজ্জনক নহে। ১২ই শ্রাবণ অপরাহ্ণে গার্ব্বিয়াংএ আসিয়া হাজির। গার্ব্বিয়াংয়ে কালীনদীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া নামিয়া গিয়াছে। এবং পূর্ব্বকার রাস্তাগুলি নদীগর্ভে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। স্কুলে থাকিবার জন্য স্থান সংগ্রহ করা হইল।

গার্ব্বিয়াং ত্যাগ

১৪ই শ্রাবণ সোমবার স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের তীর্থ-ভ্রমণের উদ্বেগ কাটিয়াছে ও আশা মিটিয়াছে। এখন গৃহে ফিরিতে পারিলেই হয়। বিশালসিং পাটোয়ারী আমাদের যাইবার জন্য সমস্ত জোগাড় করিয়া দিলেন।

১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার—নিরপাণীয়ার নীচের রাস্তা পার হই। নিরপাণীয়ার নীচের রাস্তায় ভূটিয়া পুল এখনও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায় নাই; কাজেই নিরপাণীয়ার উপরের রাস্তার কঠোরতায় আমাদের পড়িতে হইল না। বর্ষাগমনে কালী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। স্রোতে প্রস্তরখণ্ডে ধাক্কা খাইয়া আছড়াইয়া ভীষণ বেগে পতিত হইতেছে।

১৮ই শ্রাবণ শুক্রবার ধারচুলার তপোবনে আসিলাম।

এক্ষণে তপোবন ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তপোবনে দুই দিন থাকিয়া আবার রওনা হওয়া গেল। স্বামীজী সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি কোন বিষয়েই আমাদের কষ্ট পাইতে দেন নাই।

তপোবন ত্যাগ

আহারান্তে ২১শে শ্রাবণ সোমবার তপোবন হইতে রওনা হওয়া গেল। বিদায় কালে স্বামীজি আনাজ তরী-তরকারী দিলেন। এই অজানা দেশে আমাদের বন্ধু মিলিয়াছিল এই তপোবনের বাঙ্গালী স্বামীজি।

২২শে শ্রাবণ মঙ্গলবার কালীনদী ও গৌরীনদী সঙ্গম-স্থলে জলজীবি নামক স্থানে দুপুর বেলা বিশ্রাম করা গেল। ঐ সঙ্গমে স্নান করিয়া বেশ তৃপ্তি লাভ হইল। এখানে একটী শিবমন্দির আছে। স্থানটী বড় স্যাঁতসেঁতে। সন্ধ্যার সময় গৌরী কালীর চড়াই প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসকোটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানের সঙ্গম স্থলের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। কালীতে গৌরী মিশিয়াছে—কালী ঘোর রবে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইতেছে। তাহার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, তাহার তরঙ্গকল্লোল, আর তাহার উচ্চ তটভূমির বিস্তীর্ণ পাথরের উপর শ্যামল শৈবালের স্নিগ্ধ শোভা দেখিয়া তাহাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হয়। এই ভৈরব দৃশ্যের মধ্যে গৌরী তার নির্ম্মল জলরাশি ঢালিয়া দিতেছে। পরদিন রাজওয়াড়া সাহেব আমাদের জন্য কিছু ফল পাঠাইয়া দিলেন।

২৪শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাজওয়াড়া সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্য পথে রওনা হওয়া গেল।

২৫শে শ্রাবণ শুক্রবার রামগঙ্গায় স্নান আদি সারিয়া আলমোড়া পথে অগ্রসর হইলাম।

২৮শে শ্রাবণ সোমবার দুপুর বেলা আলমোড়া আসিয়া পৌঁছিলাম। আলমোড়ার প্রবেশ-পথে চুঙ্গি দিতে হইয়াছিল।

৩১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আসি।

কদম্ব

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

অলস বাতাসে মেঘলা দিবসে কদম, তোমার গন্ধে
পুরা জীবনের যতেক স্বপ্ন গুঞ্জরি' উঠে ছন্দে।
গন্ধ তোমার চিত্তে আমার পাষাণের বাধা তুলিয়া,
স্মৃতির ফল্গুধারা মুখখানি দিল কি আজিকে খুলিয়া?
আজি মনে হয় উজ্জয়িনীর বৃক্ষবাটিকা বিতানে,
তুমি ছিলে মোর মালবীপ্রিয়ার পুষ্পশয়ন শিথানে।
আজি মনে হয় ছিলাম আমিও অলকা পুরীর অদূরে,
সীঁথিহারে তোমা গাঁথি উপহার দিয়েছি যক্ষ বধূরে।
আরো মনে হয় বিদিশা নগরে মেঘগুণ্ঠিত তিমিরে
তোমারি গন্ধে পথ চিনিয়াছি বারিমন্থর সমীরে।
আজি জাগে মনে দণ্ডকবনে নব বরষার হরষে,
তোমারি মতন শিহরি উঠিনু চকিত তোমার পরশে।
কতবার তোমা কণ্ঠে ধরেছি, বুলায়েছি ঠোঁটে কপোলে
কুণ্ডল হ'য়ে দুলেছ প্রিয়ার কতবার শ্রুতিযুগলে।
তোমার পরশ আমার অঙ্গে মাখা আছে সব খানে যে,
প্রতি রোমকূপ তোমায় কদম, আত্মীয় বলি' জানে যে।
যত রোমাঞ্চ এনেছে অঙ্গে শতজনমের পীরিতি,
তোমার গন্ধ আজিকে ছন্দে জাগায় তাদের স্মিরিতি।
মনে হয় যেন তোমাতে আমাতে শত জনমের মিতালি
জনমে জনমে তোমার সঙ্গে রচেছি কত না গীতালি।
মেঘলা দিনের দরদী বন্ধু, শুধাব একটি বারতা?
স্মরণের তুমি পুলকিত রূপ, বলিলে বলিতে পার তা।
ঝুলনের রাতে শ্যামের গলায় যে মালা দুলিত রঙ্গে,
ছিনু কি একটি লুলিত কেশর তার কদমের অঙ্গে?

চিরবিদায়

শ্রীহাসিরাশি দেবী

(১)

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিনই আকাশটিও মেঘে ঢাকা, মাঝে মাঝে গুরু গুরু মেঘের ডাক শোনা যাইতেছিল,—এখনই বৃষ্টি নামিবে। মাঝে মাঝে জোরে জোরে বাতাস বহিয়া যাইতেছিল—গাছের ডাল নোয়াইয়া,—শুকনো পাতাগুলি ঝরাইয়া দিয়া। সে যেন কোন বিরহীর বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের মত।

পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। মাঝে মাঝে উঁচু, আবার মাঝে মাঝে নীচু।

খোলা জায়গাগুলিতে এক হাঁটু করিয়া বৃষ্টির জল জমিয়াছিল। বর্ষায় শূন্য ডোবাগুলি জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহানন্দে ভেককুল চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সহিত ঝিল্লীর রব মিশ্রিত হইয়া আরও "জম্‌কালো" রকম করিয়া তুলিয়াছিল।

রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ। তাহার নিম্নে জীবানন্দ মোহান্তজীর আখড়া। আখড়ায় "গোবিন্দ এবং শ্রীরাধে" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এজন্য এই স্থানে সময়ে সময়ে বহু লোকজন জমা হইত। বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক। মোহান্তজী ছিলেন বৈষ্ণব। বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। দেহ বলিষ্ঠ। মোটের উপরে দেখিতে তাঁহাকে মন্দ ছিল না।

আখড়ার মধ্যে তাঁহার কয়েকটি "চ্যালা" ছিল। এবং সেবাদাসীও একটি ছিল। তা ছাড়া বাহিরের কথা আলাদা।

শুনিতে পাওয়া যায় পার্শ্বের গ্রাম ধর্ম্মপুরে তাঁহার না কি একটি বিবাহিতা পত্নী আছে। বাল্যকালে তাঁহার তাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহারও পূর্ব্বপুরুষের ভিটা না কি ধর্ম্মপুরেই ছিল। মোহান্তজীর পত্নী না কি কুৎসিতা বলিয়া তিনি তাহাকে আপন গৃহে স্থান দান করেন নাই। একদিন সে জোর করিয়া আসিয়াছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। সেই দিন হইতে আর সে আসে নাই। জীবানন্দও আর তাহার কোন সংবাদাদি লন নাই।

আখড়ায় যে স্ত্রীলোকটি মোহান্তজীর সেবাদাসী রূপে নিযুক্তা হইয়াছিল, সে জাতে পূর্ব্বে ছিল ডোম, কিন্তু উপস্থিত সে বৈষ্ণবী। সারদা ডোম-কন্যা হইলেও বিধাতা তাহাকে সৌন্দর্য্য দান করিতে কৃপণতা করেন নাই। সারদা সুন্দরী, শুধু এই জন্যই সে জীবানন্দ মোহান্তজীর কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ণবী সাজিয়াছিল, এবং তাঁহার পদসেবারও অধিকারিণী হইয়াছিল। সারদা জীবানন্দকে ভালবাসিত, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহা দারুণ বিরক্তি ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহার কারণও ছিল।

জন্মাষ্টমী, দোল, ঝুলনে এবং অন্যান্য উৎসবে মোহান্তজীর আখড়া ভক্তিমতী রমণীগণ পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সকলেই পূজোপচার লইয়া উপস্থিত হইত। "রাধামাধবে"র পূজা সেদিন হইত রাত্রি বারটা, বা সাড়ে বারটায়। তাহার পরে সংকীর্ত্তন এবং আনন্দোৎসব লইয়াই একটা বাজিত। তাহার পরে প্রসাদ পাওয়া, সেও একটা কম পুণ্যের তো কথা নহে! সুতরাং রমণীগণ করযোড়ে মোহান্তজীর মধুর ভাবপূর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সময় অতি-বাহিত করিত।

মোহান্তজীর দৃষ্টিও নিমেষে একবার চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া আসিত। যদি নারীগণের ভিতরে কেহ সুন্দরী তরুণী থাকিত, তাহা হইলে মোহান্তজীর ধ্যানের সময় আরও দীর্ঘতর হইয়া উঠিত। সাধে কি? শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমের পূর্ণরূপ সম্মুখে রাখিয়া তিনি কেমন করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিবেন? তাড়াতাড়ি কি পূজা সাঙ্গ হয়?

রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময়ে যখন তিনি শয়ন-মন্দিরে দর্শন দান করিতেন, তখনও দৃষ্টির সম্মুখে সেই মুখখানিই ভাসিতে থাকিত, এবং যে কয় দিন বা মাসে

পারিতেন, সেই দুর্ভাগিনী নারীর সর্ব্বনাশ না করিয়া তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত না। আপনার সর্ব্বনাশের সহিত অপর নারীর সর্ব্বনাশ মিলাইয়া দেখিয়া তাহার দুঃখে সারদা যেমন ব্যথিত হইয়া উঠিত, তেমনি জীবানন্দের উপরে তাহার ক্রোধবহ্নিও দ্বিগুণ বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। তাহার চক্ষে জল দেখা যাইত না। সে কঠোর স্বরে বলিত—

"ঠাকুর, একান্ত যদি ক'রবে জান, তবে আমায় আমার সে শান্তিভরা ঘরটুকু হ'তে, বাপ-ভাইয়ের কাছ হ'তে ভুলিয়ে নিয়ে এলে কেন? এতে তোমার কি লাভ হ'য়েছে?"

ঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিত, "এমন কিছুই নয় সারদা। তুমি তো আমায় ভুলাতে পারনি, তোমার রূপ আমাকে ভুলিয়েছিল। তবে এটাও জেনো, তুমি ছিলে অস্পৃশ্যা,—আমিই শুধু দয়া ক'রে তোমায় ঢের উঁচুতে তুলেছি। তবে কেবল তোমায় নিয়েই যে আমার জীবন কাটাতে হবে, এমন কথা তো তোমায় লিখে দিইনি।"

—"তবু দয়াও কি তোমার মনে—"

বাধা দিয়া জীবানন্দ বলিলেন—"না, না। সে ভুল। দয়া যথেষ্ট আছে। কিন্তু তুমি উল্টো বুঝছো। দয়া তুমি অনেক পেয়েছ এবং পাবেও, কিন্তু আমার চরিত্র তুমি সংশোধন ক'রতে এসো না সারদা। আমার ইচ্ছা কি তা কি তুমি আজও বুঝতে পারনি? আমার ইচ্ছা,—যখনই যে সুযোগ হাতে পাব, তা পূর্ণ ক'রবই। কেন তা হেলায় হারাব?—এই সুযোগেই একদিন তোমাকেও এনেছিলাম।"

—সারদা বিস্মিত দৃষ্টিতে জীবানন্দের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, জীবানন্দের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"যদি তোমার ইচ্ছা হয়,—তবে তুমি এখনিই আমার আখড়া ত্যাগ করতে পার।"

সারদা সহসা দুই হস্তে জীবানন্দের উভয় পদ জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর! ঠাকুর, তোমার পায়ে প'ড়ছি, এত নির্দ্দয় হ'য়ো না। আমার আর আপন ব'লতে কিছুই তো নেই। আমি কার কাছে যাব ঠাকুর।"

পা ছাড়াইয়া লইয়া জীবানন্দ বলিলেন—"তবে এইখেনেই থেক। আমি তো থাকতে বারণ করছিনে সারদা—"

(২)

বেলা নটা দশটার সময় একটি ভিখারিণী বৈষ্ণবীর দল ভিক্ষার্থে পথের জল ভাঙ্গিয়া, ভিক্ষার ঝোলা স্কন্ধে, অপর গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল।

পূর্ব্বদিন খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, আজও তাহার জল রাস্তার স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল। সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত। পথের উভয়পার্শ্বে শ্যামল ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে মাছরাঙা পাখীর ডাক ভাসিয়া আসিতেছিল।

বৈষ্ণবীর দল গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। একজন সে বিষয়ে যোগ না দিয়া মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—

"শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখব ব'লে
এসেছিলাম এ গোকুলে—"

তাহারই সমবয়সী একটি মেয়ে তাহার পৃষ্ঠে একটি ছোট কিল বসাইয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"মরণ আর কি। তোর সং দেখেও আর বাঁচিনে গো। বলি, যাকে দেখতে যাস, সে কি কখনও মুখ ফিরিয়ে তোকে দেখে, না তোর সংবাদ নেয়? আমরা হ'লে অমন স্বামীর মুখ দেখাও মহাপাপ ব'লে মনে ক'রতাম। আবার কণ্ঠি বদল ক'রে মনের সুখে ঘর ক'রতাম, কখনও ভিক্ষের ঝোলা হাতে নিতাম না।"

যে নারী কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল, তাহার বয়ঃক্রম চব্বিশ কি পঁচিশ হইবে। গায়ের রং কালো, চোখ ছোট, ঠোঁট মোটা। দেখিতে লম্বা ধরণের।

গিরিবালা প্রায়ই গ্রামের অন্যান্য রমণীগণের সহিত ভিন্ন গ্রামে ভিক্ষায় বাহির হইত। সংসারে আপন বলিতে এক বৃদ্ধা ঠাকুর-মা ছাড়া আর কেহ ছিল না।

ছয় সাত বৎসর বয়সে হরিদাসপুরের রাধে-গোবিন্দ দেবের আখড়ার মোহান্ত জীবানন্দ ঠাকুরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া অবশেষে সে স্বামীর চরিত্র বুঝিতে পারিল। জীবানন্দ

এক এক দিন মদ খাইয়া আসিয়া অকারণে গিরিবালাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। কিন্তু সে কথা গিরিবালা পিত্রালয়ে কখনও জানায় নাই। তখন গিরিবালার জননী ও জনক জীবিত ছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন গিরিবালা সুখেই আছে। মাঝে মাঝে কন্যার খবর লইতেন, কিন্তু জামাতার অত্যাচারের কথা তাঁহাদের কাণে উঠিত না।

কিন্তু একদিন, একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গিরিবালা যখন পিতৃগৃহে অসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। জননী কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া কঠোর স্বরে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গিরি, এ সব কি কাণ্ড?"

গিরিবালা অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া চুপ করিয়া দাওয়ার উপরে বসিয়া ছিল। উত্তর দিল না, বা সে ক্ষমতাও তখন তাহার ছিল না। শুধু এক একবার তাহার সারা দেহখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল,—কিসের উত্তেজনায়। জননী বলিলেন—"উত্তর দিচ্ছ না যে? কি হ'য়েছে? তোমার এ কি রকম আসা? সঙ্গে অন্য লোক কেন? জামাই কই?"

গিরিবালা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়াই রুদ্ধস্বরে উত্তর দিল—"তোমার জামাই মেরে আমায় আজ তাড়িয়ে দিয়েছে।"

—"কি? সত্যি কথা বল গিরি।"

—"সত্যিই ব'লছি মা, এই দেখ।" গিরিবালা পৃষ্ঠাবরণ উন্মুক্ত করিতেই জননীর দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল কতকগুলি সুস্পষ্ট খড়মের দাগ। রক্তগুলা জমাট বাঁধিয়া এক এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কিছুক্ষণ কন্যার মুক্ত পৃষ্ঠের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন—"গিরি—"

কন্যা মুখ তুলিয়া ছিল। অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল—"কেন মা?"

জননী বলিলেন—"তা হোক। তবু তোমায় যেতে হবে। জাত বৈষ্ণবের ঘরে মেয়ে দিয়ে কে কবে প্রথমে সুখী হ'তে পেরেছে। তোমার আসা অনুচিত হ'য়েছে। সেখানে থাকতে পারলে না?"

গিরিবালা নীরবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। জননী গিরিবালার পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া গিরিবালাকে পুনর্ব্বার জামাতার বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। পিতা বৃন্দাবন একবার সজল নয়নে কন্যার শুষ্ক মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মনকে বুঝাইলেন—এটা স্নেহ দেখাইবার সময় নহে। গিরিবালাকে রাখিয়া আসিতেই হইবে। এখন একটু নীরবে থাকিতে পারিলে ভবিষ্যতে হয় তো কন্যার কপালে সুখ হইলেও হইতে পারে।

মন বাঁধিয়া বৃন্দাবন বলিলেন—"ওঠ গিরি, চল।"

গিরিও পিতার সহিত ধীরে ধীরে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া, যেপথ বাহিয়া আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিল। —জননী চক্ষে অঞ্চল চাপা দিয়া বহুক্ষণ পরে কন্যার জন্য ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

—হায়, সে আসিয়াছিল প্রায় এক বৎসর পরে, কিন্তু তিনি তাহাকে বিশ্রাম পর্য্যন্ত করিতে দেন নাই। সে যে ধূলি পায়ে মাখিয়া তাঁহার অঙ্গনে উঠিয়া আসিয়াছিল, সেই ধূলি পায়েই তিনি তাহাকে নিষ্ঠুর বাক্যের বাণে বিদ্ধ করিয়া বিদায় দিয়াছেন।—কিন্তু সে তাঁহারই একমাত্র কন্যা এবং তিনিই তাহার পাষাণী জননী।

বৃন্দাবন কন্যাকে লইয়া হাজির হইবামাত্র জীবানন্দ কক্ষমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। শ্বশুর ও স্ত্রীকে দেখিবামাত্র তাঁহার ক্রোধ-বহ্নি দ্বিগুণ বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কর্কশ স্বরে বলিলেন—"আবার কেন মেয়ে নিয়ে এসেছ?—আমি তোমার মেয়েকে আমার ঘরে ঠাঁই দেব না। যাও এই বেলা।"

বৃন্দাবন ক্লান্ত হইয়াছিলেন। প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে উঠানের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া কাতর ভাবে জামাতার মুখের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। জীবানন্দের রাগের মাত্রা চড়িয়া উঠিতেছিল। তিনি দ্রুতপদে আঙিনার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন —"এখনও উঠ্‌লে না? পিঠে বেত্ না প'ড়লে বুঝি সোজা হবে না, কেমন?" লজ্জা, ঘৃণা ও অপমানে বৃন্দাবনের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে তিনি আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন—"আমার কথাটাও কি বাবাজী—"

বাধা দিয়া কর্কশ স্বরে জীবানন্দ বলিলেন—"না,

মোটেই না। এই মুহূর্ত্তেই তোমরা আমার বাড়ী ত্যাগ কর, নইলে—”

বৃন্দাবন ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—“আয় গিরি, এমন ছোট লোকের বাড়ীতে পা দেওয়াও মহাপাপ।”

বৃন্দাবন কন্যার হাত ধরিয়া পুনর্ব্বার যখন আপন গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন দিনের আলো প্রায় নিভিয়া আসিয়াছিল। রাখালগণ কিছু পূর্ব্বেই বোধ হয় গরু লইয়া আপন আপন গৃহে ফিরিয়াছিল; কারণ পথের ধূলির উপরে তখনও তাহাদের পদচিহ্ন সকল অঙ্কিত ছিল। পাখীর দল কলরব করিতে করিতে, মুক্ত প্রান্তর, ব'ন ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া আপনাপন কুলায়াভিমুখে চলিয়াছিল। কন্যা শ্রান্ত স্বরে বলিল—“বাবা, আর তো হাঁটতে পারছিনে। পা দুটো যে আর বইছে না।”

পিতা তের বৎসরের বালিকা কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন—“আর বেশী দূর নয় মা। আর একটু চল।”

গৃহদ্বারে গিরিবালার জননী দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্বামী ও তৎসহ কন্যাকে আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও ভীত হইলেন।

বৃন্দাবন পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি শুষ্ক স্বরে প্রশ্ন করিলেন—“কি হ'ল?”

বৃন্দাবনের মুখের উপরে কে যেন একটা কঠিনতার ছাপ মারিয়া দিয়াছিল। বৃন্দাবন হাসিলেন। সে হাসি যেন হৃদয়ের গোপন বেদনার একটা ঢেউ মাত্র।—বলিলেন—“তোমার মেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম বৌ। তোমার জামাই মেয়ে নেবে না।”

গৃহদ্বারে তিনটি প্রাণী পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সান্ধ্য বাতাস তখন কি একটা অস্ফুট স্বরে কথা বলিয়া চলিয়া গেল। গিরিবালার জননী চমকাইয়া উঠিলেন। বাহু বাড়াইয়া ক্লান্ত গিরিবালাকে আপনার নিকটে টানিয়া আনিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন—“তবে আয় মা। আমি যখন তোকে পেটে স্থান দিতে পেরেছি, তবে হাঁড়িতেও একটু দিতে পারব। আমি যে তোর মা।” এই স্নেহের বন্ধনের ভিতরে বদ্ধ হইয়া গিরিবালা মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইল।

(৩)

ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও জীবানন্দ ঠাকুর যে কেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই ঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কেহ বলিত—“মহাপ্রভু ধ্যানে আছেন।” কেহ বলিত—“ধ্যান নয় হে, অন্য কিছু।” কেহ বলিত—“ঢং মাত্র।” প্রভু কিন্তু ইহার একটারও উত্তর দিতেন না। আপন মনে অন্য দিকে চাহিয়া থাকিতেন,—হয় তো বা উৎসব-স্থান ত্যাগ করিতেন।

সেদিন তিনি আখড়ার বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মোহান্তজীর আখড়ার পশ্চাতে এক-খানি খালি জমি পড়িয়া থাকিত। সেখানি মোহান্তজীর। কিছুদিন হইতে মোহান্তজীর বৃদ্ধ ভৃত্য নিতাই সেই স্থানে আপনার বাসোপযোগী করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া-ছিল। তাহার স্ত্রীও সে সেই কক্ষে বাস করিত। জীবানন্দ পায়চারী করিতেছিলেন। হঠাৎ কানে আসিয়া লাগিল, নিতাইয়ের কুটীরের দিক হইতে কে একটি স্ত্রীলোক খঞ্জনী বাজাইয়া কীর্ত্তন গাহিতেছে—

“শ্রীমুখপঙ্কজ দেখব' ব'লে,—
এসেছিলাম এ গোকুলে
আমায় স্থান দিও রাই চরণ-তলে।”

মোহান্তজীর ম'নে পড়িল এ স্বর যেন তাঁহার অপরিচিত নহে। তবে বহু দিন,—বহু দিন পূর্ব্বে যেন তাঁহার কর্ণে ভাসিয়া আসিত। সে আপন মনে গাহিত। সে বোধ হয় দশ বার বৎসর পূর্ব্বে। এখনও তিনি তাহা ভুলিয়া যান নাই। আশ্চর্য্য বটে।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলেন। তাহার পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ীর জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই স্থান হইতে নিতাইয়ের ঘর এবং তাহার ছোট্টো উঠানখানি বেশ দেখা যায়।

গান শেষ হইয়া গেল। জীবানন্দ গায়িকার মুখ দেখিতে পান নাই; কারণ, সে এই দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল। দেখা যাইতেছিল শুধু তাহার দু'খানি কৃষ্ণ-বর্ণ হাত। মাথায় কাপড় দেওয়া ছিল। সর্ব্বাঙ্গে এক-খানি কাপড় জড়ান।

জীবানন্দ উচ্চ স্বরে ডাকিলেন—“ও নিতাই—”

গায়িকা মুখ ফিরাইতেই জীবানন্দকে দেখিতে পাইল এবং তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে মোহান্তজীর মুখের ভাবান্তর ঘটিল। তাঁহার মুখ মুহূর্ত্তে মৃতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। একটু পরেই তিনি সেই স্থান হইতে দ্রুতপদে সরিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মোহান্তজীর কক্ষে নিতাইয়ের ডাক পড়িল। জীবানন্দ আপন কক্ষে একখানি চৌকীর উপরে বসিয়া ছিলেন। নিতাই আসিয়া দাঁড়াইল—“ঠাকুর, আমায় ডেকেছেন?”

“হাঁ, বস।”

নিতাই দ্বারের নিকটে সরিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—“যে স্ত্রীলোকটি তোমার বাড়ীতে ব'সে গান ক'রছিল,—ও মেয়েটি কে, তা জান?”

নিতাই উত্তর দিল “না ঠাকুর। তবে এইটুকু জানি, ওর বাড়ী পাশের গাঁয়ে, ধর্ম্মপুরে। ওর নাম গিরিবালা।”

মোহান্ত ঠাকুর নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন, কথা বলিলেন না। নিতাই মোহান্ত ঠাকুরের চরিত্র ভাল রূপেই জানিত, তাই সে চমকিত হইয়া উঠিল। মোহান্ত ঠাকুর বলিলেন—“তা ও তোমার বাড়ীতে আসে কেন? কোনও দরকার—”

বাধা দিয়া নিতাই বলিল—“আজ্ঞে না। আমার পরিবারকে মা বলেছে কি না, তাই। আর এই গ্রামে ভিক্ষেও ক'রতে আসে প্রায়ই কি না, তাই।”

জীবানন্দ কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেলেন। শেষে বলিলেন—“তা ও বুঝি এখন ভিক্ষে ক'রে খায়? কেন, আর কেউ নেই ওর?”

নিতাই উত্তর দিল “আজ্ঞে আছে,—একটি বুড়ি ঠাকুর-মা। তা তিনি ভিক্ষেয় তো আর আসতে পারেন না, তাই গিরিকেই আসতে হয়। গরীবের মেয়ে, ভিক্ষে না ক'রলে চ'লবে কেমন ক'রে বলুন তো? পেট তো আর চুপ ক'রে থাকবে না?”

জীবানন্দ প্রশ্ন করিলেন “বিয়ে হয় নি?”

“হয়েছিল।”

“তার পর?”

“গিরির স্বামী ওকে ছোট বেলা থেকেই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল,—অপমান ক'রে, ওকে আর ওর বাপকে। আর নেয় নি।”

দুর্দ্দান্ত মোহান্তজী একটি ভৃত্যের সম্মুখে বসিয়া কিসের শঙ্কায় যেন একবার অন্তরে কম্পিত হইয়া উঠিলেন।

কিছু পরে প্রশ্ন করিলেন—“তা ও কণ্ঠি-বদল করেনি কেন?”

নিতাই উত্তর দিল,—“ও বলে, সে সবে কাজ কি? স্বামীই যখন নিলে না, তখন আবার মালা বদল ক'রে কি করবো? ভাল লাগে না।”.....

জীবানন্দ চৌকী ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন “আচ্ছা, এখন তুমি যাও।—হাঁ,—আর একটা কথা।”

নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল—“আজ্ঞে করুন।”

জীবানন্দ সরিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—“ও কখন কখন তোমার বাড়ী আসে, তা আমায় জানাতে পার?”

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিল—“আচ্ছা।”

নিতাই চলিয়া গেলে মোহান্তজী কক্ষ মধ্যে দ্রুত পাদ-চারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখ দেখিলে বোঝা কঠিন হইত না যে, তাঁহার হৃদয়-মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের তুমুল তর্ক চলিতেছে।

যাহা হৌক, গিরিবালার ও-বাড়ীতে আগমন সম্বন্ধে তিনি ঘন ঘন সংবাদ লইতে ভুল করিলেন না; এবং তাহার আগমন-সংবাদ পাইলেই পূর্ব্বোক্ত জানালায় গিয়া দাঁড়াইতেন। জানালায় একখানি পাতলা পর্দ্দা ঝুলান হইয়াছিল, যাহাতে বাহিরের কোনও মানুষ জানালার এপারে কে আছে তাহা না বুঝিতে পারে এই জন্য। সুতরাং গিরিবালা জীবানন্দকে দেখিতে পাইত না; কিন্তু জীবানন্দ ঠাকুর তাহাকে দেখিতে পাইতেন।

গিরিবালার শুষ্ক মুখখানির উপরে দৃষ্টি পড়িলেই বহু দিন পরে গত ব্যবহারের জন্য তাঁহার মন অনুশোচনায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। বক্ষে কিসের যাতনা অনুভব করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালার উপরও যে রাগ না হইত তাহা নহে। তিনিই না হয় তাহাকে লন নাই, কিন্তু সে ইচ্ছা করিলে তো কণ্ঠি বদল করিয়া সুখী হইতে পারিত। এমন ব্যর্থতায়

তো তাহার জীবন ভরিয়া উঠিত না। হয় তো ঐ বেদনার হাসিটুকু সুখের কল-হাসিতে পূর্ণ হইত। এমন করিয়া তো ভিক্ষা-পাত্র করে লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত না, একমুষ্ঠি চাউলের প্রত্যাশায়।

একদিন নিতাইকে ডাকিয়া জীবানন্দ মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"আমার একটা কথা রাখবে নিতাই?"

নিতাই জীবনে কখনও জীবানন্দের মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনে নাই। তাই সে যেমন আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল তেমনি অপর দিকে ভীত হইয়া পড়িল। উভয় কর একত্র করিয়া বলিল—"আপনি যা আজ্ঞে ক'রবেন, তাইই তো আমরা ক'রতে বাধ্য, ঠাকুর। তবে—"

বাধা দিয়া জীবানন্দ বলিলেন—"সে কথা আমি তোমায় ব'লছিনে।—আমি ব'লছি যে, যে মেয়েটি, ঐ যার নাম ব'লেছ গিরিবালা, তাকে আমি কিছু দান ক'রতে,—মানে তার বড় কষ্ট দেখে আমি তাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চাই।—তা,—যা দেব, তা যেন আমি তোমার হাত দিয়ে দেওয়াতে চাই। আমার নামটা যেন না ওঠে। বুঝেছো?"

নিতাই আনন্দোৎফুল্ল স্বরে বলিয়া উঠিল—"আজ্ঞে সে আপনার অসীম দয়া। গরীব দুঃখী মানুষ আমরা, আর আপনি—"

বাধা দিয়া জীবানন্দ বলিলেন—"থাক, ও-সব কথা এখন রাখ নিতাই। আর একটা কথা আছে শোন, ওকে ব'ল, তোমার বাড়ীর কাছে ঐ যে খালি জমিখানা প'ড়ে আছে আমার, ওইখানে ঘর বাঁধতে। যা খরচ পড়ে আমিই দেব, তোমার হাত দিয়ে। আর তুমি ব'ল ও জমিটাও তোমার, আমি যেন তোমায় দান ক'রেছি। বুঝেছো? কিন্তু খবরদার, আমার নামটা যেন ও না শোনে।"

নিতাই মোহান্তজীর পদধূলি ভক্তিভরে মস্তকে লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরদিন যখন সে মোহান্তজীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হ'ল নিতাই?"

নিতাই তাহার মলিন চাদরখানির এক কোণ হইতে কয়েকটি বাঁধা খুলিয়া একটি নোটের তাড়া মোহান্তজীর পদতলে স্থাপিত করিয়া ম্লান মুখে বলিল—"সে নিলে না ঠাকুর।"

জীবানন্দ স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"নিলে না! কেন?"

—"তা জানিনে, সে একটু হেসে ফিরিয়ে দিয়ে ব'ল্লে—'যে দিয়েছে তাকে ব'লো আমার ভিক্ষে ক'রেই বেশ দিন কাট্‌ছে, কেটে যাবেও। কারও দয়ার দানের আমি প্রত্যাশী নই।'

মোহান্তজী প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় নোটের তাড়াটির প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(৪)

দিনের শেষ আলোটুকু ধরণীর উপরে পড়িয়া বিদায় ভিক্ষা করিতেছিল। গ্রামের নিকটেই "না-ভাঙ্গা নদী" কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইত—আজিও যাইতেছিল। কতকগুলি নৌকা পাল তুলিয়া বর্ষার পূর্ণ-যৌবনা নদীর বক্ষের উপর দিয়া চলিয়াছিল।

নদীর তীর দিয়া যে রাস্তাটি গ্রামান্তরে পৌঁছিয়াছে, গিরিবালা সেই রাস্তাটি ধরিয়া আপন গৃহাভিমুখে চলিয়াছিল। সারা দিনের ভিক্ষাপূর্ণ ঝোলাটি তাহার স্কন্ধে ছিল, —হস্তে একটি ছোট মালা।

সে অতি ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। সারা দিনের অনাহার-ক্লান্ত দেহখানি যেন পথের ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল,—পা দু'খানা যেন আর দেহভার বহন করিতে চাহিতেছিল না। তবুও এমনি করিয়াই যাইতে হইবে। নিত্য হয়ও তো! কে তাহার কষ্ট বুঝিতে পারিবে?

সরু পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বাবলা গাছের শ্রেণী। এক ধারে না-ভাঙ্গা, অপর ধারে ধানের ক্ষেত। সবুজ—খালি সবুজ। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে অন্ধকার জমাট বাঁধিতে লাগিল। গিরিবালা একটু দ্রুত চলিল। ওঃ, তাহার ছোট কুঁড়েখানি যে এখনও অনেক দূরে—রাস্তার শেষ সীমায়।

গিরিবালা আপন মনে চলিয়াছিল। কোনও দিকেই তাহার খেয়াল ছিল না। মনের ভিতর নানারূপ বিশৃঙ্খল ভাবনার রাশি এলোমেলোভাবে আসিয়া পড়িতেছিল।

পথের পার্শ্বে একটি বাবলা গাছতলায় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল। অন্ধকারে তাহার মুখ চেনা যায় না। দিনান্তের মলিন আলোটুকু তাহার গৈরিক বস্ত্রের উপরে পড়িয়া তাহা স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। হঠাৎ সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই গিরিবালা চমকিত হইয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল—"কে?"

যে ব্যক্তি গাছতলায় আলো-অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল, সে ধীরে ধীরে গিরিবালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই গিরিবালা বিস্মিত হইল—"এ কি—মোহান্ত ঠাকুর এখানে কেন?"

জীবানন্দ হাসিলেন। শ্লেষের স্বরে বলিলেন—"তোমায় একবার দেখতে।"

গিরিবালা বিস্মিত দৃষ্টিতে জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কিন্তু, অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পাইল না। বলিল—"আমার পথ ছেড়ে দাঁড়াও ঠাকুর, আমি বাড়ী যাই,—রাত হ'য়ে গেল।"

জীবানন্দ বলিলেন—"হ'লই বা,—এস না, দু'দণ্ড গল্প করি।"

গিরিবালা অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। ব্যাকুল স্বরে বলিল—"সত্যি বলছি, বাড়ীতে আমার বুড়ো ঠাকুর-মা, আমার আসার পথ চেয়ে আছে। আমি গিয়ে রেঁধে দিলে তবে খেতে পাবে। পথ ছাড়।"

জীবানন্দ বলিলেন—"বল কি? এত সহজেই?"

উত্তেজিত স্বরে গিরিবালা বলিল—"ছাড়বে না? তবে আমি চীৎকার ক'রে এখনিই ঐ মাঝিদের ডেকে, তোমার নামে দোষ দেব, পথ ছাড়।"

জীবানন্দ হাসিলেন—"সে ভয় আমার খুবই কম, গিরি। তা ছাড়া এও ব'লতে পারি, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে গেছ, আর আমি আনতে গেলেই তুমি আস না। এই গ্রামে ভিক্ষা ক'রে তুমি বাড়ী যাও। আর, আর—"

শেষে তিনি যে কথাটি উচ্চারণ করিলেন, তাহা শুনিয়া গিরিবালার মাটির সহিত মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ যাহা, তাহারই সম্বন্ধে এমন একটা মিথ্যা কথা জীবানন্দ কেমন করিয়া উচ্চারণ করিলেন তাহা গিরিবালা ভাবিয়া পাইল না। সে লজ্জায় দুঃখে চুপ করিয়া রহিল।

জীবানন্দ বলিলেন—"বলি, টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে তোমার কি লাভ হ'লো গিরিবালা?"

গিরিবালা উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিল—"সে তো তোমাকে ব'লেই পাঠিয়েছিলাম। তোমার অশ্রদ্ধার দান, হেলার দান আমি নেব না।—তোমার দানের টাকার চেয়ে ভিক্ষার একমুঠো চালও আমার কাছে মূল্যবান।"

কঠোর স্বরে জীবানন্দ বলিলেন—"বটে? এত তেজ তোমার চিরদিন টিকে থাক্‌বে তো ঠাক্‌রুণ?"

গিরিবালা উত্তর দিল—"না থাক্‌লেও তোমার কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াব না, এটা ঠিক জেনো। যে লোক একদিন আমার বাবাকে পর্য্যন্ত ব'লতে পারে বেত মারার কথা, তার আবার দয়া? তার আবার দান? কেন নেব? আমি কি মানুষ নই? আমি কি সেই বৃন্দাবন বৈরাগীর মেয়ে নই?—আশ্চর্য্য তোমার সাহস। নইলে, আজ যে দান তুমি আমায় দিয়ে পাঠিয়েছিলে, সে দান পাঠাবার সাহস তোমার থাকতো কোথায় ঠাকুর? —আমি বৈরাগীর মেয়ে, ভিক্ষে ক'রলে আমার মান খোয়া যাবে না। চিরদিন ভিক্ষে ক'রেই খাবো,—তোমার দানে আমি লাথি মারি, তুমি পাপিষ্ঠ।"

জীবানন্দ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কি, এত অপমান ক'রতে তোমার ভয় ক'রলে না? জান—আমি ইচ্ছে ক'রলে তোমায় পিষে মারতে পারি?"

গিরিবালা বলিল—"যথেষ্ট জানি। ইচ্ছা হয়,—মের। আমারও আপত্তি নাই।"

জীবানন্দ কঠোর স্বরে বলিলেন—"বেশ, তাই হবে, গিরিবালা, তোমার ইচ্ছা আর অপূর্ণ রাখব না।" জীবানন্দ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

গিরিবালা আর কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সেই ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়া পথ চলিল।

কিন্তু এত শাসাইয়াও মোহান্ত-ঠাকুর কেন যে তাহার উপর প্রতিশোধ তুলিবার কোনও বন্দোবস্ত করিলেন না, তাহা ভাবিয়া গিরিবালা সত্যই আশ্চর্য্য হইল। দীর্ঘ আট দিন তাহার পরে ধীরে-ধীরে কাটিয়া গেল। গিরিবালা আর দুই দিন হরিদাসপুরে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। আর যায় নাই।

রোগ কাহারও সুখ-দুঃখ মানে না, তাই সে একদিন গিরিবালাকেও আপনার যন্ত্রণাময় হস্তে স্পর্শ করিল। সে শয্যাগত হইয়া পড়িল। এই সময় তাহার বৃদ্ধা ঠাকুর-মা মাত্র কয়েক বার পেট নামিয়া ও বমন করিয়া ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

—সেদিনও তাহার জ্বর আসিতেছিল। বক্ষে ও পৃষ্ঠে বেদনা, জ্বরও ছাড়িতেছিল না সে কক্ষমধ্যে একখানা ছিন্ন কাঁথা গায় দিয়া পড়িয়াছিল। বাহির হইতে ডাক আসিল—"মা গিরি!"

গিরির বুঝিতে বিলম্ব হইল না, এ কাহার কণ্ঠস্বর। কম্পিতস্বরে বলিল—"ঘরে এস বাবা।"

নিতাই কক্ষে প্রবেশ করিল। গিরিবালার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"একটা খবরও কি দিতে নেই মা?"

গিরিবালা উত্তর দিতে পারিল না। নিতাই উভয় হস্তে গিরিবালার উপাধান-শূন্য মস্তকটি আপনার ক্রোড়ের উপরে স্থাপিত করিয়া তাহার মস্তকের উপরে শীর্ণ হস্ত স্থাপন করিয়া সস্নেহে ডাকিল—"গিরি—"

কম্পিতস্বরে গিরিবালা উত্তর দিল—"কেন বাবা?"

নিতাই বলিল—"আমার বাড়ী যাবি মা? এখানে তোকে কে দেখবে ব'ল্ তো?—"

রুদ্ধস্বরে গিরিবালা উত্তর দিল "না, সেখানে মোহান্ত-ঠাকুর—"

নিতাই যেন একটু চমকিত হইয়া উঠিল। বলিল—"মোহান্ত-ঠাকুরের বড় অসুখ যে মা।"

গিরিবালা চমকাইয়া উঠিল—"অসুখ? কি অসুখ?—"

নিতাই কি একটা নাম বলিল, গিরিবালা বুঝিল না, কিন্তু এটুকু বুঝিতে পারিল যে, জীবানন্দ শয্যাগত।

ধীরে-ধীরে তাহার বক্ষ কম্পিত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশাইয়া গেল। দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—জীবানন্দের সেই বলিষ্ঠ দেহ, ও সুন্দর মুখখানি। হয় তো সে আজ রোগ-যন্ত্রণায় পড়িয়া তাহারই মত ছট্‌ফট্ করিতেছে,—এক-একবার কাতর স্বরে ডাকিতেছে "আঃ, বাবা—"

গিরিবালা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিল; ডাকিল—"বাবা—"

—নিতাই গিরিবালার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উত্তর দিল—"কেন মা?"

—"একটা কথা তোমায় ব'লবো আজ।"

—"বল—"

"জীবানন্দ ঠাকুর আমায় সাহায্য ক'রতে চেয়েছিলেন কেন, জান?"

—"না—"

"তিনিই আমার স্বামী, যাঁর কথা তোমরা শুনেছো।"

নিতাই চমকিত হইয়া উঠিল—"সে কি?"

—"হ্যাঁ, আর একটা কথা তাঁকে ব'লো।—ব'লো যে তাঁর কাছে গিরিবালা তার গত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছে।"

(৫)

ধীরে-ধীরে তিন মাস কাটিয়া গিয়াছিল।

গিরিবালা সুস্থ হইয়াছিল। কিছু দিন হইতে সে কাশীবাস করিবার সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু ট্রেণ ভাড়া সংগ্রহ হয় নাই বলিয়া যাওয়া হয় নাই।

এই কয় দিন ভিক্ষায় বাহির হইয়া তাহার ট্রেণ-ভাড়া উঠিয়া গিয়াছিল। এই কয় দিনের মধ্যেই সে তাহার ঘরখানি ও অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিল।

নিতাই আসিলে সহাস্যে জানাইল—"বাবা, কালকে আমি যে যাচ্ছি। পায়ের ধূলো দাও মাথায় আমার, যেন বাকী জীবনটা গঙ্গার কূলে কাটিয়ে এ প্রাণটা সেই-খানেই বিসর্জ্জন দিতে পারি।"

নিতাই এ পর্য্যন্ত তাহার মুখে যাইবার কোনও কথাই শোনে নাই। সে বিস্মিত হইল। "সে কি মা? কোথায় যাবে?"

—"কাশীতে চল্লুম বাবা।"

কিছুক্ষণ নীরবে তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—"কবে?"

—"কালকে, সকালে—ন'টার গাড়ী ধ'রতে হবে। দেমো গাড়োয়ানকে ব'লে রেখেছি, সেই এসে সকাল-সকাল নিয়ে যাবে ইষ্টিশান পর্য্যন্ত। নইলে এই শরীরে আর অতদূর হেঁটে যেতে পারব না! বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি।"

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে নিতাই যখন যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার উভয় চক্ষু জলপূর্ণ। গিরি-বালা তাহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর বাবা, যেন আর না আসতে হয়।"

নিতাই ম'নে ম'নে কি আশীর্ব্বাদ করিল তাহা ভাল বুঝা গেল না।

তখনও প্রভাতের আলোক চতুর্দ্দিক আলোকিত করে নাই। গিরিবালার রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া কে ব্যাকুল স্বরে ডাকিল—"গিরিবালা, গিরিবালা!"

গিরিবালা বহুক্ষণ উঠিয়া ছিল, কিন্তু চোখের ঘুম ছাড়ে নাই বলিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে-ছিল। উত্তর দিল—"কে?"

"আমি জীবানন্দ, দোর খোল।"

গিরিবালার ঘুম ছুটিয়া গিয়াছিল। সে একটু কি ভাবিয়া উঠিয়া দ্বারের অর্গল মুক্ত করিয়া দিল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ গিরিবালার বৃহৎ পুঁটুলীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"এ সব কি হ'চ্ছে গিরিবালা?"

গিরিবালা জীবানন্দের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"কিছু না, আজ আমি চ'লে যাব, তাই।"

—"চ'লে যাবে? কোথায়?"

—"যেখানে ইচ্ছা।"

জীবানন্দ কম্পিত স্বরে বলিলেন—"আর আমি তোমায় অপমান ক'রতে আসিনি, শুধু আমায় এইটুকু বল, তুমি কোথায় যাবে?"

—"কাশীতে—"

—"আর আসবে না?"

—"বোধ হয় না।"

জীবানন্দ উভয় করতল মধ্যে মুখখানি ঢাকিয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন—"গিরি—"

—"কেন?"

—"ভুল তো সকল মানুষেই ক'রে থাকে, কেউ তো তার হাত এড়িয়ে যেতে পারে না; কিন্তু তার পরে তো তারা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার সত্যের মধ্যে ফিরে আসতে পারে। তবে আমার বেলায় কেন তার ব্যতিক্রম হ'ল, ব'লতে পার?"

—"তোমার ভাগ্য অত্যন্ত খারাপ, আমার ভাগ্যও তাই। তাই আমি এই বাধা কাটিয়ে দূরে চলে যাচ্ছি—যাতে আর না ফিরতে হয়,—আর না তোমার আগে দাঁড়াতে পারি। তোমার পথ মুক্ত হোক।"

—"কিন্তু, কিন্তু—আজ তো আমি তোমার আঁচলের বাঁধনটুকুই প্রার্থনা ক'রছি। আর তো আমি মুক্ত হ'তে চাই না। তুমি আমায় টেনে নাও গিরি, আমার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনটাতে কখনও একটু স্নেহ-মায়ার পরশ পাইনি, পেলে হয় তো এমন হ'য়ে উঠ্‌তুম না।—আমায় আজ তোমার কাছে নাও, আর আমি এ ভার বইতে পারছিনে। বড় ক্লান্ত হ'য়ে আজ তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। দেবে না?"

গিরিবালা উভয় করতলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। জীবানন্দ দেখিলেন, তাহার আঙুলের ফাঁক বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। জীবানন্দ ধীরে-ধীরে উঠিয়া আসিলেন। উভয় হস্তে গিরিবালার মস্তক স্পর্শ করিয়া ধীর স্বরে বলিলেন—"বুঝেছিলাম অনেক আগেই। কিন্তু আসিনি। ইচ্ছে হ'য়েও পা আমার আটকে গেছে। তাই আমরা আজ এত দূরে।—যাও গিরি! আশীর্ব্বাদ করছি—শান্তিতে থেক। যদি কখনও অসহ্য ম'নে হয় এই সব, তখন তোমার কাছে যাব।—তখন আমায় একটু স্নেহ ক'রো, যত্ন ক'রো, শুধু এই ভেবে যে, আমি তোমার চেয়েও হতভাগ্য। তোমার ভক্তি আছে, ভালবাসা আছে, বিশ্বাস আছে, আমার কিছুই নাই। আমি নিঃস্ব।"

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও ঠিক ছিল না। হঠাৎ বাহির হইতে দামু গাড়োয়ানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল —"ও মা—"

—"এই যাই বাবা। এই বোঁচকাটা আগে গাড়িতে তোল। আমি বার হ'চ্ছি।" বলিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া গিরিবালা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কি লিখি ?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইং ১৮৭৭ সালে ৺শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী এক ইংরেজী প্রবন্ধে কথিত ও লিখিত বাংলা ভাষার প্রভেদ দেখাইয়াছিলেন। তাহার সার মর্ম, আমরা যে ভাষা কই, সে ভাষা লিখি না ; যে ভাষা লিখি, সে ভাষা পড়ি না। যেমন, আমরা কই ক-র‍্যে, খে-য়ে ; লিখি ক-রি-য়া, খা-ই-য়া। আমরা লিখি য-দি, ধা-ন্য, পড়ি জো-দি, ধা-ন্ন ইত্যাদি। বাংলা শব্দ থাকিতে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিশেষ আপত্তি ছিল। উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "অনেক স্থলে তিনি [শ্যামাচরণ বাবু] কিছু বেশী গিয়াছেন।" বহুকাল পরে কেহ "সাধুভাষা বনাম চল্‌তি ভাষা"র বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে বিবাদ নাই সেখানে আর নিষ্পত্তি কি ? বাদ-প্রতিবাদের নামও ঠিক হয় নাই। কারণ সাধুভাষা,—যে ভাষা সাধু কি-না সজ্জনে বলে ; চল্‌তি ভাষা,—যে ভাষা চলিতেছে। এ দুয়ের বিবাদ স্বাভাবিক নয়। 'সাধুভাষা' যে ভাষা ভদ্রলোকে লেখেন, আর 'চল্‌তি ভাষা' যে ভাষা কহেন, এরূপ অর্থ করিলেও নাম ঠিক হয় নাই। চল্‌তি ভাষা অসাধু নয়, সংস্কৃত-বর্জিত নয়।

আমি মৎকৃত ব্যাকরণে 'লিখিত' ও 'কথিত,' এই দুই নাম করিয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ দেখাইয়াছি। কেহ কেহ 'লেখ্য' ও 'কথ্য' বলিয়াছেন। কিন্তু এই দুই নাম অপেক্ষা 'লিখিত' ও 'কথিত' স্পষ্টার্থ। আরও স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত এখানে লৈখিক ও মৌখিক, এই দুই নাম করিতে যাইতেছি।

লৈখিক ও মৌখিক ভাষার বিশেষ

লৈখিক ভাষায় প্রবন্ধ রচিত হইয়া থাকে। লৈখিক ভাষা, বহুজন-স্বীকৃত ভাষা। মৌখিক ভাষায় রচিত হইতে পারে না, তাহা নহে। দুইটিকে পৃথক্ ভাষা বলা অন্যায়। লৈখিক ভাষায় ক্রিয়াপদ দীর্ঘরূপে লেখা হয়, মৌখিক ভাষায় হ্রস্বরূপ। যেমন, 'করিয়াছি,' 'লিখিতেছিলাম' স্থলে 'কয়েছি, 'লিখ্‌ছিলাম'। কয়েকটা সর্বনাম পদেও দীর্ঘ ও হ্রস্বরূপ আছে। যেমন, 'আমাদিগের' —'আমাদের,' 'তাহাদিগকে'—'তাদিকে'। বর্তমান লৈখিক ভাষায় সর্বনাম পদের মধ্যস্থিত 'গ' ও 'হ' লোপ করা হইতেছে। অতএব কেবল ক্রিয়াপদে উভয় ভাষায় কিছু ভেদ আছে। ব্যাকরণের অন্যপদে নাই। কিন্তু শব্দের উচ্চারণে দুই ভাষায় বহু ভেদ আছে। এ বিষয় পরে বলিতেছি।

মৌখিক ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে বাধা কি ?

অনেক কাল যাবৎ এই তর্ক চলিয়া আসিতেছে। অধিকাংশ তর্ক যেমন হইয়া থাকে, এখানেও তেমন। গোড়া বাঁধনি না করিয়া তর্ক। প্রথমে, "সাহিত্য" নামের অর্থ জানা চাই। দ্বিতীয়ে, "মৌখিক ভাষা" ইহার লক্ষণ চাই। দুই-ই উহ্য রাখিয়া দুইপক্ষ স্বচ্ছন্দে কথা কাটা-কাটি করিয়া আসিতেছেন, তর্কের মীমাংসা দূরে পড়িয়া আছে। "সাহিত্য" শব্দের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিত অর্ধপথে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এক একজন এক এক অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ঠিক, "সাহিত্য" অবশ্য লৈখিক ও স্থায়ী। কেহ উড়া কথাকে সাহিত্য বলিবেন না ; যে রচনায় স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই, সেটা সাহিত্য বলিবেন না। অভিধেয় অনুসারে ইহার তিন ভাগ করা যাইতে পারে। (১) জ্ঞান-সাহিত্য, (২) ক্রিয়া-সাহিত্য, (৩) ইচ্ছা সাহিত্য। যে রচনায় পাঠকের অন্ত-র্জ্ঞান-বৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা জ্ঞান সাহিত্য। যেমন দর্শন। কর্ম শিখাইবার অভিপ্রায়ে যে উপদেশ, সে উপদেশ ক্রিয়া-সাহিত্য। যেমন, ইতিহাস, বিদ্যা ও কলা। যাহাতে মিথ্যা সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের চিত্তবিনোদন হয়, সেটা ইচ্ছা-সাহিত্য। যেমন উপকথা, নাটক। প্রাচীন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিন ভাগ ধরিলে জ্ঞান-সাহিত্য সাত্ত্বিক, ক্রিয়া সাহিত্য রাজসিক, ইচ্ছা-সাহিত্য তামসিক।

ইচ্ছা-সাহিত্য রস-প্রধান। এই হেতু ইহাকে রস-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। যে রচনায় তিন গুণের একটাও থাকে না, সেটা টিকিতে পারে না, সাহিত্যও নয়। অধিকাংশ সাহিত্য মিশ্র। কোনটায় এ গুণ অধিক, কোনটায় অন্য গুণ অধিক। গুণের মধ্যে রূপও ধরিতেছি। রচনায় মাধুর্য না থাকিলে লোকে পড়ে না।

এখন মূল প্রশ্নে আসি। মৌখিক ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে পারে কি না। ইহার উত্তর,—পারে, পারে না। মৌখিক ভাষা অসাধু ভাষা নয়, অশ্লীল ও অশিষ্ট ভাষা নয়। কিন্তু বিবাদের হেতু এখানে নয়। মৌখিক ভাষা মানুষের মুখের ভাষা, মাতৃভাষা। কোন্ মানুষের মাতৃভাষা ? যোজনান্তে ভাষা ভেদ হয়। এখন যোজনান্তে না হউক, তিন চারি যোজনান্তে হয়। ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর শব্দে কিছু ভেদ আছে, অর্থাৎ মৌখিক ভাষা অ-স্থির, দেশকালপাত্র অনুসারে বিভিন্ন। লেখক মাত্রেই তাঁহার রচনার স্থায়িত্ব ইচ্ছা করেন ; শুধু স্থায়িত্ব নয়, তাহা বহুজনাদৃত, দেখিতে ইচ্ছা করেন। মৌখিক ভাষার সে সম্ভাবনা নাই। কারণ উহা অ-স্থির ও ভেদ-বহুল।

একটা উদাহরণ দিই। একবার আমি চট্টগ্রামে মাস দুই ছিলাম। দেখিতাম, যখন চট্টগ্রামবাসী পরস্পর কথা কহিতেন, আমি তাহাঁদের কথা বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতাম না। আমার সহিত কথা কহিবার সময় তাহাঁরা আমার জানা ভাষায় কহিতেন। আর এক ঘটনা বলি। একদিন বৈকালে আমার এক ঢাকা-নিবাসী বন্ধুর সহিত কর্ণফুলী নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে মনে করিলাম, একখান পান্‌সীতে—সেখানে বলে শাম্পান—চড়িয়া একটা খালে ঢুকিয়া কিছু দূর যাই, আশে পাশের বন জঙ্গল দেখার ইচ্ছা। সেখানে শতাবধি শাম্পান লইয়া মাঝী অনেক আসিয়া জুটিল। আমাদিকে লইয়া যাইতে পারিবে কি না, কত বেতন লইবে, এই জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না, শাম্পান-যাত্রাও হইল না, 'বেকুব' হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিবেন না, মাঝী অশিক্ষিত মুসলমান বলিয়া আমরা 'বেকুব' হইয়াছিলাম। একবার উত্তর রাঢ়ের (কাটোয়া-বাসী) উচ্চ-শিক্ষিত বন্ধুর সহিত এক বিস্তীর্ণ নদীর তীরে কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, "নদীর পার দেখা যাচ্ছে।" "পার ?" "পা-ই-র"। বহু কষ্টে বুঝিলাম পা-ড়। তাহাঁর মৌখিক ভাষায় পা-র, লৈখিক ভাষায় পা-ড়। অনেকে জানেন, বর্দ্ধমানে 'গুড়-মুড়ি' পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় 'গুর-মুরি'। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়াবিভক্তি নয়, শব্দেরও প্রভেদ আছে। নারীকে ও-লো না বলিয়া ও ট্যা সম্বোধন বিচিত্র ঠেকে। যাহাঁরা মৌখিক ভাষায় সাহিত্য-রচনার পক্ষে, তাহাঁদের যুক্তি বুঝি। মৌখিক ভাষা জীবন্ত ভাষা, বক্তার প্রাণের ভাষা। লৈখিক ভাষা কৃত্রিম। ইহার উত্তরে বলি, কৃত্রিমতা বর্জন করিয়া বৃহৎ সমাজের অন্তর্গত থাকা অসম্ভব। অপর সহস্র ব্যাপারে অন্যের মন যোগাইয়া চলিতে হয়, কথাবার্ত্তায়, বসন ভূষণে, আমাদের স্বাধীনতা নাই, ভাষাতেও নাই। পাঠক যে ভাষা সহজে বুঝিবেন, লেখককে সে ভাষায় লিখিতে হইবে, বক্তৃতায় সে ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি না করেন, লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

যখন দেশ ও পাত্র ভেদে মৌখিক ভাষার ভেদ আছে, তখন কোন্ দেশের কোন্ পাত্রের ভাষা আদর্শ ধরা যাইবে ? বাদী বলিয়াছেন, কলিকাতার মৌখিক ভাষা সে আদর্শ।

কথাটা ঠিক নয়। কলিকাতার ভাষা বলিয়া একটা ভাষা নাই। কলিকাতা নানাস্থানের নানা বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র বটে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে বুঝি, সকলের পক্ষে বাইরের ভাষা ও ভিতরের ভাষা এক নয়। অর্থাৎ বাহির বলিয়া এক ভেদ আছে। কাহারও পক্ষে সেটা কৃত্রিম, কাহারও পক্ষে অকৃত্রিম।

তবে দাঁড়াইল এই, যাহাদের পক্ষে অকৃত্রিম অর্থাৎ মাতৃভাষা, সেই অল্প সংখ্যক লোকের ভাষা আদর্শ করিতে হইবে। এখানেও অল্প-স্বল্প ভেদ আছে। শব্দের উচ্চারণে ভেদ আছে। এক এক ভদ্রবংশে 'শ' নাই ; সব 'স'। এক এক ভদ্রবংশে ঙ্গ নাই ; সব ঙ্গ। ইত্যাদি। শব্দেও ভেদ আছে। 'দিদিমণি', 'কথাখানার ভাবখানা' হইতে 'গান-খানা', শুনিলে অনেকস্থলে মেয়েরাও কলিকাতার নগরালীর খোঁটা দেয়। কেহ বলে, 'ছিলাম', কেহ 'ছিলেম', কেহ 'ছিলুম', কেহবা 'ছিনু'। অসংখ্য লোক 'ছেল' বলে।

জাত্যভাষা এক স্থানীয় ভাষা

যত মানুষ তত কণ্ঠ, তত মন, ভাষাও তত বলিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা অন্ধকারে কিংবা দূর হইতে কথা শুনিয়া লোক চিনিতে পারি। বামাকণ্ঠ কি পুরুষকণ্ঠ, সে প্রভেদ ব্যতীত আরও অনেক অবান্তর থাকে, তদ্দ্বারা আমরা চিনিতে পারি। এক একজন এত দ্রুত কথা বলে যেন ঝড় বহিতে থাকে, পদের পরে পরে বিরাম থাকে না, বর্ণের পরে পরেও থাকে না। হাতের লেখার ছাঁদ সকলের সমান হয় না, হইতে পারে না। কিন্তু আমরা অবান্তর ছাড়িয়া মুখ্যরূপ দেখিয়া পরের লেখা পড়িয়া থাকি। সেইরূপ, বহুজন-পদবাসী বহুজনের ভাষা অবিকল এক হয় না, হইতে পারে না। যে রূপ সকলে চেনে, মানে, সে রূপই তাহাদের ভাষা। ইহাকে জাত্যভাষা বলিতেছি। সেটা সকল প্রভেদের মধ্যম নিষ্পত্তি নয়, কোনও এক স্থানের ভাষা। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গের ভাষা মিশিয়া বাঙ্গালা ভাষা নয়, কোনও এক স্থানের চলিত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি। সে স্থান, দক্ষিণ রাঢ়।

রাঢ় বলিতে ভাগীরথীর পশ্চিমস্থিত নদীমাতৃক ভূ ভাগ বুঝায়। ইহার পূর্বসীমা ভাগীরথী, পশ্চিমসীমা দারকেশ্বর, বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের মাঝদিয়া উত্তর দক্ষিণ এক রেখা করিলে এই রেখার পূর্বে রাঢ় দেশ। রাঢ়েও দুই-ভাগ আছে, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। বর্দ্ধমান ও কালনা দিয়া এক রেখা করিলে সে রেখার উত্তরে উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণে দক্ষিণ-রাঢ়। ভাষা শুনিয়া দক্ষিণ রাঢ়ও দুই ভাগ করিতে পারা যায়। পূর্বে ও দক্ষিণে ভাগীরথী, পশ্চিমে দামোদর। এই ভূ-ভাগ পূর্বকূল। পূর্বে দামোদর, পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর, এই ভূ-ভাগ পশ্চিম-কূল। চিত্র দ্বারা মোটামুটি দেখাইতেছি। এই যে দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমকূল, ইহা বর্তমান হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ লইয়া কতকটা দেশ। মৎকৃত ব্যাকরণে এই দেশকে মধ্যরাঢ় বলিয়াছি, এবং এই দেশের প্রচলিত শব্দ লইয়া "বাঙ্গালা শব্দকোশ" করিয়াছি। এইটি দক্ষিণ-রাঢ় ছিল, এখন দক্ষিণে গঙ্গা পর্য্যন্ত দক্ষিণ-রাঢ় বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সে দিনকার হাওড়া দক্ষিণ-রাঢ়ের দক্ষিণের সীমা হইয়াছে। আমি মনে করি, মধ্য-রাঢ়ের চলিত অর্থাৎ মৌখিক ভাষাই জাত্যভাষা। আমি 'আদর্শ' বলিতেছি না, বলিতেছি প্রকৃতি (type)।

কেন বলিতেছি? (১) এই অঞ্চলের শিক্ষিত অশিক্ষিতের, উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর, সকলের এক ভাষা। বঙ্গের অন্য কুত্রাপি এই লক্ষণ পাওয়া যাইবে না। যাহাদের কান আছে, মৌখিক ভাষা লক্ষ্য করিবার অভ্যাস আছে, তাহারা চমৎকৃত হইবেন। এখানকার নারী ভাষার শব্দে কয়েকটা প্রভেদ আছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য না করিলে ধরা পড়িবে না। (২) জাত্যভাষার সহিত এই অঞ্চলের মৌখিক ভাষা মিলাইলে, শব্দে ও ব্যাকরণে, দুই ভাষা প্রায় এক বোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কৃত বাল-পাঠ্য পুস্তকে এই অঞ্চলের ভাষা লিখিয়াছেন, শুদ্ধ করেন নাই। তাঁহার পিতৃভূমি মলয়পুর, আরামবাগের ৭।৮ মাইল পূ-পূ-উত্তরে, দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের প্রায় মাঝে। বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার মাতুলালয় ছিল, এবং সে-খানেই তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন। মলয়পুরের ও বীরসিংহের ভাষার শব্দে একটু প্রভেদ আছে। কিন্তু তিনি মলয়পুর অঞ্চলের ভাষা লিখিয়াছিলেন। উত্তরে ঘনরাম, পূর্বে ভারতচন্দ্র, দক্ষিণে রামমোহন, পশ্চিমে মাণিকরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ইহাঁদের রচিত বই পড়িলেই ভাষার উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ভাষার ভাল মন্দ বলিলে বুঝি, জাত্যভাষার, মান্য ও আদরণীয় ভাষার তুলনায় ভাল কিম্বা মন্দ। অর্থাৎ প্রকৃতির বিকৃতি (variation from the type) তুলনা করি।

যাহাকে কলিকাতার ভাষা, রাজধানীর ভাষা বলি, এবং যাহাকে বিজ্ঞ জনে আদর্শ করিতে বলিয়া থাকেন, সে ভাষা মূলে এই মধ্য রাঢ়ের ভাষা। তাহাতে দুই পাঁচটা নূতন শাখা গজাইয়াছে। কিন্তু সে শাখা বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ নয়, নদীয়া জেলার ও হিন্দীর উড়া পাতা শাখায় জড়াইয়া গিয়াছে। সে সকল শব্দ না পাইলে ভাষা শুদ্ধ থাকিত।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বুঝি-বা বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল-পাঠ্য বই লিখিয়া তাহাঁর দেশের ভাষা চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেটা ভুল, তিনি ভাষা গড়েন নাই, যেমন পাইয়াছিলেন, তেমন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ক-রি-বে-ক রাখিয়া গিয়াছেন, ক-রি-বে করেন নাই।

ই-বে-ক, ই-লে-ক এখনও তাহাঁর মাতুলালয়ের দিকে চলিতেছে। রামমোহন রায়ের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেশে এক 'না' প্রয়োগ আছে, সেটার অর্থ 'নাই'। "তাকে চিঠি লিখি না" অর্থাৎ "লিখি নাই"। কেমনে অতীত ও বর্তমান কালে প্রভেদ রাখা হয়, অনুসন্ধান করি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দ্ব্যর্থ 'না' বর্জন করিয়া তাহাঁর পিতৃভূমির মানরক্ষা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ রাঢ়ের গরিমা নূতন নয়। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ শাকনাড়া নামক জন্মগ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

যস্যাভবজ্জননভূঃ
কিল শাকরাঢ়া
রাঢ়াসু গাঢ়-গরিমা
গুণিনাং নিবাসাৎ।

যাহাঁর জন্মভূমি শাকরাঢ়া, যাহা অনেক গুণবান্ লোকের বাস-হেতু রাঢ়ের মধ্যে গাঢ়গরিমা হইয়াছে। এই শাকনাড়া বর্দ্ধমান জেলায় রায়না থানার অন্তর্গত, দামোদর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে। তর্কবাগীশ মহাশয় ইং ১৮০৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের কিছু দক্ষিণে এবং দামোদরের পশ্চিমে কবিকঙ্কণের দামিন্যা গ্রাম। কিন্তু ইহাঁর বহুপূর্বে (১২শ খ্রীষ্ট শতাব্দে) শ্রীকৃষ্ণমিশ্রকৃত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে দক্ষিণ রাঢ়ার ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামের "দত্ত" বলিয়াছিলেন,—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা
তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিক নাম ধাম পরমং
তত্রোত্তমো নঃ পিতুঃ।

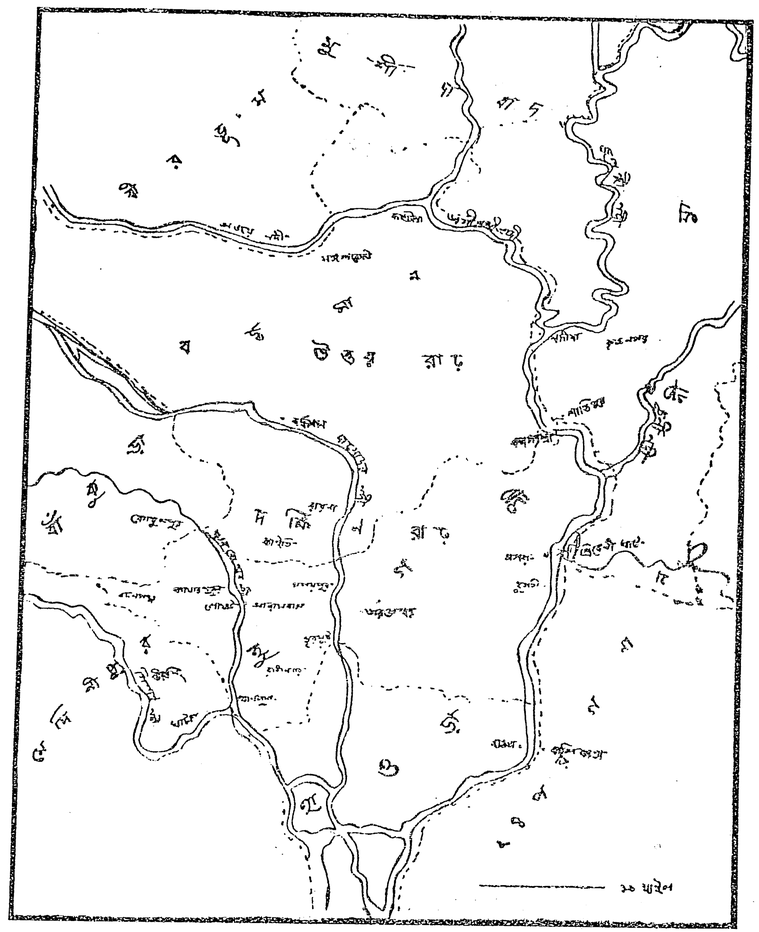

মানচিত্র

গৌড়রাষ্ট্র অনুত্তম (excellent) বটে, কিন্তু সে রাষ্ট্রের রাঢ়া পুরী অতুলনীয়া। তাহার মধ্যে ভূমিশ্রেষ্ঠী গ্রাম উৎ-তম। ভূরি বহু শ্রেষ্ঠী বণিকের বাস হেতু ভূরিশ্রেষ্ঠী। বর্তমানে ভুরসুট এক পরগণার নাম। এখানে রায় গুণাকরের জন্ম হইয়াছিল। এই গ্রাম হুগলী জেলায় দামোদরের পশ্চিম কূলে। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র 'রাঢ়াভূমি' না লিখিয়া 'রাঢ়াপুরী' লিখিয়াছেন। পুরী অর্থে নগর বুঝায়। কোন্ রাজার নগর ?

শ্রীকৃষ্ণমিশ্রেরও পূর্বে ইং দশম শতাব্দে "ন্যায়কন্দলী"-প্রণেতা শ্রীধর, ভূরিশ্রেষ্ঠী ভূরিসৃষ্টি গ্রাম অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

আসীদ্ দক্ষিণ-রাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মনাম্।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠি জনাশ্রয়ঃ ॥

কোন্ রাজার আশ্রয়ে দক্ষিণরাঢ়া গুণিগণের নিবাস-ভূমি হইয়াছিল, তাহা অজ্ঞাত।

ব্রাহ্মণেরা যেখানে সেখানে বাস করিতেন না। সেকালে বাস্তুর উপযোগী ভূমিরও অভাব ছিল না। বাস্তুভূমি উত্তর-প্লব কিংবা পূর্ব-প্লব হইবে অর্থাৎ উত্তর কিম্বা পূর্বদিকে ঢালু হইবে; উচ্চ হইবে (এই হেতু ব্রহ্মডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাসের তুঙ্গভূমি); মৃত্তিকা কঙ্করবর্জিত কোমল হইবে; উর্বরা হইবে; নিকটে বৈশ্যবাস থাকিবে, ও নীচ জাতির বাস দূরে হইবে; নিকটে নদী থাকিবে; এইরূপ কতকগুলি বাঁধা নিয়ম ছিল। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামক আর্য জাতি রাঢ়ে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাহাঁরা এইরূপ দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে পাইয়াছিলেন। এখানেই বঙ্গের আদি ব্রাহ্মণ, সপ্ত-শতী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। দেশটির শোভা দেখিয়া নাম দিয়াছিলেন, সুহ্ম। 'রাঢ়া' নামেরও সেই অর্থ, শোভা। পূর্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে বিস্তীর্ণ পলিভূমি। কিন্তু তখন দেশটি কিছু নীচু ছিল। এখন কাটোয়া ৩২ ফুট উচু। বোধ হয় তখন ১০।১৫ ফুট মাত্র ছিল। ব্রাহ্মণেরা দ্বীপ দেখিয়া বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণে বাড়িতে বাড়িতে ত্রিবেণী শেষ সীমা করিয়াছিলেন। ত্রিবেণী, দক্ষিণ প্রয়াগ, পুণ্যস্থান। ইহারই কিছু দক্ষিণে সাগরসঙ্গম ছিল। মগরা নাম ও মগরার মোটা বালি দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়। দামোদর পুরাতন পূর্ব্বপথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণগামী হইয়াছে। দ্বারকেশ্বরও সেইরূপ বাঁকিয়া দক্ষিণগামী হইয়াছে। এই দক্ষিণবাহী দামোদরের পশ্চিমকূল, ভাগীরথীর পশ্চিম-কূলের সদৃশ। গঙ্গা নাই, এই দুঃখ। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে বরং উত্তম। দামোদরের পলির তুল্য উর্বরা মৃত্তিকা বিরল। আর্য্যবংশধরেরা এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ফলে আর্য-কৃষ্টির দেশ দুই স্থানে বিভক্ত হইয়া পড়িল। নবদ্বীপ লইয়া দেশের খ্যাতি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমে দক্ষিণ রাঢ়ের খ্যাতিও বৃদ্ধি হইতে থাকিল। বোধ হয় বাঙ্গালাভাষা দক্ষিণ রাঢ়ে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল। রাজা মানসিংহের সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণ রাঢ় হিন্দুরাজার অধীন ছিল। ভাষার শুদ্ধি ও সমতা রক্ষার পক্ষে ইহা বিশেষ কারণ হইয়াছিল। উত্তর-রাঢ়ে এই সুবিধা ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সে দেশের সকল কবির ভাষা সমান নয়। লোচনদাসের "চৈতন্যমঙ্গল" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে বর্দ্ধমান জেলার ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলের ইং ষোড়শ শতাব্দের বাঙ্গালা ভাষা আছে। কিন্তু দুই ভাষার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। এই শতাব্দের সপ্তগ্রাম-নিবাসী মাধবাচার্যের ও দামিন্যা-বাসী মুকুন্দরামের চণ্ডীর ভাষায় প্রভেদ নাই বলিলেই হয়।

পূর্বে লিখিয়াছি, এখন দক্ষিণ রাঢ় দক্ষিণে বাড়িয়া হাওড়ায় গিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু এই দক্ষিণ ভাগ অধিক পূর্বে বাসযোগ্য ছিল না। হুগলী চুঁচুড়া শ্রীরামপুর বালি প্রভৃতি সেদিনকার। সে সব অঞ্চলে নানা দেশের লোক গিয়া বাস করিয়াছে, ভাষায় উচ্চনীচ ভেদ রহিয়াছে। দুই একশত বৎসর না গেলে এক হইবে না। হুগলীর শিক্ষিত লোকেও বলেন, তা-দে-ঘ-রে, অর্থাৎ তা-দি-কে। নদীয়ায় তা-দে-র। এই তা-দে-র সম্বন্ধপদ কি কর্মপদ, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তখন কর্মপদ বুঝাইতে তা-দে-র-কে বলিতে হয়।

স্থান নির্ণয়ের প্রয়োজন কি ?

প্রয়োজন দুইটি। (১) কলিকাতার ভাষার শব্দ সংগ্রহ হয় নাই। সংগ্রহ হইলে দেখা যাইবে, শব্দ অল্প, তদ্দ্বারা নগরবাসীর কাজ চলিবে, গ্রামবাসীর চলিবে না। কলিকাতায় মাঠ কই? অগণ্য গাছপালা জীবজন্তু কই? দেশে যে বিপুল কৃষিকর্ম চলিতেছে, তাহার একটি শব্দও পাওয়া যাইবে না। এইরূপ অন্যান্য ক্রিয়াসাহিত্যের শব্দের অভাব হইবে। কোন্‌টি জাত্য, ইহা না জানিয়া, লেখক হাতড়াইয়া বেড়ান, কিম্বা নিজের গ্রামের প্রচলিত শব্দ লেখেন। কিন্তু স্বপ্ন স্বাধীন হইলে বাঙ্গালাভাষা নামে ভাষাই থাকিবে না। আমি বুঝি, মাতৃভাষার তুল্য মধুর ভাষা নাই। কিন্তু কি করি, দশজনকে লইয়া সংসার। তাহাঁদিগকে ছাড়িয়া কেমনে বাঁচিব? তাহাঁদের মন যোগাইতেই হইবে, আমি স্বাধীন হইলে আমিই ঠকিব। অতএব বছর কতক

মাতৃভাষার সঙ্গে বিমাতৃভাষাও শিখিতে হইবে; পরে বিমাতৃভাষাই মাতৃভাষা হইয়া যাইবে।

একটা উদাহরণ দিই। বৈশাখ মাসের "পথ" নামক মাসিক পুস্তক হইতে লইতেছি। ইহাতে "জনৈক পল্লী-বাসী" "পাট, খেজুর গাছ ও ইক্ষু" চাষের ক্রম ও চাষে লভ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ মূল্যবান্ মনে করি। কিন্তু সে বিচার এখানে নয়। কয়েকটা শব্দ তুলিতেছি। তিনি শব্দগুলির অর্থ দিয়াছেন, নইলে কয়েকটা বুঝিতাম না। বিঁ-দে (কৃষিযন্ত্র), হইবে বি-দে; বাস্তবিক বি-দা (সংবিদ্ধক)। বা-ই-ন, তিনি লিখিয়াছেন, গুড় পাকের চুল্লী; কিন্তু আমি বুঝি গুড়পাকের গোস্তনাকার বৃহৎ মৃৎপাত্র (সং বা-ণ)। এই অর্থ ঠিক, নইলে 'পাঁচ বাইন' 'সাত বাইন' চুলী বলা চলিত না। খেজুর কিম্বা আখের রসের গা দ, ইনি লিখিয়াছেন ম-লো।* "পল্লীবাসী" গ্রাম ও জেলার নাম দেন নাই। এইরূপ যদি এক এক গ্রামে প্রচলিত নাম লিখিতে হয়, প্রত্যেক নামের অর্থও লিখিতে হইবে। আর এক লেখক কা-শ্যা ঘাসের আসন করিতে শিখিয়াছেন। তিনি ঠিক বানান করিয়াছেন; দুর্ভাগ্য, নব্য-শিক্ষিত পড়িবেন 'কাশ্‌শা', আর আকাশ পাতাল ভাবিতে থাকিবেন।

(২) একটা জাত্য ভাষা চাই। নইলে লেখক স্বেচ্ছামত শব্দ লিখিয়া ভাষায় বিপ্লব ঘটাইতে থাকিবেন। একটা উদাহরণ তুলি। উদাহরণটি যে-সে লেখনী-প্রসূত নয়। সম্প্রতি শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ" লিখিয়াছেন। এখানে প্রশংসার অবসর থাকিলে পুস্তকখানির বিলক্ষণ প্রশংসা করিতাম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকার প্রশংসার দ্বারা ধৃষ্টতা করিব না। কিন্তু দ্রষ্টব্য এই, তিনি আ-ম না লিখিয়া আঁ-ব লিখিয়াছেন। আঁ-ব বুঝি; কিন্তু "তিনি হাসিতে হাসিতে ন-গি-য়া পড়িতেন। তিনি অনেকবার ন-গি-য়া ন-গি-য়া পড়িলেন।" বুঝিতে পারিলাম না। লোকে হাসিতে হাসিতে ঢ-লি-য়া পড়ে, লু-টি-য়া পড়ে, গ লি-য়া পড়ে, হাঁ-ফা-ই-য়া পড়ে। কিন্তু ন-গি-য়া পড়িবার হাসি শুনি নাই। ভূমিকায় দেখিতেছি বা-র-গী। লোকে বলে, "ব-র্গী-র হাঙ্গামা"। তিনি একই দ্রব্য বুঝাইতে 'চাবি কুলুপ', 'চাবি', 'তালা' লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষার আরও কিছু বিশেষ আছে, পরে দেখিতেছি।

* বর্তমান প্রবন্ধের বাহ্য হইলেও লিখি, পায়রার বক-বক শব্দ হইতে ম-লো নয়। শব্দটি পয়স্ (জল)+ড়া। যে গুড়ে জলের ভাগ বেশী।

উপন্যাস হইতে উদাহরণ !

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে 'গল্প' ও 'উপন্যাস' দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বাজার ভরিয়া গিয়াছে। আমি সে বাজার ঘুরি নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনে দেখি, 'সিরিজ' চলিতেছে। কোনটায় ৫০।৬০ খানা, কোনটায় শতাবধি। মাসিক পুস্তকে 'ছোট গল্প,' 'বড় গল্প' ও "উপন্যাস" থাকে। একবার তিন চারি মাসের পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয়, তিন চারি পৃষ্ঠায় শেষ হইলে 'গল্প,' নয় দশ পৃষ্ঠায় হইলে 'বড় গল্প,' আর শনৈরাগত বর্ষব্যাপী হইলে 'উপন্যাস'। মাসে মাসে একটু একটু পড়িতে আমার ধৈর্য থাকে না, উপন্যাস পড়াও হয় না। কিন্তু "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত ও জ্যৈষ্ঠমাসে সমাপ্ত "বিপত্তি"র শেষ দেখিতে ধৈর্য ছিল, তিন চারি মাস পড়িয়াছি। ইহার লেখক শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া। ইহাঁর উপাধি, সরস্বতী, সার্থক হইয়াছে, "বিপত্তি"তে সরস্বতী মূর্তিমতী দেখিতেছি। ধন্য সাধনা! এমন একটানা ওজস্বীভাব ত দেখি না! সুর সপ্তমে বাঁধা, বিষাদে ভরা, কিন্তু কৃত্রিম নয়। সপ্তম হইতে পঞ্চমে নামিতে পারা যায়, কিন্তু একবারে খাদে নামিতে গেলে সুর বিকৃত হইয়া পড়ে। বিনয় নামধারী যুবকটির চপলতা বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে সে বিচারের অবসর নাই। মৌখিক ভাষার উদাহরণ নিমিত্ত "বিপত্তি" ধরিতেছি। জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষে" ৩৫ পৃষ্ঠা আছে, সাধারণ বইর আকারে ছাপিলে ৭০ পৃষ্ঠা হইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "ভূমিকা" ২৫ পৃষ্ঠা। ইহাতেও মৌখিক ভাষা আছে। "বিপত্তির" ভাষা শুদ্ধ বাংলা, জাত্য বাংলা বলিতে পারি। ইহাতে বাক্যের ঘূর্ণিপাক নাই, ইংরেজীর তর্জমা নাই, খাঁটি বাংলায় বড় বড় তত্ত্বের আলোচনা আছে। লেখিকা একাগ্রমনে লিখিয়া গিয়াছেন, বোধহয় ভাষা দেখিবার মন পান নাই;

কিন্তু আশ্চর্য, ব্যাকরণ-ভুল নাই! অল্প রচনাই এই পরীক্ষায় পাশ হইয়া থাকে। "ভূমিকা"ও পাশ হইতে পারে নাই। শুধু পদবিন্যাসে নয়, লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের রূপে বিসম্বাদ ঘটিয়াছে। অত্যল্প জনে শাস্ত্রী মহাশয়ের তুল্য সোজা বাংলা লিখিতে পারেন, তথাপি মতান্তর ঘটিয়াছে। "বিপত্তি"র একটি স্থানে 'সিংহ' স্থানে 'সিংহরা' হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী বাক্যে ভুল সংশোধিত হইয়াছে। বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকে 'গোরুরা,' 'গাছেরা' দেখিয়াছি।

"বিপত্তি"র কয়েকটি শব্দ পরীক্ষা করি। ঠা-কু-র্দ্দা অবশ্য ঠা-কু-র-দা-দা, সংক্ষেপে রাঢ়ে ঠা-কু-দ্দা, নদীয়ায় ঠা-কু-র্দ্দা, তৎপূর্বে ঠা-উ-র্দ্দা। লেখিকা শব্দের মূল রূপ-প্রকাশের পক্ষে। অনেক শব্দে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি রাঢ়ের ভাষায় লিখিয়াছেন, সেই সূত্রে ঠা-কু-দ্দা লিখিলে ভাল হইত। বিশেষতঃ যখন দ-এর দ্বিত্ব হইয়াছে, তখন রেফ থাকিতে পারে না। 'গ্রা-ন্তা-রী চালে সম্মানের পাত্র সাজা'—গ্রা-ন্তা-রী শুনিয়াছি মনে হইতেছে। গম্ভীর নয়, স্বাভিমানী অর্থ। কিন্তু কেমনে? বিক্রম-ভারী? 'রসনা ত-ড়-পা-চ্ছে,' শুনি নাই; অর্থ, জিহ্বা লাফাচ্ছে। হিন্দী হইতে কলিকাতায় নাকি ত-ড়-পা-চ্ছে আছে। কিন্তু হিন্দী হইলেই পাঙক্তেয় হয় না। বোধ হয় 'তল-প্রহার' হইতে; জিহ্বা তল দ্বারা প্রহার করিতেছে। রসনার তড়পানা, অশিষ্ট ভাষা। 'আজে বাজে কাজ'—'বাজে কাজ,' কর্তব্য-বাহ্য কাজ বুঝি; কিন্তু আ-জে? আদ্য? প্রধান কাজ ও অপ্রধান কাজ, এই অর্থ হইতে পারে। তাহা হইলে এখানে আ-জে হইবে না, শুধু বা-জে থাকিবে। অলস লোক আ জে বা-জে কিছুই করে না, এরূপ প্রয়োগ থাকিবার কথা। যদি না থাকে, আ-জু বেগারের কাজ, বা-জে বাহ্য কাজ, প্রয়োগ দেখিলে এই মূল মনে হয়। আ-জু-র্ শব্দ সং, প্রচলিত নয়। 'নানা-বাহানা' ছাপায় এক পদ। বা-হা-না, ছল বুঝি, কিন্তু 'নানা-বাহানা? বা-য়-না-ক্কা নারী ভাষায় স্নেহে ভর্ৎসনা। কিন্তু মূল কি? 'স্কন্ধে কাটা পেত্নী'? পেত্নীর সর্বাঙ্গ থাকে, কিন্তু দেহ শুষ্ক শীর্ণ। বা-রে-ণ্ডা, "ভূমিকা"র বা রা-ণ্ডা ঠিক। কেহ কেহ মনে করেন, বুঝি ইংরেজী ভে-রা-ণ্ডা হইতে বা-রা-ণ্ডা, কিন্তু ঠিক উল্টা। কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষিতা মহিলার মুখে ভ্রে-ণ্ডা হইয়াছে। গাঁ-ঠ গ্রাম্য, গাঁ-ঠ জাত্য। নইলে গাঁ-ঠরি পাই না। গাঁ-ঠ কাটাও আছে। হা-য়-রা-ণ হইবে হ-য়-রা-ন। "হায় হায়" বলিতে বলিতে গ্রাম্য হা-য়-রা-ণ। এইরূপ একটা জানা শব্দের উচ্চারণ বশে বালকেরা অন্য শব্দ রূপান্তরিত করিয়া ফেলে। যদি তে-র তাহা হইলে প-নে-র, স-তে-র, আ ঠে র। "বিপত্তি"তে প-নে-র, "ভূমিকায়" প-ন-র। 'রো' নাই। বা-র তেও ওকার নাই, "বিপত্তি"তে ম-ন্তো নাই। ট-লা-ন, এ-গো-ন আছে, কিন্তু অন্য শব্দে 'নো' হইয়াছে। "ভূমিকা"য় কেবল 'নো'। "ভূমিকা"য় উ-প-র ও-প-র, ভি-ত-র ভে-ত-র আছে। "বিপত্তি"তে ভি-ত-র নাই, সব ভেতর।

'নাই', 'নেই', 'না', 'নে', 'নি', এই কয়েকটির প্রয়োগ বাঙ্গালীকে শিখাইতে হয় না, কিন্তু দেশভেদে অর্থভেদ আছে। রাঢ়ে পুরুষের ভাষায় 'নাই', নারী ভাষায় 'নেই', এক সাধারণ নিয়ম। ইদানী এই প্রভেদ অস্পষ্ট হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'নেই' জানিতেন না। শব্দানুষঙ্গে নে-ই উচ্চারণের উৎপত্তি। সে (এ) নে-ই, ঘরে (এ) নে-ই। এই প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়িয়া এক এক লেখককে নে-ই-মুগ্ধ করিয়াছে। "ভূমিকা"য় না-ই, নে ই দুই আছে, কিন্তু প্রভেদ স্পষ্ট নয়। 'বিদ্যাসাগর নেই', 'ঘর নাই', 'পুকুর নাই'। "বিপত্তি"তে 'বন্ধুর নে-ই', বিশ্বাস নে-ই, 'সন্দেহ না-ই'। 'না' স্থানে 'নে' হইবার কারণ ভিন্ন। 'ই' পরে 'আ' থাকিলে মৌখিক ভাষায় 'আ' স্থানে 'এ' হয়। 'উ' পরে 'আ' থাকিলে 'আ' স্থানে 'ও' হয়। এই দুইটি মুখ্য নিয়মে অসংখ্য শব্দের দুই দুইরূপ হইয়াছে। যেমন, চিঁড়া চিঁড়ে ("ভূমিকা"য় চিঁ-ড়া), বু-ড়া বু-ড়ো। "বিপত্তি" ও "ভূমিকা"য় বু-ড়া, বু-ড়ো দুই-ই আছে। "বিপত্তি"তে পূ-জা পূ-জো, দুই ই আছে। কিন্তু গু-লা, গুলো নাই। "না" স্থানে "নে" উক্ত নিয়মে হইয়াছে। যেমন, 'আর পারি না'—'আর পারি-নে,' 'বলিস্ না'—'বলিস্ নে'। 'যাস্‌নে'—এখানে যা-ই-স মনে করিয়া 'নে'। অতীতকালে 'নি', যেমন "বলি নি"—'নাই' সংক্ষেপে, কিন্তু প্রয়োগে নিশ্চিত অভাবে না-ই, সামান্য অভাবে 'নি'। 'বলি নাই', 'বলি নি', দুয়ের অর্থে প্রভেদ আছে।

দ্বিরুক্ত ধাতুশব্দ ও যুগ্মশব্দ বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পত্তি। মৌখিক ভাষায় অধিকার না থাকিলে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারা যায় না। মৎ-কৃত ব্যাকরণে ইহার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। এখানে পুনরুক্তি করিব না। যথাস্থানে প্রয়োগ কঠিন বটে, কিন্তু ধাতু চিন্তা করিলে প্রায় ভুল হয় না। "ভূমিকায়" 'হন্ হন্ হাঁটা', 'দর্ দর্ ঘাম'। "বিপত্তি"তে 'মাথা টন্-টন্', 'থর-থর কাঁপা,' 'চোখ ঢুলু-ঢুলু,' 'মিটি-মিটি, মিট্-মিট', 'প্রাণ ছট্-ফট', 'খতমত খাওয়া,' 'গ্রাম তোল-পাড়', 'হুড়-মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়া' ঠিক হইয়াছে। কিন্তু প্রদীপ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে, নিভিতে পারে না। 'দুচোখে টস্-টস করিয়া' জল পড়িতে পারে না, দু-চোখ 'হইতে' পড়িতে পারে। ভয়ে 'বুক ধড়্-ফড়্' করে কি? দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতায় বুক ধড়্-পড়্ ধড়্-ফড়্ করে। অজীর্ণরোগে ধড়্-ফড়্ করে; কিন্তু ব্যাকুলতা সে রোগের এক লক্ষণ। মনে হয়, এইবার বুঝি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে। ইহাতে ভয় থাকে বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা মাত্রেই ভয় নিহিত। ভয়ে বুক দুর্-দুর করে, কি জানি কি ঘটে। অতি-ভয়ে বুক ঢিপ্ ঢিপ ধড়াস্-ধড়াস করিতে থাকে, যেন হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচ প্রসারণের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মচারিণী টল-মল করিতেছিলেন', এখানেও প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। ব্রহ্মচারিণী মেঝেয় বসিয়াছিলেন, যোগাভ্যাসে তাঁহার দেহ দুর্বল ও অতি লঘু হইয়াছিল, টল্-টল করিতেছিল, 'অর্থাৎ 'টলিয়া পড়ে পড়ে' হইয়াছিল। 'টলি' আর 'মলি' মর্দিত করিতে গুরুভার চাই (তু' দল্-মল)। বোঝাই না থাকিলে জলের তরঙ্গে নৌকা টল্-টল করে, বোঝাই থাকিলে টল্-মল করে। কিম্বা, স' মল ধাতু ধারণে। (ঝল্-মল শব্দে মল ধারণে।) টলি আর মলি, পড়ি আর ধরি, পড়িতে না পড়িতে স্থির হই। টল্-টল্ যন্ত্রবিদ্যার ভাষায় অ-স্থায়ী ভাব (unstable equilibrium), টল্-মল স্থায়ীভাব, ভার-কেন্দ্র নড়িলেও আধারের বাহিরে যায় না, টলিতে টলিতে আপনি স্থির হয়। দ্বিরুক্ত ধাতু শব্দ এইরূপ অনেক আছে, মৎপ্রণীত কোশে দুইশত আড়াইশত আছে। বৃষ্টি কত রকম? টিপ্-টপ, তড়্-তড়, ঝম্-ঝম, ঝিম্ ঝিম, টিপ্-টিপ, ফোঁটা-ফোঁটা, ফিন্-ফিন। কবিরা ঝিম্-ঝিম-কে রিমি-ঝিমি করিয়াছেন। বাতাস কত রকম? শোঁ-শোঁ, ফুর্-ফুর, ঝির্-ঝির, হুল্-হুল। সাধু ভাষায় অর্থাৎ কেতাবী ভাষায় 'অল্প অল্প বৃষ্টি' কিংবা 'মুষলধারে বৃষ্টি,' এই দুইটি আছে। 'প্রবলবেগে বায়ু' কিম্বা 'মৃদু মন্দ বায়ু' এই দুই সম্বল। "বিপত্তি"র 'জপিয়ে সপিয়ে' না 'জপিয়ে-টপিয়ে'? সং সপ্ ধাতু সম্যক অববোধ; স্তুতি। 'জপিয়ে-সপিয়ে' ঠিক; ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। জপিয়ে-টপিয়ে লিখিলে ভাবান্তর হইত। বাংলায় সপ্ ধাতুর পৃথক প্রয়োগ পাইনা। এমন আরও আছে।

চন্দ্রবিন্দু এক বিপত্তি। এটির নাম অর্ধ-অনুস্বার। কোথাও বহুল, কোথাও বিকল, কোথাও অল্প। মধ্যরাঢ়ে অল্প। কিন্তু ঘোঁড়া, খোঁকা আছে, আশ্চর্য বটে। আরও কয়েকটা আছে। সে দেশে কুঁয়ো, কুঁচি, বোঁচকা, টেঁকুর, কুঁড়ো (অলস), আঁটি (শাগের। আমের আঁঠি), বাঁসা, হাঁসি, ঘাঁস নাই। "বিপত্তি"র ঢোঁক, বাঁখারি, শিঁটকানো নাই। গোঁ-জ এর অর্ধানুস্বারও গ্রাম্য। গ্রাম্য কি-না জাত্য নয়। পোঁটলা-পুঁটলীও তদ্বৎ। পুঁথী, পুথী, দুই-ই জাত্য; পুঁ-থী ছাড়িতে পারিলেই ভাল। চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের সোজা নিয়ম নাই। বাঁকুড়া জেলা হইতে উত্তররাঢ় এবং গঙ্গার পূর্বপার চন্দ্রবিন্দুর দেশ।

চল্লিশ বৎসর হইল, ঙ স্থানে ঙ প্রথম দেখা দিয়াছে। এখন নব্যলেখকে ঙ বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহাঁরা ভা-ঙ্গা না লিখিয়া ভা-ঙা লিখিতেছেন। কেন লিখিতেছেন, কেহ তাহা ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু ঙ অক্ষরের চির-প্রচলিত উচ্চারণে ভা ঙা হয়, 'ভা ঙুঁ আ'। ইহাতে ভা-ঙ্গার ধ্বনি-সাম্য কই? ঙ-অক্ষরের নামেই ইহার উচ্চারণ পাই, ঙঁঅ বা ঊঁঅ। এই উচ্চারণ বলিয়া কাঙুর পড়ি, কা-ঙঁ-উ-র। মাণিক গাঙ্গুলী,—কা-ঙ-রে কামিক্ষা চণ্ডী,—কা ঙ-রে = কাউঁরে। ঘনরামে, ধাঙ ধাঙ ধাঙসা বাজে,—ভাঙ ভাঙ রণশিঙ্গা বাজে। এখানে ধা-ঙ কদাপি ধাং নয়, ভাঙ ভাং নয়। চৈতন্য-চরিতামৃতে, পিঙো পিঙো তভু করে,—পিঙো পিঙঁ (পান কর, ঙ-তে ওকার অনাবশ্যক ছিল)। চৈতন্য-মঙ্গলে, মো যাঙ আমারে দেহ সংহতি করিয়া,—এখানে 'মো' কর্তা, ইহার স্বর তুল্য যা-ঙঁ। জ্ঞানদাসে, কেন গেলাঙ জল ভরিবারে,—

এখানে গে-লা-ঙ, কর্তা 'মো'। গেলাঙ—গেলাং নয়। কবি-কঙ্কণে, ভেরী বাজে ধোঙ ধোঙ। শূন্য-পুরাণে, কাত্তিকের সোলুঙেতে,— যোলুঙ-এতে যেলউঁ-এতে, অর্থাৎ ষোড়শ দিবসে। সে কালের কবি স্ম-রি না বলিয়া সো-ঙ-রি বলিতেন। এখানে 'ম' স্থানে 'ঙ' বটে, কিন্তু উচ্চারণ সো-ওঁ-রি বা সো-উঁ-রি। এখনও গ্রাম্যজন স-ঙ-র-ণ বলে। 'ম' স্থানে 'ঙ' বলিয়া শব্দ কোমল করা হইত। যথা, জ্ঞানদাসে, ডাকে সভে সা-ঙ-লি বলিয়া,— সাঙলি সা-ওঁ-লি, শ্যামলী (গাই)। এইরূপ, কু-ঙা-র = কুমার। 'কুমার' হইতে কুমর, কু-ঙ র, হিন্দীতে কুঁ-ব-র বাস্তবিক কু-বঁ-র। এই বঁ দেখিলেই ঙ উচ্চারণ পাওয়া যায়। জ্ঞানদাসে, রজনী সা-ঙ-ন ঘন দেয়া গরজন। সা-ঙ-ন শা-বঁ-ন, শা-ওঁ-ন। অতএব ভা-ঙা = ভা-বাঁ, ভা-ওঁ-আ।

তর্ক উঠিতে পারে, আমরা সং-খ্যা লিখি, যদিও স-ঙ্খ্যা বানান শুদ্ধ। এই রূপ, গ-ঙ্গা না লিখিয়া গং-গা লিখিতে পারি। এবং যেহেতু ং উচ্চারণ ঙ্গ্, সে হেতু ঙ্ = ং = ঙ্গ্। কিন্তু এই সমীকরণে দোষ আছে, হেতুটি ঠিক নয়। কারণ ং, অনুস্বারের চিহ্ন, অনুস্বারে ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত থাকিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সংস্কৃতে ঙ বর্ণের দ্যোতক ং। এই চিহ্ন কিম্বা বাংলা ং চিহ্নের আকারেও ঙ অক্ষরের পাগড়ীটি সাক্ষী। ক বর্গের অনুনাসিক ঙ। অপর চারি বর্গেরও এক এক অনুনাসিক আছে। কিন্তু য র ল ব শ ষ স হ এই আট বর্ণের কই? সেটি ং বা ং, অর্থাৎ ঙ। আমার মনে পড়িতেছে, আমরা বাল্যকালে পাঠশালায় ঙ্ক, ংশ লিখিয়া পড়িতাম আওংক, আওংশ। অর্থাৎ প্রায় অঙ্ক, অঙশ। অদ্যাপি ওড়িয়াতে অং-শ উচ্চারিত হয় অঙশ। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুরে লিখিত এক সংস্কৃত পুথীতে অঙ্শ বানান দেখিয়াছি। বংশ (বাঁশ) হইতে ওড়িয়া বা-উঁ-শ শব্দ চলিতেছে। নাগরী লিপিতে ব্যঞ্জন অক্ষরের মাথায় বিন্দু দিয়া অনুনাসিক জ্ঞাপিত করা হয়। যেমন শং, সংশয়। এই বিন্দুর নাম পূর্ণ অনুস্বার। পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর না পাইলে কোন্ অনুনাসিক, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। হিন্দীতে বং-শ, উচ্চারিত হয় বন্স, সিং-হ সিন্হ। বোধ হয়, হিন্দীভাষী পণ্ডিতের নিকট হইতে 'সং-স্কৃত', ইংরেজীতে সন্স্কৃৎ (sanskrit) হইয়াছে। * মরাঠীতে লেখা হয় হিন্দীর তুল্য, সং-স্কৃত; কিন্তু বিজ্ঞজনে বলেন, উচ্চারিত হয় যেন সরঁস্কৃত, অর্থাৎ সঙস্কৃত। সং-সা-র মরাঠীতে সংর-সা-র রূপেও আছে। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করিলে সংস্কৃতে ঙ বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ জানিতে পারিব।

সংস্কৃত-প্রাকৃতে ং চিহ্নের উচ্চারণ ঙ্গ্ হইয়াছিল। তান্ত্রিক বীজ অং বং ইত্যাদির উচ্চারণ অঙ্গ্ বঙ্গ্ করিয়া থাকি। ফোর্ট উলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা ইংরেজ ছাত্রকে 'সঙ্গ্স্কৃত' শিখাইতেন, ছাত্র ইংরেজীতে 'ঙ্গ' বানান করিতেন। পূর্বকালাবধি রঙ্গ্ = রং বানান চলিয়া আসিতেছে। এই হেতু রং, র-ঙ্গে-র, রঙ্গিন্ স্বাভাবিকক্রমে লিখিয়া আসিতেছি। ব-ঙ্গ মূল শব্দ হইতে ব-ঙ্গা-ল, ব-ঙ্গা-লা, ব-ঙ্গা-লী। ব-ঙ্গা-লী, নাম দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ। ব-ঙ্গ-লা দেশ ও ভাষাও প্রসিদ্ধ। ঙ্গ উচ্চারণে ঙ্, কারণ পরে 'লা'-তে দীর্ঘস্বর আছে। অতএব বং-লা লেখাও চলে। 'ব' পরে যুক্ত ব্যঞ্জন আছে বলিয়া আমরা বা-ঙ্গা-ল, বা-ঙ্গা-লা বা বা-ঙ্গ্-লা, বা-ঙ্গা-লী বলি। অতএব বাংলা = বাঙ্গ্লা। বোধ হয়, এক কালে কোথাও কোথাও দেশের নাম ব-ঙ্গ-লা ছিল।

নদীয়া জেলায় এবং মুর্শীদাবাদ জেলার কিয়দংশে ভা-ঙ্গা শব্দের গ ক্ষীণ উচ্চারিত হয়। লোকে বলে ভাঙ্গ্-আঁ (প্রায়ই ভাঁঙ্গ্-আঁ)। এইরূপ, আ-ঙ্গি-না তাহাদের মুখে আঁঙ্গ্-ইঁনা। দক্ষিণ রাঢ়ে ভাঁ-গা, আঁ-গি-না। ভাঁ-গা শব্দে গ প্রবল নয়, ক্ষীণও নয়। অ-ঙ্ক আঁ-ক, শ-ঙ্খ শাঁ-খ, আ-ঙ্গু-ল আঁ-গু-ল, লা-ঙ্গ-ল লাঁগল বা নাগল ইত্যাদি ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী। নদীয়াবাসীর মুখে ভা-ঙ্গা শব্দের গ লুপ্ত নয়। নদীয়া ও রাঢ়ে প্রভেদ, বর্ণবিচ্ছেদে। যেমন উদ্-যোগ, উ-দ্যোগ, কিম্বা অবি-নাশ, অ বিনাশ। অবি-নাশ, নদীয়ায় ওবি-নাশ। অ-বিনাশ, রাঢ়ে অ বিনাশ। দেশভেদে সহস্র সহস্র শব্দের উচ্চারণ-ভেদ আছে। বানান দ্বারা সে সব শব্দ সকল লোকের বোধ্য হইয়াছে। মূল শব্দ ভ-ঙ্গ। ইহা হইতে ভ-ঙ্গা, বাং ভাং, ভা-ঙ্গ-ড়; ভ-ঙ্গ হইতে বাং ভাঁ-গা, ভাঁ-গা-নি, ভাংচা বা ভেং-চা, ভাং-চি ইত্যাদি। লোকের কান ও বাগ্-যন্ত্রভেদে শব্দের উচ্চারণ ভেদ হয়। সে ভেদ সাহিত্যে স্বীকৃত হয় না। কোন্ জাতীয় শব্দে কি সূত্রানুসারে ঙ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা জানিলে সকলে শিখিতে পারিতাম। রাঢ়ের উচ্চারণ-মত লিখিলে বাঁ-গা-ল, বাঁ-গা-লী, বাং-লা, রাঁ-গা, ভাঁ-গা লেখা উচিত। র-ঙ্গি ন্ পরিবর্তে রঁগিন্ লিখিতে পারি, কিন্তু র-ঙি-ন লিখিলে র-ইঁ-ন হইয়া যায়। এই উচ্চারণ যে অভিপ্রেত নয় তাহা জানাইবার নিমিত্ত র-ঙী-ন দীর্ঘ ঈ লেখা হয়। নতুবা ঈ স্বরের কোন হেতু ছিল না।

"বিপত্তি"তে আ-ঙুল, ডা-ঙা, ভা-ঙা, ভা-ঙ্, রূপ তাহার ভাষার সহিত 'মিট' খায় নাই। কিন্তু তবে ভাং-টি কেন? কা-ঙা-রু জন্তুটির ইংরেজী নামে গ লোপের জো নাই। "ভুমিকা"য়, দুই দুই রূপ আছে, বা-ঙ্গা-লী বা-ঙা-লী, টং টঙ্। পা-ঙ্গা-স, ডা-ঙ্গা আছে, ট-ঙে-র, র-ঙে-রও আছে। "এক পাকের তৈরী," এক রকম "ভার" নয় কেন? চা-ক-রি ঠিক, কারণ চা-ক রের কর্ম চা-কুরি। চা-কু-রি ও খি-চু-ড়ি দুই-ই ভুল। কারণ চা-ক-রে চা-কু নাই, খি-চ-ড়িতে চু-ড়ি নাই। এক পাকের তৈরিতে অ্যা-কৃট, এ্যা-নু-ই-টি, এ-না-ট-মি তিন রকম 'ভার' পাইতেছি। "বিপত্তি"র এ্যা-য়-সে, ক্যা-য়-সে হিন্দীতে ঐ-সে কৈ-সে। 'ঐ' হিন্দী উচ্চারণে 'এই'। অতএব বাংলায় 'এয়সে কেয়সে' হইবে। "বিপত্তি"র ব্রহ্মচারিণী আমায় এক বিপত্তিতে ফেলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"কাক অত্যন্ত চতুর, অতি ধড়িবাজ, সেই-জন্যে কোন্ অস্পৃশ্য বস্তু ভোজন করে মরতে হয় জানেন ত?" তাঁহার শ্রোতা নিশ্চয় জানিতেন, আমি কিন্তু একটুও জানি না; কেহ, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব না। কাক চতুর, নিজের মারাত্মক দ্রব্য খাইবে কেন? (দৃষ্টান্তটি সঙ্গত হয় নাই। বাক্যে ভাষাদোষও ঘটিয়াছে।)

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের কিম্বা শ্রীমতী সরস্বতীর ভাষার সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। মৌখিক ভাষা কোন্ দিকে কোন্ কূল ভাঙ্গিতেছে, কোন্ কূল গড়িতেছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত দুই রকমের রচনা লইয়াছি। কোনটাই যেমন-তেমন লেখা নয়। ক্রিয়া-পদ ধরি নাই। কিন্তু 'বলে কয়ে চলে গেল' ইত্যা-কার লিখিয়া গেলেই মৌখিক ভাষা হয় না। মৌখিক ভাষা চলিত্ ভাষা; নানা জাতীয় শব্দ, সংস্কৃত, অ-সংস্কৃত, বাংলা, অ-বাংলা দ্বারা এই ভাষা পুষ্ট হইয়াছে। দেশ ভাষায় অধিকার না থাকিলে এই ভাষায় রচনা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। বিপদ এই, নানা দেশ, না দেশ ভাষা। কেতাবী ভাষায় এই বিপদ নাই। দেখা গেল, চলিত ভাষায় কেবল ক্রিয়াপদ নয়, বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের ভেদ আছে। অর্থাৎ এখনও এই ভাষা ঢল্-ঢল করিতেছে। ব্যাকরণ দ্বারা দানা বাঁধা চলে কি না, তাহা দ্বিতীয় প্রবন্ধে চিন্তা করা যাইবে।

* সংস্কৃতে স ম্ম-ত সং ম-ত, দুই বানান আছে। পূর্ণ অনুস্বার উচ্চারণে ন হইয়া বাংলা ওড়িয়া মরাঠী হিন্দীতে সন্-ম-ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্যদিকে, 'ম' সহিত 'ঙ' উচ্চারণের সাদৃশ্য হেতু স্ম-র-ণ স-ঙ-র-ণ হইয়াছে। উৎ + মুখ = উন্মুখ; আবার ফলানাম্ ফলানাং দুই আছে। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই সকল পরিবর্তন ও ব্যাখ্যা করিবেন। ব্যাখ্যা যাহাই হউক, সন্-মুখ, সন্-মত, সন্-মান অশুদ্ধ বলিতে পারি না। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিচার করা যাইবে।

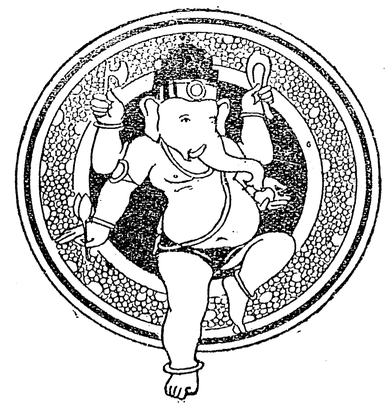

দূরের আশায়

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৭)

চরণ চলিতে চাহিতেছিল না, তবু জগদীশ জোর করিয়া চলিলেন।

গ্রাম্য পথে লোকজনের যাতায়াত খুবই কম, কদাচিৎ এক-আধজন চলিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে কেহই জগদীশের মুখ দেখিতে পাইল না,—দেখিলে হয় তো অনেক কিছু জানিয়া ফেলিত।

সম্মুখ দিয়া কয়েকটা শৃগাল অকুতোভয়ে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, জগদীশকে তাহারা দেখিয়াও দেখিল না। জগদীশ একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, অত কষ্টের মধ্যেও মৃদু হাসির রেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। এই ক্ষুদ্র শৃগালগুলি পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করে,—তিনি কোন্ স্পর্দ্ধায় মানুষের সমকক্ষ হইতে চাহেন।

বারাণ্ডায় অন্ধকারের মধ্যে উৎপলা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পিতার সাড়া পাইয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া আলোটা জ্বালিয়া আনিয়া বারাণ্ডায় রাখিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

জগদীশ শ্রান্ত পদে বারাণ্ডার এক ধারে বসিয়া পড়িলেন। তামাক সাজিয়া আনিয়া উৎপলা হুঁকাটা তাঁহার হাতে দিতে গেল। শ্রান্ত কণ্ঠে জগদীশ বলিলেন, "থাক মা, তামাক খেতে আর ইচ্ছে করছে না, ও থাক এখন অমনি।"

দুই হাঁটুর মধ্যে তিনি মুখখানা লুকাইলেন,—উৎপলা হুঁকা হাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সে জানে পিতা যত ক্লান্তই হইয়া আসুন না কেন, এক ছিলিম তামাক হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল ক্লান্তি বিদূরিত হইয়া যায়। আজ সেই তামাক সে দিতে গেল আর পিতা স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দিলেন, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সে উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল।

"বাবা—"

জগদীশ মুখ তুলিলেন, বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কি, কি বলতে চাস উৎপলা, একটু শান্তিতেও থাকতে দিবি নে? তোর জ্বালায় অবশেষে আমায় দেখছি আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়াতে হবে। একটু একটু করে পুড়িয়ে মারার চেয়ে আমায় চিতায় শুইয়ে মুখে আগুন দিয়ে দিস, সমস্ত দেহটাই জ্বলে ছাই হবে, সেইটাই সন্তানের উপযুক্ত কাজ হবে না কি?"

উৎপলার মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল,—এমন আঘাত সে বুঝি জীবনে কখনও পিতার নিকট হইতে পায় নাই। মা তাহাকে যতখানি ভালবাসিতেন, পিতা তাহার চেয়েও তাহাকে বেশী ভালবাসেন। আজ সেই পিতার মুখে এ কি রকম কথা,—আজ পিতা তাহাকে এতখানি আঘাত দিলেন কি করিয়া?

হুঁকাটা দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া, সে একটু দূরে, একটু অন্ধকারে গিয়া বসিয়া পড়িল।

তাই তো, এত লোক মরে, সে মরে না কেন? সে বালিকা নয়, নিজের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারে,—তাহার জন্য পিতাকে যে কতখানি নিন্দনীয়, অশ্রদ্ধেয় ভাবে থাকিতে হইয়াছে, তাহাও তো সে জানে। হায় রে, সে যে দিন-রাত প্রার্থনা করিতেছে—ভগবান, তাহার পিতার মাথার বোঝা নামাইয়া দাও, তাহাকে লও,—কিন্তু কই, মৃত্যু তো আসে না।

তাহার দুইটী চোখ ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, কখন চোখ ছাপাইয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল; উৎপলা দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"উৎপলা—মা—"

হঠাৎ মাথায় পিতার স্নেহপূর্ণ করস্পর্শ পাইয়া উৎপলা চমকাইয়া মুখ তুলিল।

তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার মাথায় স্নেহমাখা হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধ কণ্ঠে জগদীশ বলিলেন,

"বড় কড়া কথাগুলো বলে ফেলেছি মা, মাথার ঠিক নেই, আমি বোধ হয় এবার পাগল হয়ে যাব।"

উৎপলা একটা কথাও বলিল না, পিতার কোলের উপর মাথা দিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

অন্ধকার আকাশে যেখানে একটী মাত্র নক্ষত্র জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল, সেইখানে দৃষ্টি রাখিয়া জগদীশ বলিলেন, "কখনও তোকে একটা কড়া কথা বলি নি, আজ কি করে কি অবস্থায় এ কথাগুলো বেরিয়েছে তা যদি জানতিস মা, তবে তুইও রাগ বা দুঃখ করে আমার কাছ হতে এতটা দূরে সরে আসতে পারতিস নে। ওরা আজ আমায় কাছারী হতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যে অপমান করেছে, তা—"

বলিতে বলিতে তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "গরীবকে চিরদিনই ধনীর অত্যাচার সইতে হয়। তাকে মুখটী বুজে থাকতেই হবে। কথা যদি বুক ফেটে গলায় আসে, সে কথাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হয় আবার সেই বুকের মধ্যে। জানি সব, বুঝি সব। কিন্তু মা, যখন হঠাৎ ধাক্কাটা এসে বুকে লাগে, তখন যেন পাগল হয়ে উঠি; আমার মাথার ঠিক থাকে না, কাকে কি বলতে কি বলে ফেলি তারও ঠিক থাকে না। হয় তো দুনিয়ার কেউ আমার ব্যথা বুঝবে না, আমার কথা জানতে চাইবে না। তা বলে তুইও বুঝবি নে, তুইও আমার কথা না জানতে চেয়ে উল্টে আমার ওপরেই রাগ করবি উৎপলা?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শেষের দিকটায় ভিজিয়া আসিয়াছিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

ধিক্কারে উৎপলার সারা অন্তরখানা ভরিয়া উঠিল। ছি ছি, সে কি মেয়ে,—পিতার অন্তরের কোন ব্যথা, কোন কথা না জানিয়াই তাঁহার উপর রাগ করিয়া বসিল? কতটুকু কষ্ট ভাবনা সহিতেছে সে! কিন্তু পিতার কারবার যে বাহির লইয়া, বাহির হইতে দিন দিন কত আঘাতের পর আঘাতই না পাইতে হইতেছে তাঁহাকে! তবু কি মানুষ তিনি, কোন দিন তাহার একটা কথা তো ব্যক্ত করেন নাই। বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও তিনি হাসিয়াছেন, সবই তুচ্ছ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ যে আঘাত পাইয়াছেন, হয় তো তাহার কাছে সে সব আঘাত অতি তুচ্ছ। তাই আজিকার সেই আঘাতের বেদনা এই সর্ব্বসহ মানুষটীকেও পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

উৎপলা উঠিয়া বসিল, পিতার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে বাবা, আজ তুমি এত অস্থির হয়ে পড়েছ কেন, তোমায় কে কি বলেছে?"

শুষ্ক মুখে মৃদু হাসির রেখা জোর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া জগদীশ বলিলেন, "যারা বলতে পারে, যারা ধনী—যারা চিরদিন দরিদ্রের বুক ডলে যায়, এই মর্ম্মান্তিক কথাও তারাই বলতে পারে উৎপলা। সতী মায়ের সতী মেয়ের নামে তারাই কলঙ্ক দিতে পারে। কিন্তু আমি এইটুকুই ভাবি উৎপলা—অর্থ মানুষকে এত ছোট করে, এমন করে তার মনুষ্যত্ব শুষে নেয়? আমি বাপ, কিন্তু ওরাও কি বাপ নয়, ওরাও কি জানে না সন্তান তার বাপ মায়ের কাছে কি জিনিস? ওরা অসঙ্কোচে তবু তো বলতে পারলে আমি তোকে দিয়ে কিশলয়ের—"

"থাম—থাম বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর, চুপ কর—"

উৎপলা পিতার কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পিতা যতখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কন্যাকে এ রকম ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া ততখানি শান্ত হইয়া গেলেন। খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে উৎপলার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কোমল শান্ত সুরে বলিলেন, "তুই অতটা অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলি কেন পাগলী, বলেছে আমায়, এতে তোর—"

উৎপলা সবেগে উঠিয়া বসিল। অশ্রুসিক্ত দুইটী চোখের দৃষ্টি পিতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "না, এতে আমার কিছু নয়। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, আমায় এখান থেকে আর কোথাও নিয়ে চল। আমায় তুমি বনে জন্তুদের কাছে রেখে এসো, আমি লোকালয়ে আর থাকব না।"

কন্যার মাথায় হাতখানা রাখিয়া কান্নাঝরা সুরে জগদীশ বলিলেন, "ওরে মা, বুনো জন্তুদের বশে আনা যায়, কিন্তু মানুষদের বশে আনা যায় না। বনেই বা যাবি কেন মা, তোর বিয়ে দিলে আমায় তো এত কথা শুনতে হবে

না। বিশ্বনাথবাবু, রতন রায়, সোজা পরামর্শ দিয়েছেন, কানা হোক, খোঁড়া হোক, বুড়ো হোক, রুগ্ন হোক, চাই কি শ্মশানযাত্রীর সঙ্গেই হোক, তোর বিয়ে আমায় দিতেই হবে। হয় বেঁচে থেকে একঘর স্থবিরপ্রায় পঙ্গু রুগ্ন সন্তানের মা হবি, মানুষ করবি, আর এক একটীকে বিসর্জ্জন দিয়ে আসবি, নয় বিধবা হয়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে তোর সংসারে থাকবি। তবু বুঝলি উৎপলা, তবু তোর বিয়ে আমায় দিতেই হবে।"

উৎপলা চক্ষু মুছিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, তাই করতে হবে বাবা, সমাজে বাস করতে গেলেই তার নীতি বাঁচিয়ে চলতে হবে। তোমার পায়ে পড়ি তাই করো বাবা, নইলে ওরা তোমায় আমায় কাউকেই বাঁচতে দেবে না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জগদীশ বলিলেন, "জানি নে, ভগবানের মনের ইচ্ছে কি,—হয় তো তাই হবে। এতদিন অপেক্ষা করেছি, আরও অপেক্ষা করা এ কথার পরে চলে না। ওঠ মা, তামাকটা দে, খেয়ে একবার হরদেব মুখুর্য্যের কাছে যাই, দেখি যদি কোন পাত্রের সন্ধান পাই।"

উৎপলা উঠিল। তামাক সাজাই ছিল, আগুন ধরাইয়া ফু দিয়া সে পিতার হাতে দিল।

তামাক টানিতে টানিতে জগদীশ বলিলেন, "এদিকে কাল সকালে জমিদার আসছেন, তিনি কয়দিন থাকবেন তা কে জানে। কাল হতে একদণ্ড ছুটি মিলবে না, আজই মুখুর্য্যেকে বলে ঠিক করে আসা ভাল। সামনের মাসে যে কোন পাত্রের হাতে তোকে দিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হই, সকলকে নিশ্চিন্ত করি।"

উৎপলা নিশ্চলভাবে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল,—আর একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

(৮)

জমিদার যোগেন্দ্রনাথ রায় বড় সরল প্রকৃতির লোক। বহুকাল পূর্ব্বে একবার আসিয়া তিনি দিন পনের গ্রামের কাছারীবাড়ীতে ছিলেন। তাহার পর অবশ্য আরও কয়েকবার যে আসিয়াছেন, একদিনের বেশী থাকেন নাই।

আজ প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা এই পরগণার জমিদার। পূর্ব্বে পিতা বর্ত্তমান থাকিতে তিনিই মাঝে মাঝে আসিতেন। প্রথমবার বর্ষার সময়ে এখানে দিন পনের থাকিয়া যোগেন্দ্রনাথ পূর্ণ দুই বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছিলেন। পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাকে আর এখানে বাস করিতে দিতেন না।

সম্প্রতি গ্রামের প্রান্তসীমায় নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় তিনি একটী বাংলো তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বৎসরখানেক পূর্ব্বে এই পথে যাইতে একদিনের জন্য আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন। এবারেও তিনি দুই একজন বন্ধু, ও ভৃত্য, ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে সেই বাংলোয় আসিয়া উঠিলেন।

আমলার দল প্রভুকে যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। গ্রামের ছোট বড় সকলেই জমিদারের সহিত দেখা করিয়া আসিল। বিশ্বনাথবাবু জমিদারের নিকট সকলের সম্মুখে প্রচুর সম্মান লাভ করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, এবং অদূরে করযোড়ে দণ্ডায়মান আমলাদের পার্শ্ববর্ত্তী জগদীশকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণার হাসি হাসিলেন।

এককালে যোগেন্দ্রনাথ ও বিশ্বনাথ একত্রেই পড়িয়াছিলেন,—পূর্ব্বের সে বন্ধুত্ব আজও একেবারে মুছিয়া যায় নাই। যোগেন্দ্রনাথের তরফের উকিল ছিলেন বিশ্বনাথ, সেজন্যও বন্ধুত্বটা আরও একটু পাকিয়া উঠিয়াছিল।

খানিকটা বিশ্রাম করিয়া যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকাল এ দেশে ম্যালেরিয়া নেই তো?"

বিশ্বনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "থাকলেই বা, আপনার বিশেষ অনিষ্ট করতে পারবে না যোগেনবাবু। দেখছি খাওয়ার জল পর্য্যন্ত যথেষ্ট এনেছেন। কেবল স্নানের জন্যেই এখানকার জলটা ব্যবহার করবেন তো।"

যোগেন্দ্রনাথ গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন, স্বর্ণনির্ম্মিত মুখনল সরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ আমার সতর্কতা নয় বিশ্বনাথবাবু, এ সব করুণার কাণ্ড। আপনি তো কতকটা তার পরিচয় পেয়েছেন। ওই এক মেয়ে, একেবারে পাগল। ওর দিনরাত ভয়—পাছে ওর বাপের কিছু হয়। আজও আমায় পাঁচ বছরের ছেলের মত বুকে ঢেকে রাখতে চায়।"

কন্যার কথা বলিতে বলিতে পিতার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিশ্বনাথ বলিলেন, "করবে নাই বা কেন বলুন দেখি? জগতে ওর আর আছেই বা কে? বিয়ে দিলেন, বছর

খানেক না যেতে বিধবা হয়ে এতটুকু মেয়েটী আবার আপনার কোলেই ফিরে এল। জগতে আপনি আর ওই ভাইটী, এই নিয়েই তো আছে। পুতুলখেলার সাধটা আপনাদের ওপর দিয়েই মিটিয়ে যায়।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যা বলেছেন। এই দেখুন না, যেমন বলেছি এখানে এবার দিন পনের থাকব, তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, বললে—আবার তো গিয়ে জ্বরে পড়বে? তার পর দেখুন না—জলের জায়গা আর নেই। বার বার বলে দিয়েছে যেন গরম জলে স্নান করা হয়, গায়ের জামা যেন না খুলি। আমার দীনু চাকরটাকে না হোক হাজার বার সতর্ক করে দেছে—সর্ব্বদা আমার কাছে থেকে তার হুকুম মত কাজ করবে। যাই হোক, এ সময় যে ম্যালেরিয়া নেই এ কথার উত্তর তো দিলেন না।"

বিশ্বনাথ বলিলেন, "এটা যে মাঘ মাস। বর্ষা না থাকলে এ সব দেশে ম্যালেরিয়া হয় না। কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

কতক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে বিশ্বনাথ পার্শ্ববর্ত্তী রতন রায়ের পানে তাকাইয়া গর্ব্বপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "খাতিরটা দেখলে রতন? হাজার হোক বনেদী বংশ তো বটে,—মানুষ চেনে। আর ওদের বাড়ীর উকিল তো বটে,—যদিও ওদের সমান নই।"

রতন রায় কথাটা তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া বলিলেন, "তা তো বটেই। কথাই আছে না—রতনে রতন চেনে। যাই হোক, যোগেনবাবু লোক ভাল। কেবল যে বনেদী বংশের দিকেই ওঁর দৃষ্টি, তা তো মনে হল না। পথে চলতে ছোট বড় সকলের সঙ্গে আলাপ করে নিজের বাংলোয় যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে গেছেন।"

বনিয়াদী বংশের প্রতি এতটুকু কটাক্ষপাতে একটু আহত হইয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, "ও একটা চাল মাত্র। দেখো, ওইটুকু কথা শুনেই ছোটলোকগুলো মনে ভাববে আমরা না জানি কি হয়েছি। অমনি মাথায় উঠতে চাইবে। যোগেনবাবু চাল দেখাতে গেলে হবে কি, কালই তাঁকে এ চাল বদলে ফেলতেই হবে,—মাঝখানে আবার পাঁচিল তুলতেই হবে,—নইলে কখনই থাকতে পারবেন না।"

রতন রায় চলিতে চলিতে বলিলেন, "সে কথা সত্য,—কুকুরকে স্পর্দ্ধা দিলে যেমন মাথায় ওঠে, এখানকার ছোটলোকগুলোও তেমনি। নইলে জগদীশ—ওই জমীদারের দশ টাকা মাইনের একটা গোমস্তা,—সে কি না তোমার একটীমাত্র ছেলেকে জামাই করবার ইচ্ছা রাখে?"

ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বিশ্বনাথ বলিলেন, "বোঝ তাহলে, ছোটলোকদের স্পর্দ্ধা দেওয়া কতখানি অন্যায় এবং অবৈধ। আমার কিশলয় এম-এ পাশ ছেলে,—আর কি রকম বনেদী বংশ আমাদের,—কত রাজা মহারাজা আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব,—এই ছেলেকে কি না সে জামাই ভাবে পেতে চায়। আমার দিদি কিশলয়ের জন্যে পাত্রী ঠিক করে রেখেছেন। রায়নগরের জমীদার,—রাজা উপাধি আছে। রীতিমত বনেদী বংশ। সেই আকবরের সময় হতে ওদের জমীদারী। তাঁরই মেয়ের সঙ্গে কিশলয়ের বিয়ে দিতে দিদির একান্ত ইচ্ছা। আমারও মত আছে, বিয়েটা হয়ে যাক। ভাবছি এই সামনের বৈশাখেই বিয়েটা দিয়ে ফেলে বাঁচব। নইলে ধর—যদি হঠাৎ মরেই যাই,—যে সব আজকালকার ছেলে,—না মানে বংশমর্য্যাদা, না মানে কিছু,—একটা কিছু করে ফেলতে ওদের কতক্ষণ দেরী লাগে।"

সম্মুখ দিয়া অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী উৎপলা কলসী কক্ষে ঘাটে চলিয়াছিল। হঠাৎ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বিশ্বনাথ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্কুচিতভাবে মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া উৎপলা ক্ষিপ্র পদে চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী কে?"

রতন রায় উত্তর দিলেন, "জগদীশের মেয়ে উৎপলা।"

এই উৎপলা? বিশ্বনাথ খানিক স্তব্ধ নেত্রে উৎপলার গমন-পথের পানে তাকাইয়া রহিলেন। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বন্ধুর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "এটা কি মাস হে?"

রতন রায় বলিলেন, "এই তো মাঘ মাস পড়ল।"

বিশ্বনাথ আর একটীও কথা না বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন।

পরদিনই লোকের মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া গেল—বিশ্বনাথ রতন রায় ও আর দুই তিনটী বন্ধু লইয়া কিশলয়ের জন্য পাত্রী দেখিতে রায়নগরে গিয়াছেন,—সেখানকার রাজকন্যার সহিত কিশলয়ের বিবাহ হইবে।

সে দিন দুপুরে উৎপলা যখন বাসন মাজিতে ঘাটে

গিয়াছিল, তখন ঘাটে কেবল মাত্র যাদুর দিদি ছাড়া আর কেহই ছিল না।

উৎপলাকে দেখিয়াই সে বলিল, "শুনেছিস বিশ্বনাথ রায়ের কাণ্ডখানা উৎপলা ?"

গত কল্য বিশ্বনাথের সহিত হঠাৎ পথে দেখা হইয়া যাওয়ায় উৎপলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাসনগুলা জলে ভিজাইয়া কড়াখানি ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "কি কাণ্ড করেছেন তিনি ?"

যাদুর দিদি উৎপলার সমবয়স্কা। বিবাহ অনেক কাল আগে আট বৎসরে হইয়াছে। এখন সে তিনটী সন্তানের জননী। প্রথম ছেলেটী ত্রয়োদশ বৎসরের হইয়া সূতিকাগারেই মারা যায়। দ্বিতীয়া কন্যা বৎসর ঘুরিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এই আড়াই বৎসর কাল রোগের সহিত দারুণ যুদ্ধ করিয়াও কোনও মতে বাঁচিয়া আছে। তৃতীয় সন্তানটী একটী পুত্র. সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত লইয়া আজ মাস পাঁচেক হইল ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং আজও বর্ত্তমান আছে।

সুরমা গামছাখানা নিংড়াইয়া মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল, "হঠাৎ তিনি রায়নগরের রাজকুমারীকে পুত্রবধূ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটেছেন। শুনলুম এই মাসেরই বারই বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলবেন,—ছেলে যেন পালিয়ে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলতে চান।"

উৎপলা বলিল, "ছেলে না পালিয়ে যাক, মেয়ে যদি পালায় ?"

সুরমা কথাটা বুঝিল না ; তাই উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

উৎপলা একটু হাসিয়া বলিল, "যদি ওদিকে আর কারও সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, তা হলে রাজকন্যার আশা হারাতে হবে যে।"

সুরমা চুল মুছিয়া কাপড় কাচিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "আচ্ছা, এতে তোর একটু কষ্ট হচ্ছে না উৎপলা ?"

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুইটী চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া উৎপলা বলিল, "কেন, কষ্ট আবার কিসের ?"

সুরমা একটু কাশিয়া বলিল, "কিশলয়দার বিয়ে হচ্ছে শুনে ?"

উৎপলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে কড়া ঘষিতে বিরত হইয়া ক্রুদ্ধ দুইটী চোখের দৃষ্টি সুরমার উপর ফেলিল।

কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না, ঘাটের ঠিক উপরকার পথ দিয়া একখানা পাল্কী যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গেল, দুই পার্শ্বের বরকন্দাজেরাও থামিয়া গেল। পাল্কীর মধ্য হইতে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক মুখ বাড়াইলেন। তাঁহার বিস্মিত চোখের দৃষ্টি উৎপলার উপর ন্যস্ত ছিল।

"ও মা, ছি ছি, জমীদার মশাই যে—"

সুরমা জিভ কাটিয়া মুখে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। দারুণ বিরাগভরে উৎপলা ফিরিয়াও চাহিল না. বিকৃত মুখে আবার কড়া মাজিতে লাগিল।

জমীদারের পাল্কী আবার ছুটিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে বরকন্দাজেরাও ছুটিল।

(৯)

অনুপম রূপবতী এমন একটী মেয়েকে এমনভাবে দেখার আশা যোগেন্দ্রনাথ কখনও করেন নাই। যতক্ষণ দেখা গিয়াছিল, তিনি মুখ বাড়াইয়া কেবল উৎপলাকেই দেখিয়াছিলেন।

মেয়েটির পরিচয় পাইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি জানিতে পারিলেন এই সুন্দরী তরুণীটি তাঁহার দশ টাকা বেতনের গোমস্তা জগদীশের কন্যা, এবং অর্থাভাবে জগদীশ আজও তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। অবশেষে ইহাও শুনিলেন, বিশ্বনাথ, রতন রায় প্রভৃতি সমাজের নেতাগণের হুমকিতে ভয় পাইয়া জগদীশ অবশেষে পার্শ্ববর্ত্তী সোণারপুর গ্রামের জলধর দত্তের সহিত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছেন।

জলধর দত্তের বয়স অনেক, গৃহে অপর পত্নী, পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী অনেকগুলি বর্ত্তমান, নেহাৎ ভদ্রলোকের কন্যাদায় উদ্ধার করিবার জন্য দশগণ্ডা টাকা লইয়া বিবাহ করিবেন।

প্রৌঢ় যোগেন্দ্রনাথ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। সে দিনে তাঁহার চিন্তাপূর্ণ মুখের ভাব দেখিয়া কেহই সাহস করিয়া তাঁহার দিকে ঘেঁসিল না।

সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য ঠিক

করিয়া ফেলিলেন। প্রভাতে তিনি তাঁহার জনৈক ভৃত্যকে কাছারীতে পাঠাইয়া দিলেন,—জগদীশ বসুকে তাঁহার বিশেষ দরকার।

ভৃত্য যখন কাছারীতে গিয়া খবর দিল, তখন জগদীশ লিখিতেছিলেন। জমীদার মহাশয় এখনই ডাকিতেছেন শুনিয়া ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, হাত হইতে কলম খসিয়া পড়িল।

নায়েব নিমচাঁদ ধমক দিয়া বলিলেন, "উঠুন না মশায়, কাঠ হয়ে গেলেন যে। হয় তো হিসেবে কি ভুল করেছেন, সেটা মনিবের চোখে ধরা পড়ে গেছে। এ তো আর আমাদের পান নি মশাই, যে যা তা বলে বুঝিয়ে দিলেন—কাজ ফুরিয়ে গেল। মনিব অত সহজে ভুলবার ছেলে নন্—নিজের কাজ তিনি ঠিক বুঝে নেবেন। যান, যান,—দেরী করবেন না।"

জগদীশের সর্ব্বাঙ্গ ঘামে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চাদরে ললাটের ঘাম মুছিতে মুছিতে কম্পিত পদে তিনি বাহির হইলেন।

গননশীল জগদীশের পানে তাকাইয়া নায়েব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি,—এবার ফাঁদখানা একবার দেখে এসো গিয়ে।"

যোগেন্দ্রনাথ, নদীর উপরে যে বারাণ্ডাটী কেবল মাত্র প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, সেখানে একখানি চেয়ারে বসিয়া সেদিনকার সংবাদপত্রখানা পড়িতেছিলেন। নদীর বুকে জেলেদের ডিঙ্গিগুলি ভাসিতেছিল। তাহাদের মাছ ধরার খটাখট্ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া চাহিতেছিলেন। মাঘের ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া আসিতেছিল, বারাণ্ডাটী পূর্ব্বমুখে হওয়ায় প্রচুর রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল।

ও-পারে বাঁশবন। ছোট বড় গাছগুলির মাঝখান দিয়া সরু পথটী আঁকিয়া বাঁকিয়া দূর গ্রামের মধ্যে গিয়াছে। প্রভাতের রৌদ্র প্রথম আসিয়া ধরার মুখে চুম্বন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুপাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা সরু পথটার উপর দিয়া গ্রামবাসিনীরা নদীর ঘাটে যাতায়াত করে,—সবুজ মাঠে গরু আনিয়া বাঁধিয়া দিয়া যায় ; মাঝে মাঝে আসিয়া গরুকে সরাইয়া বাঁধিয়া দিয়া যায়। নীরব নিস্তব্ধ নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলা চলিয়া যায়, বাতাস হু হু করিয়া আসিয়া জলের উপর দিয়া বহিয়া যায়, ও-পার হইতে মেঠো সুরে কৃষকের গান ভাসিয়া আসে।

ভৃত্য আসিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া সবিনয়ে জানাইল —গোমস্তাবাবু আসিয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখানে নিয়ে এসো।"

ভৃত্য কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া চলিয়া গেল, কেন না এদিককার বারাণ্ডায় জমীদারি সেরেস্তার কোন কর্ম্মচারীই কোন দিন আসিতে পায় না। বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু কথাবার্ত্তা তাহা বাহিরের একটা ঘরেই হইয়া থাকে।

কম্পিত পদে জগদীশ বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সবিনয়ে অভিবাদন করিলেন।

টেবলের অপর পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানা দেখাইয়া দিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

চেয়ারে বসিতে জগদীশ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, তিনি পার্শ্ববর্ত্তী টুলখানা অথবা অদূরে অবস্থিত বেঞ্চখানাই বেশ পছন্দ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া যোগেন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "না—না, টুলে বেঞ্চে বসতে হবে না, আপনি চেয়ারেই বসুন না কেন।"

অগত্যা জগদীশ সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারে বসিলেন। যোগেন্দ্রনাথের মুখের পানে তাকাইয়া তিনি একটু সাহস পাইয়াছিলেন, সেইজন্যই চোখ ফিরাইয়া একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইলেন।

যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাজের জন্যে বেতন কত করে পান ?"

অস্ফুটকণ্ঠে জগদীশ বলিলেন, "দশ টাকা।"

যোগেন্দ্রনাথ বিস্ময়ে বলিলেন, "দশ টাকায় আপনার সংসার চলে ?"

শুষ্ক হাসিয়া জগদীশ বলিলেন, "সংসার মানে আমি আর একটী মাত্র মেয়ে,—কোন ক্রমে টেনেটুনে এতেই চালাতে হয়। নইলে চলে কই ?"

যোগেন্দ্রনাথ খানিক নির্নিমেষ নেত্রে এই লোকটীর পানে তাকাইয়া রহিলেন।

বয়স তো এমন কিছু বেশী নহে, চল্লিশ হইবে ; কিন্তু দেখায় যেন ষাট বৎসর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কুড়িটা বৎসর আগাইয়া দিয়াছে দারিদ্র্য। এই

বয়সেই জগদীশের মাথার সব চুলগুলি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। দেহ কেবল অস্থিমাত্র সার,—সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একমাত্র দারিদ্র্যই মানুষের যৌবনে জরা আনয়ন করিতে পারে,—আর কিছুই বুঝি পারে না। ললাটের উপর ওই যে শিরা কয়েকটী জাগিয়া উঠিয়াছে, উহা দারিদ্র্যের চিহ্ন। যদি দুইবেলা স্বচ্ছন্দে দুইটী অন্নের সংস্থান করিতে পারিত, তবে ইহার ওই দেহ কুব্জ হইয়া পড়িত না,—এই বয়সেই বার্দ্ধক্য জরা আসিয়া সমস্ত দেহখানাকে অধিকার করিয়া বসিত না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শুনলুম, আজও আপনার মেয়েটীর বিয়ে হয় নি,—সে জন্যে আপনাকে বড় কম নির্য্যাতন সইতে হচ্ছে না,— যার জন্যে একটী সত্তর বছরের বুড়ো—যার স্ত্রী, নাতি, নাতনী বিদ্যমান, তার হাতেই মেয়ে সমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু লোকের কথা শুনে নিজের মেয়ের এই সর্ব্বনাশ করতে যাওয়া কি সঙ্গত ?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জগদীশ বলিলেন, "সঙ্গত কি না তা জানি নে, তবে আমাকে যে এখন ওর বিয়ে দিতেই হবে এ জানিত সত্য কথা। যেমন করেই হোক—যার সঙ্গেই হোক—ওর বিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আর এক উপায় আছে, সে উপায় ওর মৃত্যু ; ও মরলে পরে যদিও আমার বুকটা ফেটে যাবে, তবু মনে হয় আমি শান্তি পাব। সকলকে যেমন একে একে বিসর্জ্জন দিয়েও বেঁচে আছি, তেমনি একে হারিয়েও বেঁচে থাকতে পারব।"

মর্ম্মের অতি নিভৃত স্থলে এমন একটী তার আছে, যাহাতে আঘাত দিলে আর সব তারগুলি ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া উঠে। যোগেন্দ্রনাথ জগদীশের সেই তারে আঘাত দেওয়ায়, যতগুলি তার ছিল, সবগুলিই একত্রে বাজিয়া উঠিয়াছিল।

ব্যথিত কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বুঝেছি,—বড় কষ্টেই পিতা হয়ে কন্যার এই ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমি তাকে রক্ষা করতে চাই জগদীশ বাবু ; যে ফুলটী ফুটে উঠে অকালে ঝরে পড়ছে, আমি তাকে দিয়ে আমার ঘর সাজাতে চাই। বলুন, আমায় দেবেন কি ?"

এ কি স্বপ্ন না সত্য, প্রবল পরাক্রান্ত অভিজাত-বংশোদ্ভব জমীদার মহাশয় তাঁহারই কাছারীর দশ টাকা বেতনের গোমস্তার কন্যাকে প্রার্থনা করিতেছেন ? জগদীশের মনে হইল, বাল্যকালে তিনি যে আলাদীনের কাহিনী পড়িয়াছিলেন, আজ সে কাহিনী তাঁহার জীবনেই বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। তিনি নির্ব্বাকে শুধু যোগেন্দ্রনাথের পানে তাকাইয়া রহিলেন,—একটা শব্দ তাঁহার মুখে ফুটিল না।

যোগেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এতে আপনার অমত করবার কোন কারণ নেই জগদীশ বাবু। আমার ছেলে মেয়ে আছে ; কিন্তু তারা এমন অনুদার নয় যে, আমি যাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করে ঘরে নিয়ে যাব, তার প্রতি অশিষ্ট আচরণ করবে। আপনি তাদের দেখেন নি, দেখলে বুঝতেন আমার ছেলেমেয়ে কি। আপনি তাদের জন্যে কিছু ভয় করবেন না। তবে যদি অন্য কারণে আপনার অসম্মতি থাকে, সে আলাদা কথা।"

জগদীশ উৎসাহে আনন্দে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সবেগে দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "অসম্মতি, —আপত্তি ? উৎপলার অদৃষ্ট খুব ভাল, নইলে আপনি—আপনি—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

যোগেন্দ্রনাথ হাসিমুখে বলিলেন, "থাক, আপনার মত আছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তবে আমি এই তিন দিন বাদে নয়ই মাঘ দিন ঠিক করে ফেলি, কি বলুন ! করুণা —আমার মেয়ে এখানে আমায় আর রাখতে চায় না, তার জোর হুকুম এসেছে—যেমন করেই হোক আর দিন সাতেকের মধ্যে এখানকার কাজ সেরে যদি না দিয়ে যাই, সে তার খুড়শ্বশুরের বাড়ী এলাহাবাদে চলে যাবে। বুঝতেই পারছেন, আমার আর থাকবার যো নেই,—যত শিগ্‌গীর হয় এদিককার কাজগুলো শেষ করে যেতে হবেই। তবে আপনি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ের ঠিকঠাক করুন গিয়ে, আর মাঝে তিনটে দিন বই তো নয়।"

জগদীশ কি বলিবেন, কিরূপে নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। তাঁহার উৎপলা এমন কি শুভাদৃষ্ট করিয়াছে যাহাতে সে রাজার গৃহে রাণী হইয়া যাইবে ? চিরদুঃখিনী উৎপলা—

তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। ইচ্ছা হইতেছিল যোগেন্দ্রনাথের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া একবার তিনি আকাশের পানে তাকাইয়া হাত দুখানা ললাটে রাখিলেন। (ক্রমশঃ)

সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (৫)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর পরলোকগমন

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

"নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।—সুখসাগরের* সমীপবর্ত্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরের ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্লভ বিশেষতঃ তাঁহার সদ্বক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্তমান করিতেন এবং আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইঁহার মৃত্যুতে আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন।"

* "Sooksaugur (Suksagar), be it said, is, or was...on the banks of the Hughli, a little above, and on the opposite side to Bandel."—*Bengal : Past & Present*, IX. 67.

শতবর্ষ পূর্ব্বে আসামে বাংলা ভাষার চর্চ্চা

(৩০ জুলাই ১৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮)

"আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।—আসামদেশে সরকারী কর্ম্মকারক শ্রীযুত যজ্ঞরাম ফুক্কনকৃত ইঙ্গরেজী পদ্যের বাঙ্গলা পদ্যেতে অনুবাদ আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম। ঐ অনুবাদেতে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা। এবং ঐ মহাশয় অন্য এক বৃহৎ ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া দেশোপকারার্থ সংপ্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে কল্প করিয়াছেন। আসামদেশীয় শ্রীযুত হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুক্কনের এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ পাঠক মহাশয়েরা ইহার পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন অনুমান আঠার মাস হইল তিনি আসাম বুরঞ্জিনামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন।

আসামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারের ব্যাপ্য অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা যে এই অল্পকালের মধ্যে এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাঁহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা বিন্দুতে যদ্যপি তাঁহারা উদ্যোগসিন্ধুতে মগ্ন হন তবে আমারদের আরো পরম সন্তোষ জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশপ্রচলিত তাবদ্ব্যাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। ঐ আসামদেশস্থেরা যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রগ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র সম্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট হয় নাই কিন্তু আমারদের কিম্বা অন্য২ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রসম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক

লিখি যে আসামদেশের সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত সাহেবেরা এবং তাঁহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে তাহাতে কেবল বাঙ্গালা ভাষার অধ্যয়ন হইবে। বঙ্গভাষা ও আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ অতএব এই নিয়মে যে সুফল দর্শিবে এমত সম্ভাবনা যেহেতুক বঙ্গদেশীয়েরদের উপকারার্থ যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তদুপকার সম্ভোগী হইবেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর 'প্রভাকরে'র আক্রমণ

(১৯ নভেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

প্রভাকর সম্পাদককর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।—···· শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে যে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণা ফ্রিঙ্গি হিন্দুইউথনামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এপর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক ভাল২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বাচ্ছা পত্র বন্দ বা পার অভিমতে সৃজন হয় নাই এ হায়াহীন ড্রজো ভায়ার কর্ম্ম কেননা ড্রজো ভায়া ইষ্টিণ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা অহিরাবণ কিন্তু হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে ভায়া সামাল২ তোমার জাঁকজমকরূপ কুর্‌তি টুপি কেড়েনিয়ে ফুর্‌তি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।···"

ঢাকা জালালপুর

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

ঢাকা জালালপুর জিলা ঢাকা জিলার শামিল হইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের দান

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

"কিয়ৎকাল হইল কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দীন-দুঃখি লোকেরদের দুঃখ নিবারণার্থ দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে ইণ্ডিয়া গেজেটসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পিত্রাদিশ্রাদ্ধে বহু সংখ্যক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা না করিয়া দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা ঐ মুদ্রাসকল প্রকৃত দীন দরিদ্রেরদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় করেন এমত আমরা আশয় করি। এইক্ষণে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সৎপরামর্শের অনুগামী হইয়াছেন। এবং সংপ্রতি তাঁহার জনকের ৺পদ প্রাপ্তিহওয়াতে শ্রাদ্ধের তামসায় ব্যয় না করিয়া ২০০০ টাকা ঐ সোসৈটিতে উক্ত কার্য্যার্থ প্রদান করিয়াছেন।"

কলিকাতায় নূতন বাজার

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত]

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

"গত শুক্রবারে শ্রীযুত জিন্‌কিন্স লো এণ্ড কোম্পানির সাধারণ নীলামঘরে গত জোজেফ বেরাটু সাহেবের সম্পত্তি (যাহা তেরেটিবাজারের দক্ষিণে ছিল) ঐ মৃত সাহেবের ত্রষ্টিরদের অনুমতিক্রমে বিক্রয়হওয়াতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০০০ একান্নহাজার টাকাতে ক্রয় করিয়াছেন ঐ বিষয়ের মূল্য পূর্ব্বে দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার প্রধান২ সৌদাগর দেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অল্প দামে ক্রয় হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ স্থানে নূতন অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিয়া অতিমনোরম্য এক বাজার করিবেন এ স্থান এরূপ হইবেক যে প্রধান২ সাহেব লোক আপন স্বেচ্ছামতে ইঙ্গলণ্ডের ন্যায় বাজার করিতে আসিতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় হইবেক কিন্তু পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাজারদ্বারা বিশেষ লাভ করিতে পারিবেন ইতি।"

ব্যবসায়ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর

(৪ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৯ আশ্বিন ১২৪১)

"কার ঠাকুর কোং।—কার ঠাকুর কোম্পানির নূতন

বাণিজ্য কুঠীর ব্যাপার অদ্য আরম্ভ হইল। ঐ কুঠীর দ্বিতীয় অংশী বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্ব্বে সাল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকার্য্য ও এজেন্টী কার্য্যে প্রবর্ত্তহওনার্থ ন্যূনাধিক ছয় সপ্তাহ হইল ঐ দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় মনোযোগকরণের যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়েরদের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্টী ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বোম্বাইনগরে পারসীয়েরা এতদ্রূপ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য অনেককালাবধি করিতেছেন। সাল্ট বোর্ডের দেওয়ানী কার্য্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের এজেন্টের দেওয়ানী কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন।"

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ১৮ ফাল্গুন ১২৪১)

"চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধর্ম্মিষ্ঠ মাত্র জানিবেন। যদিও কএক মাস অন্যান্য কএকটা সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহারা সতীদ্বেষী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তৎপ্রমাণ কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন রায়ের বন্দুত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল তাঁহারা কএক জন সতীদ্বেষী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় কাগজ ঐক্য করাতে শ্রীশ্রীযুত জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ। যদি হিন্দুদিগের আর কাগজ থাকিত অথবা ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন তবে শ্রীশ্রীযুত কি বিলাতবাসি মহাশয়রা জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাগজপ্রকাশকেরা যদি পক্ষপাতরহিত এমত অভিমান করেন তাহা করিতে পারেন না কেন না শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসমেন কাগজের প্রোপ্রাইটর হইয়াছেন এবং হিরাল্‌ডনামক কাগজ সর্জনকর্ত্তা তিনি এইক্ষণে তাহা বাঙ্গাল হরকরার মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইণ্ডিয়া-গেজেটনামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন আমরা এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা কি ঐ কাগজ নির্ব্বাহকেরা অপক্ষপাতী হইয়া প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন না। অপর দর্পণকার মহাশয় যে ঠাকুর পক্ষে আছেন তাঁহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমক ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণে ঐ নমক ব্যাপারিরা যে রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সমাচারের কাগজের কথা কিছু কহিবেন না যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকা-ব্যতীত এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই।—চন্দ্রিকা।"

কলিকাতায় শ্যামাপূজার রাত্রে উৎপাত

(২৩ নভেম্বর ১৮৩৩। ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

শ্রীযুত ডেবিড মেকফার্লেন সাহেব কলিকাতা পোলীসের চীফ মাজিস্ত্রেট।

নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাস্ত।

আমরা সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহা শীঘ্র নিবারণকরণের যোগ্য তাহা আপনকার কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বৎসর শ্যামা পূজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফ্রিঙ্গি এবং কাফ্রি ও খালাসিরা প্রজ্বলিত পাঁকাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়ায় এবং ঐ অগ্নিময় পাঁকাঠির দ্বারা মনুষ্যকে মারে ও শরীর এবং বস্ত্রাদি দগ্ধ করে বিশেষতঃ গত শ্যামাপূজার রাত্রিতে ঐ ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক অতএব আমরা অতি-নম্রভাবে নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্ব্বক এবিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে একর্ম্ম আর না হইতে পারে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি। ১৮৩৩। ১২ নবেম্বর।

আমরা সর্ব্বদা আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।

শ্রীদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুম।—

এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্তু এবৎসর হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাস্তকারিরা আগত বৎসর পুনর্ব্বার দরখাস্ত করিলে পোলীশ এবং অন্যান্য লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যদ্যপি বাধা না থাকে তবে ঐ সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিত করা যাইবেক ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।"

১৮৩৪ সালের বর্ষফল

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

"৫ জানুআরি। মার্কিউস কোং দেউলিয়া হন।

২৭ জুলাই। বঙ্গদেশীয় মহাশয়েরা প্রথমতঃ গ্রান্দজুরীতে উপবেশন করেন।

৭ অক্টোবর। দেওয়ানীবিষয়ক অপরাধে গবর্ণমেণ্ট শারীরিক দণ্ডদেওন রহিতের হুকুম করেন।”

ছাতুবাবুর বাড়িতে বুলবুলি পাখীর লড়াই

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২৭ মাঘ ১২৪০)

“বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ।—বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান্ এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ২ ঐ সুখ বিলক্ষণা-স্বাদনকারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষি পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে ঐ যুদ্ধ হয় তাহাতে মহাসমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাথ মল্লিকের এক দল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়েরা ঐ যুদ্ধ-দর্শনে আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাঁহারা সোয়াকীন-রূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্বিষয়ঘটিত সুখে মহাসুখি হন সুতরাং এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাহারা ঐ যুদ্ধসেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল দর্শকেরা মল্লিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদিগকে বার২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্ব্বশেষে অর্থাৎ দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।—চন্দ্রিকা।”

হিন্দুকলেজে মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১২ মার্চ ১৮৩৪। ৩০ ফাল্গুন ১২৪০)

পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ্চ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।...কলিকাতাস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরা প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন না।...

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই।

* * * *

লার্ড রাণ্ডল্‌ফ ও নর্বল ও গ্লিনালবন।

নর্বল ... ... দ্বারকানাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর।

ষষ্ঠ হেনরি। ... ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।

গ্লষ্টর। ... মধুসূদন দত্ত।”*

‘সমাচার চন্দ্রিকা’-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয়

(১৫ই মার্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

...চন্দ্রিকাকারের পূর্ব্ববসতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্পকাল হইল চন্দ্রিকাকারের পিতা ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রামনিবাসি জমিদারদিগের বলাৎকারে উত্ত্যক্ত হইয়া ৺বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করেন। তদবধি চন্দ্রিকাকার কলিকাতা নিবাসী।...”

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২৭ মাঘ ১২৪০)

“...শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট কর সাহেবের সুপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়া [কাষ্টম হাউসে] চাকর হন।... —চন্দ্রিকা।”

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪। ৬ মাঘ ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেণ্টীর সিরিশ্‌তাদার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ দত্তের আনুকূল্যে সভ্রাতৃক [কৃষ্ণজীবন]

* ইনিই স্বনামধন্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন বলিয়া তাঁহার চরিতকারেরা লিখিয়াছেন কিন্তু উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে অন্যরূপ জানা যাইতেছে। পুরাতন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে এখনও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যায়। ১২৬৩, ২রা বৈশাখ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ দেখিতেছি,—

“১২৬৩, শ্রাবণ।—মাইকেল মধুসূদন দত্ত মান্দ্রাজ নগরে কর্ম্মি মাজিষ্ট্রেটের ক্লার্কের পদাভিষিক্ত হয়েন।”

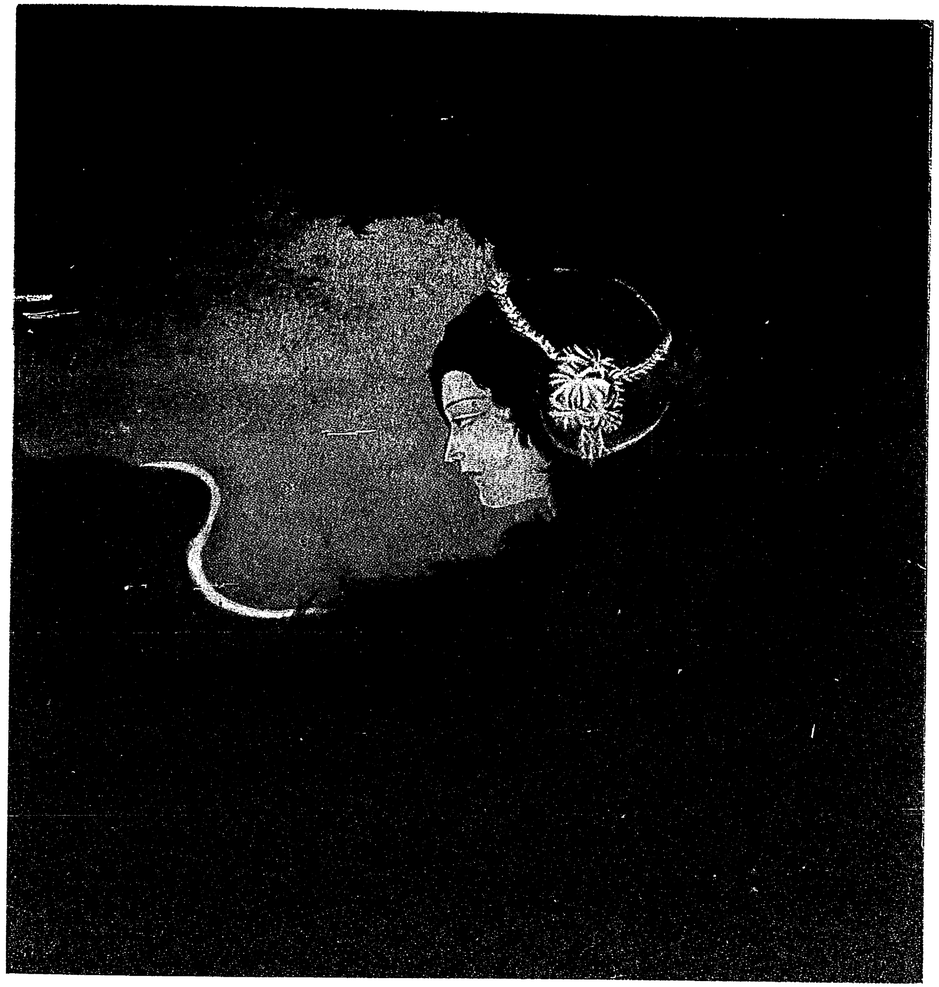

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবার—” রবীন্দ্রনাথ।

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

চন্দ্রিকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমৎকৃত হওয়া গেল।

কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্ম্মহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত লার্কিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সর-চার্লস্ ডাইলি সাহেব ঐ অতি প্রধান কর্ম্মে শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি তৎকর্ম্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত যে দারোগা মুহুরিপ্রভৃতির বিংশতি কর্ম্ম শূন্য ছিল তাহাতে তাঁহার খাতির্জমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে সাহেব তাঁহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন তাঁহারদের কর্ম্মের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্রেরদিগকে কর্ম্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন। এবং ঐ পরম-হিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযুত সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন।···কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায়।"

ধর্ম্মসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৪ চৈত্র ১২৪০)

"শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।·····

ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের স্থানে আমরা প্রণিপাতপূর্ব্বক কতিপয় প্রশ্ন করিয়া উত্তরাকাঙ্ক্ষি আছি।

প্রথম প্রশ্ন। সকলের বিদিত আছে যে শাক্ত বৈষ্ণবের-দিগের ধর্ম্ম বিষয়মতের সর্ব্বদা বিভিন্নতা বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরীত মতামত ও বিরুদ্ধাচরণ তবে ঐ উভয়পক্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য না হইয়া সতীরীতি শাস্ত্রের বিপক্ষ মতাবলম্বি ব্যক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শাস্ত্রার্থবোধে বাদানুবাদ সপক্ষ বিপক্ষহওয়া অভিনব নহে। যদি বলেন সতীদ্বেষিরা অভক্ষ ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন এরূপ জনরব আছে। তাহা হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথা অধরামৃত ভক্ষকেরা ত্যাজ্য না হওনের হেতুবাদ কি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এতন্নগরস্থ কোন ধনির অর্থাপহরণ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসন্তান ধর্ম্মসভার উপযুক্ত হইতে পারেন কি না।

তৃতীয় প্রশ্ন। কিয়ৎকাল হইল কোন প্রধান বংশোদ্ভব পরম মান্যব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ত্বকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্ব্বক জবন ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া আনারো নাম্নি জবনি রমণীকে মহম্মদীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনেরা তাহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তে এজ্জতআলী খাঁ নামকরণ করে তিনি ঐ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতিক্রমে রোজ নমাজে তৎপর হইয়া বহুদিবস ঘরবসত করেন পরে উক্ত খাঁ সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন চাকর নবীন ধনী হইয়া তাহার সহিত ভক্ষ্যভোজ্য করিয়া পুনরায় খাঁ সাহেবকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি ঐ এজ্জতআলী খাঁর উক্ত প্রাচীন চাকরের সন্তানেরা যাঁহারা খাঁ সাহেবের সমন্নয়কালীন ছিলেন হিন্দু মহাশয়দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং উপস্থিত দলাদলির অগ্রগণ্য হওনের উপযুক্ত কি না।*

চতুর্থ প্রশ্ন। এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নান্নিজান ও সুপনজান ও নিক্কি প্রভৃতি জবনী নর্ত্তকীদিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মির্জা জান তপসের সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একান্নভুক্ত থাকিয়া নগরকীর্ত্তনোপলক্ষে পুনরায় হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে ঐ ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারেরা এই দলাদলির উদ্যোগে বিশেষ অনুরাগ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না। *

যদি উপরিউক্ত মহাশয়েরা হিন্দুসমাজে মান্য ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্ম্মসভার বিধি ব্যবস্থা মন্বাদি শাস্ত্রের বিপরীত অন্য কোন শাস্ত্রানুসারে থাকে তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপ্রভৃতি কিনিমিত্ত ধর্ম্মসভার অগ্রাহ্য হয়। আমরা জ্ঞাত আছি যে অনেক২ নির্দ্দোষি নিষ্কলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরা ধর্ম্মসভার দলভুক্ত আছেন তাঁহারা কি উক্ত বিষয়ে পক্ষপাতবিহীন হইবেন না ইতি।

নিবেদনপত্রী কস্যচিৎ শ্যামবাজার নিবাসৈকস্য বিপ্রস্য।"

কলিকাতার স্কুল-কলেজের ছাত্র-সংখ্যা

(১২ জুলাই ১৮৩৪। ২৯ আষাঢ় ১২৪১)

"কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাত্রনিমিত্ত বিদ্যালয়।—

* শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত "রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়" পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইনকোএরর পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল কলিকাতায় এতদ্দেশীয় বালকেরদের ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশালা এবং তাহাতে কত করিয়া ছাত্র থাকে তাহার সংখ্যা এই।

১	হিন্দুকালেজের ছাত্রের সংখ্যা ...	৩৩৮
২	কলিকাতা স্কুল সোসৈটির নানা পাঠশালাতে	৩০০
৩	পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে ...	৩৫০
৪	চর্চ মিসনরি পাঠশালাতে ...	২০০
৫	অরিয়েণ্টল সেমিনরিতে ...	২০০
৬	ইউনিয়ন স্কুলে ...	১২০
৭	জুবিনিল স্কুলে ...	৭০
৮	হিন্দু ফ্রি স্কুলে ...	১৬০
৯	হিন্দু বিনিবোলেণ্ট স্কুলে ...	৯০
১০	নূতন হিন্দু স্কুলে ...	৪০

কার্লিগুহা

(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪। ১০ কার্ত্তিক ১২৪১)

কার্লিস্থানের গহ্বর।—বোম্বাই দর্পণে লেখে যে কার্লিস্থানের পর্ব্বতীয় গহ্বরেতে যে অক্ষর খোদিত আছে তাহার অর্থ এইক্ষণে শ্রীযুত ষ্টিবন্সন সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন ঐ স্থান পুণ্যনগরাভিমুখ গমনীয় পথিমধ্যে এবং তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরদের এই উপদেশ ছিল যে পঞ্চ পাণ্ডবেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই গল্প নিতান্তই আধুনিক বোধ হইতেছে যেহেতুক ষ্টিবন্সন সাহেব ঐ অক্ষর পাঠ করিয়া এই নিশ্চিত অর্থ করিয়াছেন যে ঐ গহ্বর শালিবাহন রাজার বংশ্য এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে ইহার ১৬৫৮ বৎসরপূর্ব্বে অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ১৭৬ সালে প্রস্তুত হয়।"

কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ৪ ফাল্গুন ১২৪১)

"সংস্কৃত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎসা সম্পর্কীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া এতদ্দেশীয় যুব ব্যক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টাঙ্কের অপর এই এক উদ্যোগ। ঐ কালেজের তাবৎ বিধান আমরা পশ্চাদ্ভাগে প্রকাশ করিলাম তৎপাঠে পাঠকগণের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিতে পারে।

ফোর্ট উলিয়ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫।

* * * *

১। আগামি ১ তারিখঅবধি সংস্কৃত কালেজের চিকিৎসা সম্প্রদায় ও মদরসার চিকিৎসা সম্প্রদায় ও নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন রহিত হইবে।..."

কুলীন-কন্যার মর্ম্মকথা

(১৪ মার্চ ১৮৩৫। ২ চৈত্র ১২৪১)

"শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন-ব্রাহ্মণের কন্যা। পতিঅভাবে আমারদিগের যে বেদনা-বেদন ভূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আসক্তা। কারণ দর্পণৈক দেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণে ভূপতির শ্রবণ গোচরহওনের অসম্ভাবনাভাব।

শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম যেন না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা মান্যমতে ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্ম্মে কর্ম্মে পৈতৃক আশ্রমে ধর্ম্মবৎ ধর্ম্মের ভারাক্রান্ত আছেন তজ্জন্য সমঘয়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্তে সমঘয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শাস্ত্রমতে এমত আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে যাহারা সুরাসুর ও প্রধানং পুরাতন রাজা তাঁহারদিগের পত্নী পতি অভাবে পুনঃ স্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামিসত্ত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও

তাঁহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্চর্য্য। সুরাসুর রাজাদিগের ঐ সকল কর্ম্মে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষেরদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র সৃজন হইয়াছিল।

আমরা আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের বেশভূষা ও আকাঙ্ক্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বর্জ্জিতা হইয়া অহরহঃ অসহ্য বিরহবেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতাকরণের কর্ত্তা পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ইঙ্গরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্ব্বক ও প্রধান২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্বিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরদিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা হইলে আমারদিগের ধর্ম্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়। কেননা স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপস্ত্রী বর্জ্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন।

কাচিৎ শান্তিপুরনিবাসিনী।"

(২১ মার্চ ১৮৩৫। ৯ চৈত্র ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

শান্তিপুর নিবাসি স্ত্রীগণ আপনারদের দুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমরা পরমসন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহারা এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমারদেরও বহুকাল যত্ন ছিল। কিন্তু সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই এইক্ষণে সেই ভয় দূর হইল অতএব আপনারদের সঙ্গে দুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু দেখা যাউক তাহাতে কি ফল হয়।

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলতঃ প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্ব্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ কি ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ।৪।৫।১০।১২ বর্ষ বয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘৃণা জন্মাইব না যে ব্যাপারেতে আমারদের সুখ দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্ম্মেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ভ্রম ও আমারদের সুখের হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা এই যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্তৃত্ব করেন আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমারদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই। তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি আমারদিগকে স্ত্রীধন বলিয়া

দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সেই সকল টাকা লইয়া আপনারা নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাসনকর্ত্তা এই ঘৃণ্যব্যাপার সহিষ্ণুতা করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কতকাল সহিবেন তাহা কহা যায় না তিনি আপনারদের অপরাধ মার্জন করুন।

৫। যাঁহারদের অনেক ভার্য্যা আছে তাঁহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহার অনেক ভার্য্যা তিনি প্রত্যেক ভার্য্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্ত্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।

৬। ভার্য্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমারদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।...১৫ মার্চ ১৮৩৫।

চুঁচুড়ানিবাসি স্ত্রীগণস্য।"

দেশীয় লোকের জনহিতকর কার্য্য

(৪ এপ্রিল ১৮৩৫। ২৩ চৈত্র ১২৪১)

ফোর্ট উলিয়ম। জুদিসিয়ল ও রেবিনিউর ডিপার্টমেণ্ট। ৫ মার্চ্চ ১৮৩৫।—

শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ন২ লোকেরা নিজ ব্যয়েতে কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তদ্বিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে।

ভিন্ন২ লোকের দ্বারা সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কর্ম্মের বিবরণ পত্র।...

শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের বাঞ্ছা ছিল যে যাঁহারা এতদ্রূপে সর্ব্বসাধারণের হিতজনক কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিরাজমান হন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেণ্টের সন্তোষজনক কোন বিশেষ চিহ্ন প্রদান করা যায়। এবং এই বাঞ্ছিত বিষয় সফলকরণার্থ ১৮৩৪ সালের জানুআরি মাসে হুকুম হয় যে কলিকাতা রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলায় এক রিপোর্ট প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে গত কএক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন২ লোকেরা নিজব্যয়েতে সর্ব্বসাধারণের উপকারক যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে।

ঐ রিপোর্ট দৃষ্ট হইয়া অতিসন্তোষ জন্মিল যে সকল কার্য্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে যদিও তাহার মধ্যে কোন এক কার্য্য অতিবৃহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতর কার্য্য আছে যে তাহার সংখ্যা বাহুল্যক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল হিতজনক ব্যাপার হইয়াছে বা হইতেছে তাহা ইহার দ্বারা আরো বৃদ্ধি হইল।

উক্ত প্রধান২ কার্য্যের সংখ্যা বিবরণ এই।

প্রথম।— ৪ লৌহময় সাঁকো।

দ্বিতীয়।— ৮৬ ইষ্টকনির্ম্মিত সাঁকো।

তৃতীয়।— ৭০ নানা রাস্তা এবং তন্মধ্যে কোন২ রাস্তা ১২।১৪ ক্রোশ করিয়া দার্ঘ।

চতুর্থ।— ৪১২ পুষ্করিণী।

পঞ্চম।— ১১৩ চৌবাচ্চা।

ষষ্ঠ।— ১০৭ ঘাট।

সপ্তম।— পথিকেরদের উপকারার্থ ১৫ সরাই এতদ্ব্যতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ। এবং পথিকের উপকারক ও সর্ব্বসাধারণের হিতজনক অন্যান্য নানা ব্যাপার।

যে মহানুভব মহাশয়েরা স্বদেশের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াছেন উচিত হয় যে তাঁহারদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর হুকুম করিয়াছেন যে পশ্চাল্লিখিত তফসীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহারদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত এই অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি বিশেষ বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম না লেখেন তবে তাঁহার ত্রুটি হইতে পারে। নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের ৺প্রাপ্ত রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর।

৺প্রাপ্ত মহারাজ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বালা বাই।

শ্রীমতী বেগম সমরু।

৺প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়।

রাজা পটনি মল।

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

রাজা নৃসিংহ রায়।

হাকিম মেন্দীআলী খাঁ।

রাজা মিত্রজিৎ সিংহ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজা আনন্দকিশোর সিংহ।

রাজা জয়প্রকাশ সিংহ।

রাজা গোপালেন্দ্র।

পুরণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা।

টাকির শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়।

যশোহরের শ্রীযুত বাবু কালী ফতেদার।

অতএব যে মহানুভব মহাশয়েরা আত্মসম্ভ্রমজনক অথচ স্বদেশের উপকারক কার্য্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রূপে অগ্রগণ্য হইয়াছেন তাঁহারদের প্রতি গবর্ণমেণ্ট বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন। ভরসা হয় যে তাঁহারা এতদ্রূপ সদ্বর্ত্মে নিয়তই চলিবেন তাহাতে তাঁহারদের মনে সন্তোষ জন্মিবে এবং তাঁহারদের মহানুভবের এক চিহ্ন প্রকাশ এবং তাঁহারা ইদানীন্তন লোকেরদের বিবেচনাপেক্ষা উত্তম বিবেচনা করিতে যে অগ্রসর হইয়াছেন এমত প্রকাশমান হইবেন। শ্রীলশ্রীযুত এমত ভরসা করেন যে আদর্শস্বরূপ তাঁহারদিগকে দেখিয়া অন্যান্যেরাও তৎপথগামী হইবেন এবং গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ মহামহোপকারক কর্ম্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও ভিন্ন২ লোকেরদের বদান্যতা ঐক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভাবনা তদ্রূপ অপর কোন ব্যাপারের দ্বারা নাই।"

নূতন সাময়িক পত্র

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৩। ১৬ বৈশাখ ১২৪০)

"মান্দ্রাজে এতদ্দেশীয় ভাষায় সম্বাদপত্র।—পরিশেষে এইক্ষণে অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে মান্দ্রাজে এতদ্দেশীয় ভাষায় এক সম্বাদপত্র সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ মান্দ্রাজরাজধানী আমরা নিত্যই অবিদ্যাগাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া কহিতাম। তত্রত্য ঐ নবপ্রকাশিত সম্বাদপত্রের নাম কর্ণাটক ক্রানিকল। তাহার ১ সংখ্যক পত্র গত ১০ আপ্রিলের বুধবার অপরাহ্নে প্রকাশ হয়। মান্দ্রাজে প্রকাশিত ঐ প্রথম পত্র যে একেবারে অন্যান্য সম্বাদপত্রের অগ্রসর হইবে ইহা কোন প্রকারে অস্মদাদির শ্রবণ সম্ভাবনা ছিল না বাস্তব তাহাই হইল। বঙ্গদেশে ও বোম্বাইতে দুই ভাষায় মাত্র সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে কিন্তু মান্দ্রাজের পত্র এককালে তিন ভাষায় ভাষমাণ হইতে লাগিল বিশেষতঃ ইঙ্গরেজী ও তামূল ও তিলণ্ড অর্থাৎ যে ভাষা বঙ্গদেশে তৈলঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মান্দ্রাজ কুরিয়র সম্পাদক লেখেন যে ঐ পত্রের মুদ্রাঙ্কিতকরণ অত্যুত্তমরূপই হইয়াছে বিশেষতঃ ঐ পত্রের যে তিলণ্ড অর্থাৎ তৈলঙ্গি অক্ষর মান্দ্রাজে খোদিত হয় সে অতিসুদৃশ্য।"

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

"বিজ্ঞান সেবধি।—কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় ভাষিত হইয়া উদিত হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে তাহার বিশেষাবগত নহি সে যাহা হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকেরা তৎপর হইয়া প্রচার করুন মনে করি যাঁহারা উভয় ভাষাজ্ঞ তাঁহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই।...সুধাকর।"

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০)

"ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার প্রথম সঙ্খ্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ শ্রীযুত উলষ্টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে। ইহার মূল্য মাসে ৸০ অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।..."

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০)

"জানবুলের নাম পরিবর্ত্তন।—জানবুল পত্রে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে আগামি ১ অক্তোবরঅবধি ঐ সম্বাদপত্রের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া ইঙ্গলিসমান নাম রাখা যাইবে এতদ্রূপ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম

অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ ঐ নাম করিলে তাবৎ অশুভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কারণ যথার্থ ও প্রবল বটে।”

(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ১ পৌষ ১২৪০)

“মান্দ্রাজ।—মান্দ্রাজ ক্রানিকেল সম্বাদ পত্রে লেখেন যে ইঙ্গরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষায় এক সম্বাদ পত্র অতি-শীঘ্র মান্দ্রাজে স্থাপিত হইবে।”

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৫ পৌষ ১২৪০)

“ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টর।—আমরা খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টরের সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌষ্টিকতা না করাতে তাঁহারদের এ পত্র রহিত করিতে হইয়াছে।”

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

“রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে বৃত্তান্তবাহকনামক এক সম্বাদপত্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায় ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যল্প মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে।”

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

“রিপোর্টরনামক মাসিক বহী।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব আইন-সম্পর্কীয় এক ব্যবস্থার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের নাম রিপোর্টর হইবে। গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে ও সাধারণ জজ কালেক্টরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং যে রুবকারী হইবে তাহার রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে। ঐ গ্রন্থ বিলায়তী কাগজে মুদ্রিত হইয়া প্রতি-মাসে প্রকাশ হইবে। স্বাক্ষরকারিরদিগকে গ্রন্থ মাসে ২ টাকা মূল্যে তদ্ব্যতিরিক্তেরদিগকে ৩ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২৭ মাঘ ১২৪০)

“মান্দ্রাজের মোসলমান সমাচারপত্র।—মান্দ্রাজ হেরাল্‌ড সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মান্দ্রাজে এতদ্দেশীয় ভাষায় অপর এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্পাদক এক ব্যক্তি মোসলমান এবং ঐ পত্রের নাম মিরাতুল আকবর তাহার ১ সংখ্যা ৮ জানুআরিতে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কোন্ ভাষায় প্রকাশিত ইহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই।”

(২১ জুন ১৮৩৪। ৮ আষাঢ় ১২৪১)

“নূতন সম্বাদ পত্র।—অন্যান্য সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র এই নামধারি এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীঘ্র প্রকাশ পাইবে। তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথবা বার্ষিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইবে। এই নূতন পত্র সম্পাদক অনুষ্ঠান পত্রে লেখেন সে আশ্চর্য্য বিষয় এই যে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে কোন সম্বাদ পত্র অদ্য-পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই অতএব লিখন ও মুদ্রাঙ্কনের দ্বারা ঐ ভাষার সৌষ্ঠবকরণের এই মাত্রই প্রথমোদ্যোগ হইতেছে। এই যুক্তিক্রমেই আমারদের সম্বাদ পত্রের পোষকতা বিষয়ে পোষ্টবর্গের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি।

আমারদের স্মরণ হইতেছে যে ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-স্থানীয় ভাষায় দেবনাগর অক্ষরে কলিকাতায় এক সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু কএক সংখ্যক মাত্র প্রকাশ হইলে পর পোষণাভাবে ক্ষীণ হইয়া গেল। এইক্ষণে ভরসা করি যে এই নূতন উদ্যোগ অপেক্ষাকৃত সাহায্যের দ্বারা সফল হইতে পারে।”

(২৫ জুন ১৮৩৪। ১২ আষাঢ় ১২৪১)

“পারসীয় আকবর।—সাপ্তাহিক এক পারসীয় আকবর অতি শীঘ্র লুদিয়ানাতে প্রকাশার্থ সংস্থাপিত হইবে। এবং তাহাতে সিন্ধু ও ভয়ালপুর ও পঞ্জাব ও আবগানি ইত্যাদি দেশের নানা সম্বাদ প্রকাশ হইবে।”

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২ আশ্বিন ১২৪১)

“ইণ্ডিয়া গেজেট বিক্রয়।—ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ গেজেটের ব্যাপার যে চারি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে তিন ভাগ ইনশালবেণ্টের ইষ্টেটের নিমিত্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে। কোন২ ব্যক্তি শ্যারপ্রতি ৫,০০০ টাকা প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতিন্যূন মূল্য কিন্তু যদি ইহাঅপেক্ষা অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে। ঐ কারখানাতে প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তৎসংখ্যা ২০,০০০ টাকা এতদ্ভিন্ন কারখানার যে জিনিসপত্র

তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০,০০০ টাকা ধরা গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে ঐ পত্র-গ্রাহক ৪০০ পর্য্যন্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় না যেহেতুক বর্ত্তমান সম্পাদকের হস্তে যদবধি ঐ কর্ম্ম আসিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণ্য ও বিজ্ঞতাপূর্ব্বকই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে।”

(১ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৬ আশ্বিন ১২৪১)

“ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস।—গত শনিবারে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্যার অর্থাৎ যে তিন অংশ ইনশালবেণ্ট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহা গত শনিবারে নীলাম হইল এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ৩৪০০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্ব্বে ঐ বাবু যন্ত্রালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপই হইল।”

(৪ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৯ আশ্বিন ১২৪১)

“ইণ্ডিয়া গেজেট।—ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রালয় হরকরা যন্ত্রালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে যে ইণ্ডিয়া গেজেট সম্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রাঙ্কিত হইত তাহা আর হইবে না এবং ঐ দৈনিক সম্বাদ পত্রগ্রাহকেরদিগকে দৈনিক হরকরা সম্বাদপত্রই দেওয়া যাইবে। যে ইণ্ডিয়া গেজেট পত্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা যে অতিবিজ্ঞ সম্পাদক কএক বৎসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তাঁহাকর্তৃকই পূর্ব্ববৎ প্রকাশ হইবে কিন্তু তাহা এইক্ষণঅবধি হরকরা যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইবে।”

(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪। ১০ কার্ত্তিক ১২৪১)

“পশ্বাবলি।—শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু কর্তৃক কৃত পশ্বাবলি-নামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমার-দিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে সংক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে পশুদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহ্লাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।···—জ্ঞানান্বেষণ।”

(৫ নভেম্বর ১৮৩৪। ২১ কার্ত্তিক ১২৪১)

“পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিথেদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল। এই মাসুল বৃদ্ধি হওয়াতে মফঃসলনিবাসি এত গ্রাহক মহাশয়েরা দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং এই বৎসরের শেষেই তাহা তাঁহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফঃসলের গ্রাহক আর থাকেন না অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ব্ববৎ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব এবং তাহার মূল্যও পূর্ব্ববৎ ১ টাকা স্থির করিব। আমরা দর্পণ বৃদ্ধিকরণে যেমন অগ্রসর হইয়াছিলাম তেমনি পুনর্ব্বার অনুসর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচার অগত্যা গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি মফঃসলের গ্রাহকেরা এতদ্রূপ দর্পণের মূল্যের ন্যূনতা দেখিয়া পূর্ব্ববৎ আমারদের সাহায্য করেন তবে বড়ই আহ্লাদের বিষয় যদ্যপি না করেন তবে অস্মদাদির দুর্ভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহা হইলে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসম্পর্ক হইতেই হইল।”

(১৫ নভেম্বর ১৮৩৪। ১ অগ্রহায়ণ ১২৪১)

“সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক।—আমারা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এত-দ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ···। মৃত বিজ্ঞবর ডাক্তর কেরি সাহেব ঐ কাগজের স্রষ্টা···। দর্পণকার মহাশয় গত ৫ নবেম্বর ২১ কার্ত্তিক বুধবাসরীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ডাক মাসুল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্য এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত তাহা রহিত হইবেক পরে এক টাকা মূল্যে একবার অর্থাৎ কেবল শনিবারে প্রকাশ করা যাইবেক ইহাতেও যদি গ্রাহকগণের আনুকূল্য বোধ না হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে।

এতদ্বিষয়ে দর্পণকারের খেদোক্তিতে আমরাও মহাখেদিত হইলাম।···—চন্দ্রিকা।”

“চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অনুগ্রহ-প্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণৈক পার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ ডাক্তর কেরী সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই যোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনাপূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং একপ্রকার প্রতিকূলই ছিলেন কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ দর্পণপত্র প্রকাশের সম্বাদ শ্রবণেতে যখন স্বীয় পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন তখন ডাক্তর কেরি সাহেবের তাবৎ উদ্বেগ শান্তি হইল।”

(৫ নভেম্বর ১৮৩৪। ২১ কার্ত্তিক ১২৪১)

“নূন্যাধিক ৩৬ বৎসর হইল আসিয়াটিক মেরিয়ালনামক [এশিয়াটিক মিরার] সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অতিপ্রধান ঐ সম্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় বিরাজমান ছিল তাহাতে পত্রসম্পাদক ক্রস সাহেবের রচিত ক্ষুদ্র এক প্রস্তাবোপলক্ষে ইহা লিখিয়াছিলেন এতদ্দেশীয় প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কেবল এক মুষ্টি-পরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়েরা যদি প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র একটি২ ডেলা ফেলিয়াও মারেন্ তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা একেবারে চাপা পড়েন এই কথার কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না তথাপি ঐ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সরকারী তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্বেগ জন্মিল তাঁহারা সকলই স্থির করিলেন যে এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপারসূচক বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সম্বাদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে ঐ পত্রসম্পাদকেরদিগকে এতদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম হইল বুঝি ঐ সম্পাদক ডাক্তর স্প্রেট ও ক্রস সাহেব ছিলেন। পরে ঐ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট স্বীকার করিয়া অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কখন ছাপাইব না তাহাতে ঐ সম্বাদপত্র পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে হুকুম হইল। এবং ঐ পত্রাধ্যক্ষেরদিগকে দেশে থাকিয়া পূর্ব্ববৎকার্য্য করিতেও অনুমতি হইল।

গত মাসের ১২ তারিখে রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য উক্তি ছিল এবং ঐ পত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। অপরগত পূর্ব্ব ২ রবিবারে প্রকাশিত পত্রে ঐ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনতা হওনবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ অভিপ্রায়িস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ রিফার্ম্মরের উক্তি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে কুরিয়র-সম্পাদক যাহা বোধ করিয়াছেন সে প্রকৃতই জ্ঞান হয় যেহেতুক ঐ উক্তিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য বিনাশ হওয়া অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমারদের মনে এই বিবেচনা হইল যে পূর্ব্বতনকাল ও ইদানীন্তন কাল এবং লার্ড উলসলি সাহেব ও শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের আমলের কি পর্য্যন্ত বৈলক্ষণ্য না হইয়াছে যদি এবম্বিধ উক্তি ইহার ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত তবে ঐ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইত না অথচ তৎসময়ে ইঙ্গরেজী ভাষা পঠনক্ষম এতদ্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন না এবং এবম্প্রকার লিখনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ঈদৃশ দুই জনও পাওয়া ভার ছিল কিন্তু এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাঁহার দেশস্থ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিই ঐ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু উৎসাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য কিছু আল্‌গা হইয়াছে ফলতঃ এইরূপ অনর্থক উক্তিতে ব্রিটিস

গবর্ণমেণ্টের যে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসম্ভাবনা এমত বোধ হয় না তথাপি ইঙ্গলণ্ডদেশীয় লোকেরা এমত প্রস্তাব পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপান শক্তির কিছু সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ৯০০ সামান্য গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া জয় করিলেন এবং ঐ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন অর্ব্বাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শান্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্ম্মরের মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের দ্বারা কিপ্রকারে ভয় সম্ভাবনা। কিয়ৎকাল হইল এতদ্দেশীয় কোন এক সম্বাদপত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতদ্রূপ কোন শ্লাঘ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক হইলে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা তাঁহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই উক্তি কোন্ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় তাহা স্মরণ হয় না। তৎসময়ে আমারদের সহকারি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় অতিরহস্য বিধায় ঐ প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্টা করিয়া কৃত্তিবাসোরচিত রামায়ণের এক শ্লোকের উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন তাঁহারা ঐ শ্লোকের তাদৃশ রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকিবেন। সেই শ্লোক এই বড়২ বানরের বড়২ পেট লঙ্কায় যাইতে মাথা করেন হেঁট।”

বেগম সমরু

(৬ নভেম্বর ১৮৩৩। ২২ কার্ত্তিক ১২৪০)

“শরদানার বেগমের অতিবদান্যতা। শ্রীমতী বেগম শমরু স্বীয় উকীলের দ্বারা দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে ঐ সাহেব তাঁহার নামে লণ্ডননগরস্থ ও কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন যেহেতুক ঐ সোসৈটির প্রতি তাঁহার বর্ত্তমান বৎসরের চাঁদার এই দান। শ্রীমতী আরো নিবেদন করেন যে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের ত্রেজুরীতে আপনার যে ২৫০০০ টাকা জমা আছে তাহা নিকট অঞ্চলস্থ দীন দুঃখি লোকেরদিগকে বিতরণ করা যায়।”

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

“বেগম শমরুর দানশৌণ্ডতা।—আমরা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া শরদানার একাধিপত্যরূপ রাণী বেগম শমরুর অতি দানশৌণ্ডতার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংপ্রতি কলিকাতার বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার সুদ হইতে মিসনরি শিক্ষা করাণ ও তাঁহারদিগকে বেতন দেওয়া চলিবে। তিনি আরো ৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহার সুদহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার করা যাইবে।”

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

“শরদানা।—শরদানা শহরের অতিদীনহীন লোকেরা সংপ্রতি শ্রীমতী রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়িরদের নামে এই নালিস করিল যে তাহারা শস্যের মূল্য চড়তি করিয়াছে। তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণে বাণিজ্যকারিরদিগকে ডাকাইয়া তাহারদের কার্য্যের অনৌচিত্য-বিষয়ে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন যে তোমরা টাকায় বিশ শের করিয়া শস্য বিক্রয় করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের অনেক ক্ষতি হয় ইহা কহিয়া ব্যবসায়িরা প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় ও পুষ্করিণীতে চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়া হুকুম দিলেন যে তাবল্লোককে জল লইতে দিবা কিন্তু বাণিজ্যব্যবসায়িরা এইক্ষণে যে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য না দিলে কদাচ জল লইতে দিবা না। এইরূপ প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ সুফল দর্শিল তাহাতেই ব্যবসায়িরা অবনত হইল এবং শস্যের দুর্মূল্য করাতে তাঁহারদের দুর্মূল্য জল ক্রয় করিতে হইলে পরিশেষে অতিনম্র হইয়া শ্রীমতীর নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন যে আমরা আগামি ছয় মাসপর্য্যন্ত টাকায় ২০ শের করিয়া তণ্ডুলাদি বিক্রয় করিব।”

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২০ মাঘ ১২৪০)

"ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবরা রিবিউ অর্থাৎ এডিনবরা দেশে নিশ্চিত আমেরিকা প্রকাশিত সমাচার পুস্তকে বেগম সমরুর এক সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বিবরণ আমারদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষতঃ আমারদের স্বজাতীয় পাঠকেরদের মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমরা তাহার চুম্বক লিখিতেছি।

বেগম শমরুর নগরের নাম সরদানা তথায় তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বাস করেন ঐ নগরের চতুর্দ্দিগস্থ প্রদেশ-সকল তিনি জায়গিরেরস্বরূপ অধিকার করেন তাহাহইতে পূর্ব্বে বৎসর২ ৬ লক্ষ টাকা কর পাওয়া যাইত কিন্তু বেগমের অতিউত্তম শাসনের দ্বারা এইক্ষণে ৮ লক্ষ পাওয়া যায়। তিনি পূর্ব্বে এক নর্ত্তকী ছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা ও মাতার নাম বা কোন্ দেশহইতে তিনি আসিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই তিনি শমরুনামক এক জন জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তির শমরু নাম হইবার কারণ এই তিনি সর্ব্বদা আমোদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন না ঐ দুরাত্মা ইঙ্গরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার কুঠীর সাহেবের-দিগকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা ইহার অল্পকাল পরেই পাটনা পুনর্ব্বার লুঠ করাতে তিনি তাঁহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়া পশ্চিমে গমনকরত প্রথমে ভরতপুরের রাজার এবং তৎপরে অন্য২ হিন্দু-রাজারদের দাস হইলেন পরে অনেক লভ্যজনক ও অনুকূল ঘটনা হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বারা দিল্লীর উত্তর পূর্ব্বে বহু ভূমি অধিকারকরত অতিশয় শক্তিমান হইয়া পরে মরিলেন পরে বেগম শমরুনামক এক ফরাসিকে বিবাহ করিলেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি অসভ্য সম্ভ্রমে অতি বিরক্ত হইয়া ইউরোপে যাইবার মনস্থ করিল। ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশীভূতা হইতে হইবে তাহা জানিতে পারিয়া বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রায় আপন সৈন্যের প্রধানেরদের গোপনে জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু পতির নিকট তিনি এই মিথ্যা ভয় প্রকাশ করিলেন যে পাছে ধৃত হন কারণ তাহা হইলে পরিত্যাগের কারণ তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত অখ্যাতিগ্রস্ত হইবেন। অতএব তাঁহারদের মধ্যে দৃঢ়রূপে এই স্থির হইল যে যদ্যপি ধৃত হন তবে উভয়েই আত্মঘাতী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী আরোহণে এবং বেগম মহাপায়ায় গমন করিলেন নিশ্চিত স্থানে ঘাটী প্রস্তুত ছিল এবং তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়ানুযায়িক হইল যথা প্রতিযোগিরা বেগমের সৈন্যাদি দূরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা ফরাসিসকে কহিল যে বেগম গুলিদ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এই বার্ত্তা সত্য কিনা তাহা জানিবার কারণ তিনি মহাপায় গমন করিলে ঐ লোকজনক ঘটনার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহাকে এক উক্তযুক্ত গাত্রমার্জ্জনী দেখান গেল ইহাতে তিনি আপন মস্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন পরে বেগম এক হস্তীআরোহণ করিয়া আপনি যে সৈন্যেরদের প্রমত্ত স্নেহ করেন এতদর্থে বক্তৃতা করিলেন তাহারদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পত্তি তাহারদের সহিত বিভাগ করিবার মানস ভিন্ন তিনি অন্য কোন মানস প্রকাশ করিলেন না পরে সৈন্যেরা যুযুৎসব করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার শিবিরে লইয়া গেল।

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈন্যের অধ্যক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের বিষয় সকল করিতে লাগিলেন। কর্ণেল স্কিন্নর কহেন যে তিনি স্বয়ং সৈন্য রণস্থলে চালাইয়া নাশের মধ্যেও অতিশয় সাহস ও মনের স্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি আপন দেশ কৃষিকর্ম্মদ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু করিতে মনোযোগ করিয়াছেন, তাহার ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তেজস্বী ও ফলবন্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রজারা কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সুখী ও শ্রীমান্ তিনি নিরন্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তাঁহার স্মরণ লইলে তাহা অবশ্য স্থির ও সত্য হয়। পূর্ব্বে তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে রোমান কাতালিক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন এবং ঐ ধর্ম্মের অনেক যাজক ও কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন রাজধানীতে তিনি সেণ্ট পিটরের মন্দিরের ন্যায় এক মন্দির অর্থাৎ গির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে তাহার মূর্ত্তি খর্ব্ব ও বর্ণ অতিশয় শুক্ল ও অবয়ব প্রশস্ত ও স্ফীত এবং বাক্য ধীর ও তীক্ষ্ণ কিন্তু চতুর তাঁহার হস্ত ও বাহু এবং পদ সুখ্যাতি ও প্রশংসার উপযুক্ত।

তিনি যে আপন ভৃত্যেরদের প্রতি বহু নিষ্ঠুরাচরণ

করেন তাঁহার এমত অপবাদ আছে তাহারও একটা নিষ্ঠুরাচরণের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যথা, এক অল্পবয়ঃক্রমি দাসীকে ধূর্ত্ততায় ধৃত করিয়া তিনি তাঁহাকে জীয়ন্তে পুঁতিতে আজ্ঞা দিলেন এবং ঐ নিষ্ঠুর আজ্ঞা সম্পূর্ণ হইল এবং ঐ বালিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকেরদের অতিশয় দয়া হইয়াছিল এই কারণ বৃদ্ধা নিষ্ঠুরা বেগম আপনশয্যা আনাইয়া ঐ কবর স্থানে নিস্তার করত তামাক খাইয়া তদুপরি নিদ্রা গেলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।"

(১৪ মে ১৮৩৪ । ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

"বেগম শমরুর সম্পত্তি।—মিরটের দরবারে [Meerut Observer] লেখেন যে গত মাসের মধ্যে বেগম শমরু কর্ণল ডাইস সাহেবের পুত্র ডাইস সাহেবকে স্বীয় সম্পত্তি চূড়ান্ত দান করিয়াছেন। কর্ণল ডাইস সাহেব বেগম শমরুর পূর্ব্ব স্বামি শমরুর কুটুম্ব। শমরু অনেক বৎসরপূর্ব্বে লোকান্তর হন। কর্ণল সাহেব পূর্ব্বে বেগমের অতি-বিশ্বাসপাত্র ছিলেন এবং তাঁহার তাবৎ সরবরাহ কার্য্য ও সৈন্যাধ্যক্ষতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমরু তাঁহার মুখাবলোকন করিতেও অসম্মতা হইলেন এবং ঐ সাহেব কএক বৎসরাবধি মিরটে বাস করিতেছেন ঐ বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহার নামে দান পত্র না হইয়া তাঁহার পুত্রের নামে হইয়াছে। এবং ঐ দানপত্র ক্রমে ঐ পুত্র বেগমের সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই নিয়ম হইয়াছে যে ঐ ডাইস স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে শমরু নামধারী হইবেন। ঐ দান পত্র পারস্য ভাষায় লিখিত কিন্তু তাহাতে এমত লিখিত আছে যে ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত পূর্ব্বকার যে এক দানপত্র ছিল তাহাও সিদ্ধ হইবে। বেগমের যে ভূম্যাদি অর্থাৎ শরদানা ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার যে জায়গীর আছে তাহা সন্ধিপত্র-ক্রমে তাঁহার মরণোত্তর কোন২ বিষয় বর্জিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইবে।"

(২ জুলাই ১৮৩৪ । ১৯ আষাঢ় ১২৪১)

"বেগম শমরুর গুরগাঁর নিকটস্থ প্রদেশের অবস্থা।—বেগম শমরুর দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশের অবস্থাবিষয়ক বিবরণ বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তত্রস্থ প্রজারদের স্থানে তিনি কর অত্যন্ত শুষিয়া লইতেছেন। ইহাতে তাহারা অদৃষ্ট অশ্রুত চুরি ডাকাইতী ও হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাদশাহপুরের আমিল কিল্লার নিকটেই খুন হয় এমত দুইবার ডাকাইতী হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন রাজকীয় লোকেরই মনোযোগ নাই।—দিল্লী গেজেট।"

(১৪ মার্চ ১৮৩৫ । ২ চৈত্র ১২৪১)

"শরদানা।—অবগত হওয়া গেল শরদানার কর্ত্রী শ্রীমতী বেগম শমরু গত কএক দিবসের মধ্যে শরদানাতে তাঁহার রাজকোষে যত টাকা ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা মিরটের খাজানাখানাতে এই নিমিত্ত দাখিল করিয়াছেন যে ঐ টাকা শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনে অর্পিত হয়। কথিত আছে যে তিনি যে টাকা প্রেরণ করেন তৎসংখ্যা ৩০।৩৫ লক্ষ টাকা হইবে তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ ফরক্কাবাদী অবশিষ্ট পুরাতন সাধারণ টাকা।"

নূতন গ্রন্থ

(৪ জুন ১৮৩৪ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

"তত্ত্ব।—অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-বিরচিত হিন্দু ধর্ম্মের বিধায়ক যে গ্রন্থ তাহার প্রথম ভাগ এইক্ষণে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে অতএব সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিমিত্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করা গেল তাহা আমারদের অতিশীঘ্র ব্যক্তকরণ আবশ্যক বোধ হইল। যে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলই সংস্কৃত গ্রন্থমাত্র দেবনাগর অক্ষর ব্যতিরেকে মুদ্রাঙ্কিতকরণে অত্যন্ত আপত্তি করেন এবং বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেন যাঁহারা এতদ্রূপ বিবেচনা করেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই অস্মদাদির অতিমান্য এবং উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থ কেবল দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান। প্রথম এই যে দেবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্ব্বাপর সংস্কৃত ভাষা ঐ অক্ষরে লিখিত হইতেছে অতএব ঐ অক্ষরই ব্যবহার করা উচিত। তদুত্তর এই দেবনাগরের মধ্যে দুই ব লিখনের বিভিন্নতা আছে বঙ্গাক্ষরে তাহা নাই এবং তাবদক্ষরের সঙ্গে আকৃতিরও কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে। পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাগর ব্যবহার হইতেছে তাহাতে যেমন বঙ্গাক্ষর বিভিন্ন তেমনি

যে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস বাল্মীকি স্ব২ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই অক্ষর ইদানীন্তন দৈবনাগরহইতে তুল্য বিভিন্ন। দ্বিতীয় দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেব-লোকেরা কহেন যে দেবনাগর অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে চলিত হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকা-অবধি চীন দেশের সীমা এবং কুমারিকা অন্তরীপঅবধি কাশ্মীরপর্য্যন্ত ইহা সত্য বটে এবং যদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবহারহওনার্থ ছাপাইতে হয় তবে তাহা অবশ্য দেবনাগরে ছাপান উচিত কিন্তু যে গ্রন্থ কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহার হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহা বঙ্গদেশপ্রচলিত অক্ষরে মুদ্রা করা অযুক্ত বোধ হয় না।

বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা আর কোন অক্ষর ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোর্ট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকাপর্য্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত করা যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্ম্ম দেওয়া যাইবে না অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহারা ঐ অক্ষরে স্ব২ লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে কোন পণ্ডিতও নাই এতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর চলিতকরণার্থ এক মহোদ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল অতএব আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্ সাহেবলোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়রদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই।

যে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল এই প্রথমবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের তাবৎ ধর্ম্মের নিয়ম ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায় ঐ গ্রন্থ ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর হইল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত হয় এবং ক্রমে২ এমত মান্য হইয়াছে যে এতদ্রূপ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে তাহা চলিতেছে।"

(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

"আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত সর গ্রেব্‌স হৌটন সাহেব লণ্ডন নগরে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজীতে নূতন এক ডিক্সানরি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থের শেষে এতদ্রূপ নির্ঘণ্ট করিয়াছেন যে তাহা উল্ট করিয়া পড়িলে ইঙ্গরেজী ভাষার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্যে এইক্ষণে ৮০ টাকারও অধিক।"

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

"শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দুরদের মধ্যে অতি-প্রসিদ্ধ বেতাল পঁচিশনামক গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিয়া আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন।"

(২৮ মার্চ ১৮৩৫। ১৬ চৈত্র ১২৪১)

"কল্পিত নূতন গ্রন্থ প্রকাশমান।—শ্রীযুত পি এস দিরোজারিয় সাহেব ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। ঐ গ্রন্থ নূতন রোমানাজিং নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে। ঐ গ্রন্থ আকৃটবো ৫০০ পৃষ্ঠ সংখ্যক হইবে। তাহার মূল্য ৬॥০ টাকা স্থির হইয়াছে।

শ্রীযুত সিক্সপিয়র সাহেবের সংগৃহীত ডিক্সানরী ইঙ্গরেজী অক্ষরে পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহা এইক্ষণে কলিকাতার বাপ্‌টিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। তাহার প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ২০ টাকা।"

পদচিহ্ন

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

গথের কোলাহল অনেক আগে থেমে গেছে। জনহীন জেটীর ধারে বসে হয় ত ক্ষীণা নদীর ঢেউ গুণছিলাম, কিম্বা শুনছিলাম তা'রি ভীরু গুঞ্জন! মনের ভাবনার কোন মানে নেই, সামঞ্জস্য ত নয়ই!

একটু দূরে শ্মশান। চিতা থেকে যে আগুনের শিখা উঠচে—তা'র কাছ থেকে ইচ্ছে করেই পালিয়ে এলাম। এখনও চিতার পাশে বসে রাধু আর রাখরাম মদ গিলচে। মড়া বয়ে বয়ে ওদের কাঁধে ঘাঁটা পড়ে গেছে—সেই সঙ্গে মনেও। কেমন অচেতন নির্দ্দয়তার সঙ্গে তা'রা অঙ্গার-অবশেষ দেহটাকে খুঁচিয়ে ভেঙ্গে ফেলচে।

এসেছিলাম তা'দেরি সঙ্গে।

দাহ শেষ হ'তে এখনও এক ঘণ্টা লাগবে। খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে—নদী তাই উতরোল এবং মাথার উপর থেকে মেঘ এখনও মুছে যায় নি। উপরের অন্ধকার শ্মশানটাকে যেন আরও ভয়াবহ করে তুলেচে। মনে হচ্চে, এত আলো জেলেও পরপারের অন্ধকার এখনও ভেদ করা হ'ল না।—জায়গাটাই এমনি যে, এখানে এলে একটু দার্শনিক প্রবৃত্তি জেগে উঠবেই।

ভাল লাগল না, উঠে পড়লাম।

ট্রামের লাইনের ফাঁকে ফাঁকে জল চকচক করচে, দূরের কতকগুলো লাল আলো;—রাস্তা মেরামত হ'চ্চে।

ঘুমন্ত সহরের উদ্দেশে তাকিয়ে মনে হয় না যে, আবার এর ঘুম ভাঙ্গবে!

স্তব্ধতাকে কর্কশ শব্দে খণ্ড খণ্ড করতে করতে একটা মোটর আসচে—ট্যাক্সি। কিন্তু সামনে পাঞ্জাবী ড্রাইভার, আর ভিতরে একটী তন্দ্রাগ্রস্ত মেয়ে ছাড়া কেউ নেই!

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার তার আয়াস-সাধ্য বাঙ্গলা ভাষায় মেয়েটীর উদ্দেশে বলচে, কোথায় নামবে শিগগির বলো, নইলে এইখানেই সে তাকে নামাতে বাধ্য হ'বে।

একটু দূরেই ছিলাম। মেয়েটী স্খলিত কণ্ঠে কি যে বলে, শোনাই যায় না। কিন্তু পাঞ্জাবীর উত্তর শুনতে পেলাম। সে বলচে, শ্মশান-ঘাট ত এসে গেছে—আর কতদূর সে ঘুরবে! এদিকে ভাড়াও যে উঠেচে কুড়ি টাকা!

আমাকে সামনে দেখে ড্রাইভারের উৎসাহ গেল বেড়ে।

—দেখিয়ে বাবু, ক্যা জুলুম! রাত দো বজনে চলা, লেকিন না দেগি কিরায়া, উতরকে ভি ন' জায়গি।

এগিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু হঠাৎ চেনা শক্ত হ'ল!—মমতা! রুখু চুলগুলি মুখের উপর লুটিয়ে পড়েচে, এলো খোঁপার অবস্থাও তাই! মমতা নিরর্থক মুখের দিকে চেয়ে আছে—চেনবার শক্তি নেই!

কণ্ঠস্বর সহজ করে—কিম্বা করবার চেষ্টা করে বল্লাম, টাকা আছে সঙ্গে? কেন এ' বেচারীকে মিছিমিছি ঘুরিয়ে মারচ—?

মমতা আঁচলটা আমার হাতের ওপর ফেলে দিয়ে বলে, মিছিমিছি কিসের! আমার সঙ্গে টাকা নেই? দেখ না—মুঠীর মধ্যে ধরতে পারবে না।

বললাম, তোমার আঁচলে ঢের টাকা থাকতে পারে, কিন্তু সে-গুলো তা'র মুঠীতে গিয়ে উঠ্‌চে কি না তাই বেচারী ভাবচে।

মমতা হাসবার চেষ্টা করে বললে, পা'বে, পা'বে; ওকে ব্যস্ত হ'তে বারণ কর। কিন্তু তুমি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কেন? চিনতে তোমায় পেরেচি। গাড়ীতে উঠে বসো।

বললাম, আপাততঃ সে ইচ্ছে নেই। তোমার সন্ধানে এখানে আসি নি। এসেছিলাম বিপন্নের উপকার করতে;—বিশ্বাস করতে পারবে না জানি, কিন্তু সত্যি।

তা'দের বলে এস।

সে হয় না, একসঙ্গে সকলকে ফিরতে হ'বে। তা ছাড়া তোমার পাশে বসে যেতে আমার ভয় হচ্চে—ঘেন্না নয়।

কেন?

তুমি মদ খেয়েচো।

খেলে আশ্চর্য্য হ'বার কি ছিল? কিন্তু সত্যিই তা' খাই নি। গোটা কতক সিদ্ধির বরফ—তাইতেই এই—।

লক্ষ্মী, রাগ করো না, ওদের বলে এসো, নইলে আমি নিজেই নেমে যাব।

ড্রাইভার বেচারা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে আছে। হয় ত ভাবচে, এত রাত্তিরে আবার চেনা লোক জুটল কোত্থেকে। তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ঘুরে এলাম।

মমতাকে বললাম, এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরা আমার চাই।

—বেশ, পৌঁছে দেব।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি চলেচে—যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মমতা আমার একখানা হাত চেপে ধরেচে মুঠোর মধ্যে, আঁচল উড়চে বাতাসে!

এতরাত্রে একা ট্যাক্সিতে—?

কি জানি—?

বললাম, ন্যাকামি রাখ। কাউকে পৌঁছতে এসেছিলে বোধ হয়—।

মাইরি না।—মমতা কাঁধের ওপর মাথা এলিয়ে দেয়।

তবে কি, কবিত্ব?

প্রায়। আজ কা'রও উপদ্রব সহ্য করতে হয়নি; ঘরের নীল বাল্‌বের আলোর নীচে শুয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ নামল বৃষ্টি; জানালা বন্ধ করলাম না—ভিজে বাতাসে চুলগুলো আলুথালু হয়ে গেল। ঘুম আসছিল; ভাবলাম, ঘুমোলেই ছুটির রাতটী ফুরিয়ে যাবে। তাই লোভীর মত বেরিয়ে পড়লাম।

—একা বেরুতে তোমার ভয় হ'ল না এতটুকু?

মমতা হয় ত একটু হাসল, কিন্তু বুঝতে পারি না। বললে, প্রথম যেদিন শ্বশুরের বাড়ী ছেড়ে বেরুই, সে-দিনও ভয় করেনি এতটুকু···যাক সে কথা। তুমি নিশ্চয়ই ভাবচ আমি কাউকে ভালবেসেচি, নয়—?

আশ্চর্য্য কি—!

সত্যিই, আশ্চর্য্য নয় এতটুকু। কত লোককেই না ভালবাসা জানালাম এবং আজও এর শেষ হ'ল না। তোমার মুখ কঠিন হয়ে উঠচে; এইবার তুমি নিশ্চয়ই গাড়ী থেকে নেমে যেতে চাইবে; কিন্তু সত্যি আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলিনি। ভালবাসবার, ভালবাসা পা'বার সাধ কখনও মেটে?

—যাক্, তোমার কথা তুমি ভাল জান। কিন্তু হঠাৎ শ্মশানে কেন?

—শ্মশানের সঙ্গে আমাদের আশ্চর্য্য রকমের মিল রয়েচে; বোধ হয় তাই।

—এবার আমায় সত্যিই নামতে হ'বে। কবিত্ব রাখো, না হয় এককালে একটু লেখাপড়ার চর্চ্চাই করেছিলে।···আছো কেমন—?

—বেশ।···শুনে খুশী হ'লে না বোধ হয়?

—না হ'বার কারণ কি?

—সত্যিই ত! তুমি যেদিন থিয়েটার দেখাবে বলে দিন ঠিক করে গেলে এবং সেই দিন থেকে যখন তোমার কোন সন্ধানই রইল না, তখন আমিই কি উপোস করে ছাদে দাঁড়িয়ে রাত্রি জেগেছিলাম?···মোটেই না।

—জানি।

দু'জনেই একটা বিশ্রী, অস্বস্তিকর অবস্থায় এসে পড়েচি। খানিক হুহু করে কেটে যাবার সঙ্গে ড্রাইভার কি একটা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কেউ উত্তর দিলাম না।

হঠাৎ মমতাই বলে উঠল, এক বড় ব্যবসাদারের সঙ্গে আছি—জানো? ক'দিনের জন্যে তিনি বোম্বাই গেছেন, তাই ছুটী। খুব বড়লোক, কোমল-হীরের ব্রেসলেট দিয়েচে এক জোড়া।

বললাম, আমাকে দেবে নাকি যে এত করে শোনাচ্চ? দিলে কিন্তু অনেক দুশ্চিন্তা থেকে বেঁচে যেতাম।···আচ্ছা, অনেক দূর এসে পড়েচি, এবার হয় গাড়ী ফেরাও, নয় ত নামি।

কাঁধে হাত রেখে মমতা বললে, চল না, আমার ওখানে; দক্ষিণ-খোলা ঘর দেখে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

—কিন্তু মন জ্বালা করবে। সেই ঘরেই যে তোমার ব্যবসাদার—অধিকারীর দেওয়া ব্রেসলেট-জোড়া রাখা আছে।

মমতা বললে, শুধু ব্রেসলেট? তোমাদের যিনি আজকাল একজন নামজাদা কবি—তাঁর কবিতার একখানা খাতাও যে রয়েচে সেখানে! তাঁর কত কবিতার মূলে যে ভাব জুগিয়েচি—ভাবতেও হাসি পায়। তিনি কোথায় থাকেন জানো—?

—উঁহু; নিজের ঠিকানাই অনেক সময় বলতে পারি না।

—বাঃ, তুমিও যে সোজা কথা ভুলে গেছ! কবিকে

যদি জিজ্ঞাসা করতাম—'আবার কবে দেখা পাব?' তিনি বলতেন—'কাল সূর্য্য ডোববার আগে যদি নিজে না ডুবে যাই!' দেখা হ'লে বলো, তাঁর কবিতার খাতাখানি আসল মরক্কোর চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেচি।

—আমি এত উদার নই যে, ট্যাক্সি ভাড়া পেলেও তাঁকে এই সুখবর দিয়ে আসব! কিন্তু কবির কথা থামাও এবং ট্যাক্সি অন্যদিকে ছুটুক।

ট্যাক্সি আবার শ্মশানের দিকে চললো। মমতা আবার বক্তৃতা সুরু করেচে।

—কবির কথা না ভাল লাগে, তোমাদের সেরা অভিনেতার কথাই শোন। তিনি বলেছিলেন আমায় নায়িকারূপে না পেলে তাঁর অভিনয় করাই চলবে না। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম দেড় হাজার টাকা দামের কাশ্মীরি শাল একখানা—সেও আছে; গেলে তোমায় দেখাতে পারতাম। আমার বাড়ীতে বসে তিনি যত কগ্‌ন্যাক ব্রাণ্ডি খেয়েচেন, তা' দিয়ে প্যারিসের মত সহরের রাস্তা পেছল করা যেত।

মমতার হাতের দামী আংটীগুলি অন্ধকারের মধ্যে তারার মত ঝলমল করচে। চুলের সুরভি যেন মনকে স্পর্শ করতে চায়। কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম কপালের রেখাগুলি তার কুটিল ও কঠিন হয়ে উঠেচে। আশ্চর্য্য!

বললাম, তাঁর জন্যে তোমার কষ্ট হয় এতটুকু?

মমতা খানিকটা চুপ করে থেকে বলে, তোমার সামনে বসে বসে একটা লোক যদি তিলে তিলে মরে, তোমার তাকে মনে থাকবে না? আমার মনে আছে, লীবারের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে উঠেচে তখনও তিনি গ্লাসের পর গ্লাস গলায় ঢেলেচেন। এক-একরাত্রে তাঁর সেই উন্মত্ত মুখ আমি দেখতে পাই···ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে হয় আমাকে!

তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্তি অনুভব করচি দেখে মমতা একটু অপ্রতিভ হয়েই বললে, আচ্ছা, ওঁর কথা যদি তোমার ভাল নাই লাগে, তা' হ'লে আর একজনের কথা বলি। ইনি কবি ন'ন, ব্যবসাদার ন'ন, অভিনেতাও ন'ন! বয়স আর কত হ'বে! বড় জোর ষোল। বিকালের পড়ন্ত রদ্দুরের মত অবসন্ন চেহারা; মুখখানি শিশির-ধোয়া গাছের পাতার মত শ্যামল! দেখেই বিরক্তি লেগেছিল। ছেলেটী বলেছিল,—'টেষ্ট দিতে বসে অঙ্কের পেপার দেখে মাথা ঘুরে গেল; খাতার উপর গৌরীশঙ্কর দে'র একটা কাল্পনিক ছবি এঁকে দিয়ে ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই বেরিয়ে এলাম। পথে পথে ঘুরে পায়ের শিরগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেচে।'

বললাম—তা এখানে কেন?

ছেলেটী বললে, রাগ করো না, একটু বিশ্রাম চাই। আমার ভবিষ্যৎ ত আজ অঙ্কের খাতার মধ্যেই মরে রইল, কিন্তু নিজের মরবার ইচ্ছে নেই একেবারেই!

একটু থেমে এবং হেসে মমতা বললে, ছেলেটীকে বিশ্রাম করতে দেওয়া ঘটে ওঠেনি, কেন না তখন আমি যাঁর প্রত্যাশা করচি তিনি কোথাকার রাজার ছেলে; সবে তাঁর বাপের মৃত্যু হয়েচে। ছেলেটী চলে যাবার খানিক পরেই মোটর সমেত তিনি এসে পৌঁছলেন। দু'জনে বেড়াতে বা'র হ'লাম।···তখনও খুব বেশী দূর যাইনি;—তিনি নিজেই মোটর হাঁকাচ্ছিলেন—হঠাৎ একজন চাপা পড়ল আমাদেরই গাড়ীর নীচে।

বললাম, যে চাপা পড়ল সে বোধ করি সেই রোগা ছেলেটী?

তাই বটে। কিন্তু আমাদের এতটুকু উপকার সে নিলে না। পুলিস আসতে বললে, কিছুই হয়নি আমার, নিজেই অন্যমনস্ক হয়ে চলছিলাম, আমারই দোষ।—আমি জানি, মোটর-চালকের দোষ তার চেয়ে কম ছিল না। তাকে ডাকলাম; বললাম, মোটরে করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি চলো।

একটু হেসে ছেলেটী বললে, ধন্যবাদ। তোমার এত বড় সৌজন্য আমার মনে থাকবে। সে হয় ত আমার কথা ভুলেই গিয়েচে, কিন্তু·····

বললাম, আরও আছে নাকি তোমার গল্প? আর আমাকেই বা এ'সব শোনাবার মানে কি?

মমতা বললে, সকল জিনিষের মানে খুঁজতে গেলেই গোল বাধে। স্বাধীন মন দিয়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগচে—এইটুকুই যথেষ্ট। কতকাল এমনি করে কথা বলা হয়নি! যাক, শোন। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতে ছেলেটী আবার এল। মুখে ক্রূর হাসি। পকেটে

হাত দিয়ে একমুঠো টাকা ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললো, এইবার বোধ হয়, আমায় বিশ্রাম করতে দিতে তোমার আপত্তি হ'বে না ?

একটা টাকা এসে লাগলো একেবারে আমার কপালের ওপর। এখনও তার দাগ মুছে যায়নি। আমার চাকর-চাকরাণী ছুটে এল, কিন্তু তাদের আমি নিঃশব্দেই বিদায় দিলাম। ভাবলাম, এ হয় ত সেদিনের প্রতিশোধ।

ছেলেটী চলে গেল ; আর সে আসেনি। টাকাগুলি কুড়িয়ে অনেকদিন আলমারীর মধ্যে রেখেছিলাম ; তার পর কি করে, কবে যে খরচ হয়ে গেল, তা আর মনে নেই !

মমতা হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠ্‌ল ! বললে, দোহাই তোমায়, যেন ভেব না যে আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম। শুধু তার অদ্ভুত ব্যবহারটাই আমার মনে আছে……

মমতা আবার অনাবশ্যক উচ্চতার সঙ্গে হাসতে লাগল।

—তোমার সঙ্গে আজ কোন ঘনিষ্ঠতা নেই, তাই এত কথা বলতে পারলাম। লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। যদি সময় পাও ত একদিন যেও।

আবার ও ঠিক সেই ভাবে হাসতে থাকে। সে-হাসির মধ্যে না-আছে ছন্দ, না-আছে প্রাণ ! মনে হয়, সৃষ্টির সরোবরে এরা যেন মূলহীন ফুল !—ভেসে চলেচে, কূলের মোহ তাদের নেই !

ট্যাক্সি থেকে নেমে যখন শ্মশানে পৌঁছলাম, তখন যে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটীকে দাহ করতে এনেছিলাম তার 'অস্থি' খুঁজে বার করবার জন্যে রাখরাম আর রাধু প্রাণপণে জলন্ত কয়লাগুলো হাতড়াচ্চে ……

* * * * *

পশ্চিমের এক অন্ধকার জরাজীর্ণ সরাইখানার মধ্যে বসে বুড়ো দীপকনারায়ণের মুখে তাঁরই জীবনের একটী পরিচ্ছেদ শুনচি—!

ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। বাইরে শীতের সন্ধ্যায় অকালে তুমুল বৃষ্টি নেমেচে ; নিম আর দেওদার শাখার সে কি ব্যাকুল কলরব !

দীপকনারায়ণ ছিলেন এককালে গানের আসরের উত্তেজনা ! পশ্চিমের এই দিকেই কোথায় তাঁর বাড়ী, কিন্তু থাকেন বাঙ্গলামুলুকেই বেশী। চুলগুলি তাঁর সাদা হয়ে গেচে, কিন্তু মনের বয়স তাঁর বাড়েনি।

এখানে তিনি তীর্থে আসেননি, এসেচেন হাওয়া বদলাতে।

মমতার জন্যে তাঁর মনের কোথাও হয় ত একটী ছায়াস্নিগ্ধ আসন ছিল—কে জানে !

বললাম, মমতার নিমন্ত্রণ রাখতে কোন দিন আর গিয়েছিলেন ?

দীপকনারায়ণ বললেন, একবার। গিয়ে দেখলাম পাগড়ী-পরা এক বিরাট মূর্ত্তি ; মমতা তার পাশে। চুলগুলি খুলে গেচে—কিন্তু সে-দিনের মত আবেগ নেই ! সত্যি সত্যি মদ খেয়েচে—। দরজার বাইরে থেকেই ফিরে এলাম। ভাবলাম, কত কথাই না এরা তৈরী করে বলতে পারে। সেদিন ট্যাক্সিতে যেন আর কাউকে দেখেছিলাম—

এখনও তিনি বেঁচে আছেন ?

—নিশ্চয়। ও বাঁচবে না ত বাঁচবে কে ! জীবনকে সে প্রতিটী দিক দিয়ে উপভোগ করেচে, প্রত্যেক অধ্যায়ে নূতন বিস্ময়। ভালবেসেচে যত, ঘৃণা করেচে তত এবং ভালবাসা পেয়েচে তেমনি অজস্র !

—কোথায় আছেন তিনি ?

দীপকনারায়ণ একটু হেসে বললেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়—শুনেচি। অবলা-আশ্রম, নার্সিং হোমগুলোকে মোটা মোটা টাকা দেয়। শেষ-দিন তা'র বাড়ী যাবার পর বার বচর পরে কামাখ্যার মন্দিরে যখন দেখা, তখন সে একপাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে খাওয়াতে বসেচে। দেখা হতে বললে, আমার কিছু টাকা তুমি নাও ; নইলে এ' বোঝা বয়ে আর বেড়াতে পারি না। আরও বলেছিল, এক-একদিন রাত্তিরে চোখের পাতায় ঘুম নামতে চায় না। প্রেতের মত অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়াই। সমস্ত দিনমানটা ঘুরে ঘুরে কাটে—কিন্তু রাত্তির ?—মদ না খেলে চলে না। তীর্থে ঘুরে, কাঙালদের খাইয়ে কি হ'বে ? আমার পা'বার আকাঙ্ক্ষা এখনও মেটেনি। কিন্তু মাথায় টাক পড়ে গেছে—মুখের কি কদর্য্য ছাপ ! ইচ্ছে করে এসিড্ ঢেলে পুড়িয়ে দিই !…এ সবকে তুমি কি মনে করো ?

কি উত্তর দেব ঠিক করতে পারি না। অবলা-আশ্রমকে সাহায্য করে, মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়িয়েও যার তৃপ্তি হ'ল না, মদ তাকে খেতে হয় কেন ?

বৃষ্টির অবিরাম বর্ষণের সঙ্গে ঝড়ো-বাতাস তখনও সমানভাবে চীৎকার করচে—

দীপকনারায়ণ বললেন, সে-দিন মমতা আরও বলেছিল,—সেই দামী শালখানা এক বুড়োকে দান করলাম হৃষীকেশে। মরক্কো বাঁধানো খাতাখানা হারিয়ে গেচে।…কিন্তু স্বপ্ন আমি আজও দেখি যে, একজন বসে বসে ভাত খাচ্চে, একটী ছেলের পায়ের ওপর দিয়ে আমাদের মোটর চলে গেল, রাত্রি জেগে আমার নামে আজও একজন কবিতা লিখচে—! আরও কত কি ! লোকে শুনলে আজ হাসবে ; তবু এ'সব আমার মনে হয় ; মনে হয়, আমার বয়স হয় নি, আমাকে মরতে হ'বে না…

খানিক স্তব্ধতার ভিতর দিয়ে কাটে।

দীপকনারায়ণ কণ্ঠস্বর হালকা করবার চেষ্টা করে বললেন, বিধাতা বড় হিসেবী লোক ভায়া, নিজেকে ফাঁকি দেবার উপায় কি !

অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে বসে ভাবি। এ কি শুধু বিধাতার হিসাবের নির্ভুলতা, শুধু অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব, আর কিছু না ?

যে স্খলিত-জ্যোতি মেয়েটী নিজের ক্লেদোক্ত, পরিচিত পৃথিবীকে ছেড়ে উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা করচে, অথচ পাঁক যা'র পা ছাড়তে রাজী নয়, তার জন্যে মনের মধ্যে নিঃশব্দ কাতরতা অনুভব করি।

মানুষের আত্ম-অভিব্যক্তি কা'কে বলে ? সে কি এই—?

বড় ঘর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

(একখানি মাটীর ঘর, অজয়ের ভাঙনের সম্মুখীন। ঘরখানির প্রতি গৃহস্বামীর অসাধারণ মমতা। উহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবহৃত প্রিয় নিকেতন, সামান্য সরল চিত্রকলায় সুসজ্জিত ও তাঁহার শৈশবের বাসগৃহ।)

(১)

জীর্ণ, প্রাচীন, তুচ্ছ অতি খড়ে ছাওয়া মাটীর ঘর,
এ কি দরদ উহার প্রতি, কি মমতা উহার 'পর !
শুক্ক ক'খান বাঁশের বাতা, তাহার লাগি এতই শোক,
কেবল কটা সিঁদুর-ফোঁটা সজল করে সবার চোখ্ ?
'বসুধারা'র মলিন ধারা, মোছা মোছা অলিম্পন
করছে আহা আপনহারা এ কি পাগল মানব মন !
গরিবের ওই বাস্ত-ভিটা দারুণ অজয় ভাঙবে কাল,
একেবারে ভাঙবে দীনের 'ভার্টিকান' ও রঙমহাল।

(২)

শৈশবেরি দোলন-দোলা, ঝুলন-ঝোলা যৌবনের,
পুণ্যস্মৃতি, প্রণয়-গীতি তুলসী ও মৌ-বনের,
ভাঙবে মণিকর্ণিকা ঘাট, ভাঙবে চক্রতীর্থ যে,
যায় দরিদ্রের ছত্র চামর ব্যাকুল করে চিত্তকে।
সুখের দুখের শিলালিপি, আনন্দের ওই অজন্তা
কাল যে উহার পড়বে ভেঙ্গে, বুঝবে বল ক'জন তা !
ভাঙন-ধরা মাটীর পরে দেখছ না ওর কি শ্রদ্ধা,
ও-ঘর উহার এক সাথেতে পঞ্চবটী অযোধ্যা।

(৩)

প্রতি রাঙ্গা মাটীর লেপে কান্না-হাসি জড়িয়েছে,
উৎসবেরি উল্লাস রস ওই মাটীতে গড়িয়েছে,
আধেক ছায়া আধেক কায়া আধেক কথা আধেক গান,
স্বর্গ আধেক মর্ত্ত আধেক, ওই সে উহার গৃহখান।
ও কি শুধু ভগ্ন দেয়াল, ও কি শুধু খড়ের ঘর,
ও যে উহার দেবের দেউল, বাসর, ভবন একত্তর।

নিখিল প্রবাহ

পৃথিবীর বৃহত্তম লরী—

'লরী' জিনিষটা ইদানিং এত বেশী প্রচলিত হয়েচে যে নূতন করে তা'র পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু

পৃথিবীর বৃহত্তম লরী

এই লরী যে আকারে কত বড় হ'তে পারে সে ধারণা হয় ত অনেকেরই নেই। এখানে যে লরীর ছবি দিলাম, সেটী আকারে এত বড় যে লরী-চালকের লরী-রক্ষকের সঙ্গে কথা কইতে হ'লে টেলিফোন ব্যবহার করতে হয়। লরীর শেষাংশে রক্ষকের একটী স্বতন্ত্র ঘর রয়েচে, ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যাবে। এই লরীটিকে কোন দিন দিনের বেলায় পথে বার করতে দেওয়া হয় না; কেন না, তা হ'লে অন্যান্য যান-বাহনের সঙ্গে তা'র সংঘর্ষ অনিবার্য্য। পশ্চাতের গাড়ী-ঘোড়াগুলিকে সাবধান করবার জন্তেই রক্ষকের ঘরের ব্যবস্থা।

সম্প্রতি এই অতিকায় লরীটি লিবারপুল থেকে ওয়াকিংএ একটী প্রকাণ্ড বয়লার বহন করে নিয়ে গেচে।

নাদিরশাহের স্মৃতি—

পারস্যের দিগ্বিজয়ী বীর নাদির-শাহের কথা ভারতবর্ষের অধিবাসীর কাছে নূতন করে বলবার প্রয়োজন নেই। বিপুল, বিস্তৃত মরুভূমি পার হয়ে এসে তিনি ভারতবর্ষের বুকে অত্যাচারের স্রোত বইয়েছিলেন, তাও লোকে স্মরণ করে রাখবে। মোগলদের বিরুদ্ধে সেই অভিযানের সময়, তাঁর সৈন্যদল যাতে সীমাহীন মরুভূমির মাঝখানে পথ হারিয়ে না ফেলে তারি জন্যে সেখানে তিনি এই স্তম্ভটী তৈরী করিয়েছিলেন। দীর্ঘকালের ঝড়ঝাপটা সহ্য করে এই বিরাট স্তম্ভটী আজও দাঁড়িয়ে আছে মরুভূমির মাঝখানে—সুদূর অতীতের একটী ভয়াবহ স্মৃতির মত। কিন্তু বর্ত্তমান

নাদির শাহের মরু-স্মৃতি

কালে এই স্তম্ভটী লোকের কাজে লাগচে। মোটরে করে যাঁরা মরুভূমি দেখতে যান তাঁরা এইটী দেখেই দিক নির্ণয় করেন।

উড্ডীয়মান রাসায়নিক পরীক্ষাগার—

অধ্যাপক পিকার্ড ব্রাসেলস-বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। উভয়বিধ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে বহু পূর্ব্বেই তিনি খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেচেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেচেন, তা'তে তিনি সকলকেই বিস্মিত করবেন।

অ্যালুমিনিয়াম-আচ্ছাদিত বেলুন। মাঝখানে অধ্যাপক পিকার্ড

পৃথিবী থেকে দশ মাইল উপরে শূন্যের আবহাওয়া কি রকম, আলোর বৈশিষ্ট্যই বা সেখানে কি রকম, তাই পরীক্ষা করবার জন্যে সম্প্রতি তিনি একটী বেলুন তৈরী করিয়েচেন। বেলুনটীর উপরিভাগ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী। আর ভিতরে রয়েচে একটী বিরাট রাসায়নিক পরীক্ষাগারের উপযোগী যন্ত্র-পাতি, বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম। বেলুনের ভিতরে বসেই যাতে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, তার ব্যবস্থা করতেও ডাক্তার পিকার্ড ভোলেন নি। বেলুনে যাতে কোন রকমে আগুন না লাগতে পারে তা'র ব্যবস্থাও করা হয়েচে।

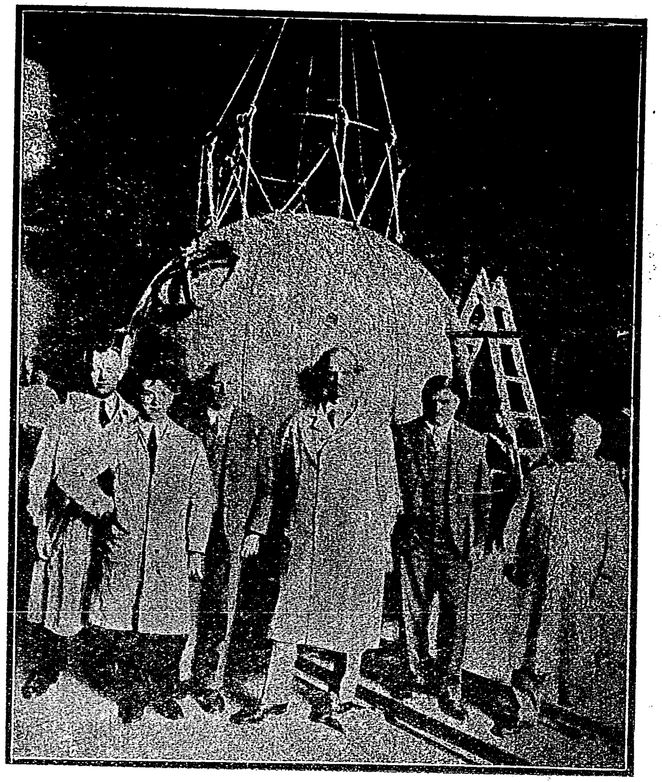

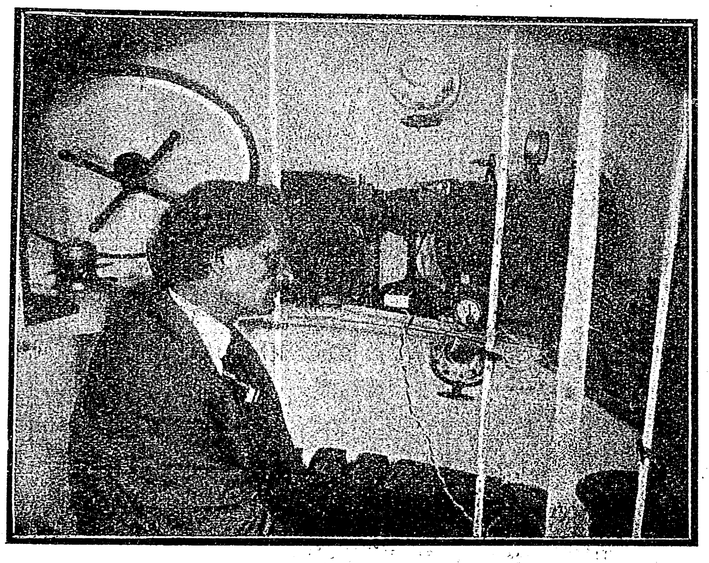

বেলুনের অভ্যন্তরে অধ্যাপক পিকার্ড

বৈজ্ঞানিকরা বলচেন যে এই বেলুনটাই জগতের প্রথম উড্ডীয়মান রাসায়নিক পরীক্ষাগার।

পোলাণ্ডের জোন অফ আর্ক—

যুদ্ধের পর রাশিয়া যখন পোলাণ্ড আক্রমণ করে, তখন পোলাণ্ডের ভীষণ দুর্দ্দিন। তখনও একটা যুদ্ধের ভয়াবহ

পোল্যাণ্ডের জোন অব আর্ক

স্বপ্ন তার চোখ থেকে মুছে যায় নি, এমনি সময় রাশিয়া করল পোলাণ্ড আক্রমণ। সেই দুর্দ্দিনে 'মৃত্যু-বাহিনী' গঠন করে যে বীর-রমণী পোলাণ্ডের সাধারণ সৈন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে শত্রু-পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তাঁর নাম লেফটেনাণ্ট সোফি স্লিপলভরণ ডি নওমিলাকা। সেদিন লেফটেনাণ্ট সোফী যে কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা যে-কোন পুরুষের পক্ষেও গৌরবের বস্তু।

সম্প্রতি তিনি আমেরিকা পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। ভ্রমণের সময় তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা করেন। সোফী যখন সানফ্রানসিস্কোয় আসেন, আমরা তখনকার একটী ছবি দিলাম।

চার্লির নূতনতম ছবি—

এই অদ্ভুত টুপী, পায়জামা, ছেঁড়া জুতো, আর ছোট্ট এতটুকু গোঁফ-পরা লোকটীকে ছায়াচিত্রানুরাগীদের মধ্যে জানে না কে! সুতরাং নূতন করে এঁর পরিচয় দেবার চেষ্টা করলো না। তাঁর নূতনতম ছবির সম্বন্ধেই দু'একটী কথা বলব।

'সিটী লাইট্‌স' চার্লির এই বইখানির নাম। চার্লির আধুনিক বইগুলি যিনি একটু ভাল করে লক্ষ্য করেচেন, তাঁদের বুঝতে হয় ও বাকী নেই যে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠতম হাস্যরস-কুশলীর সমস্ত রঙ্গ-ব্যঙ্গের আড়ালে বেদনার একটী নিঃশব্দ ফল্গুস্রোত আত্মগোপন করে থাকে। এদিক দিয়ে চার্লি দার্শনিক এবং সেই জন্যেই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে তাঁকে একাসন দিতে সে দেশের লোক কুণ্ঠিত নয়। যাই হ'ক, 'সিটী লাইট্‌সে'ও ঠিক এমনি হাসি ও অশ্রুর সমন্বয় দেখতে পাওয়া যাবে।

চার্লির আর একটা বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ছবিতে সম্পূর্ণ

নূতন একটী মেয়েকে নায়িকার গৌরব দান করা। সিটী লাইট্‌সেও তা হয়েচে। ছবিতে যে মেয়েটী চার্লির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েচে, সেই এবারের চার্লির আবিষ্কার।

"সিটি লাইটস্" ছায়াচিত্রে চার্লি চাপলিন ও মিস চেরিল

মেয়েটীর নাম ভার্জিনিয়া চেরিল। সিটী লাইট্‌সের অন্ধ নায়িকা সেই।

দ্বিতল ট্রাম—

বাসের আবির্ভাবের ফলে ট্রামের অবস্থা কেবল যে এই দেশেই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেচে তা মনে করবার কোন কারণ নেই। লণ্ডনের মত বড় সহরেও ট্রামের অবস্থা নাকি ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছিল। এর প্রতিকার করবার জন্যেই সম্প্রতি পুলম্যান কোম্পানী লণ্ডন সহরে দ্বিতল ট্রাম আমদানি করেচেন। দ্বিতল করবার জন্যে ট্রামগুলিকে আগাগোড়া ইস্পাত দিয়ে, মজবুদ ভাবে তৈরী করতে হয়েচে। আফিসের সময়েও যাতে লোককে বেশী

দ্বিতল ট্রাম

কষ্ট সহ্য করতে না হয় তার ব্যবস্থাও করা হয়েচে। ট্রামগুলির দুই পাশেই ওঠা-নামার দ্বার আছে।

যন্ত্রের সাহায্যে মুখের গঠন পরিবর্ত্তন—

বিধাতা মানুষকে মুখের যে-গঠন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান, তা' নিয়েও মানুষ আজ আর সব সময়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারচে না। বিজ্ঞানের হাজার রকম উন্নতির ফলে তার মনে ধারণা জন্মে গেচে যে ঈশ্বরের সৃষ্টির উপরেও মানুষ উন্নতি-সাধন করতে পারে এবং সে ধারণা তার অকারণ নয়। য়ুরোপের নানা দেশেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মুখের ত্রুটী-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করবার চেষ্টা চলচে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ফলও হচ্চে।

য়ুরোপের চেয়ে আমেরিকার ছেলে-মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি বেশী। কাজেই তারা অত্যন্ত ঘন ঘন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু এই কাজটী অত্যন্ত অল্প-ব্যয়-সাধ্য এ কথা মনে করলে ভুল হ'বে।

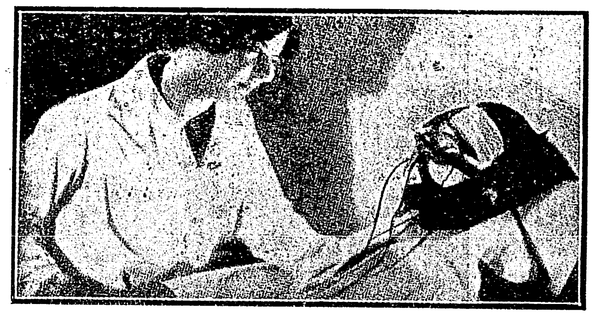

মুখের গঠনের পরিবর্ত্তন

এই ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্যে প্রতি বার এক একজনকে তিন শত পাউণ্ড পর্য্যন্ত খরচ করতে হয়।

ছবির পটে শিম্পাঞ্জী—

সম্প্রতি হলিউডের কোন ছায়াচিত্র-প্রতিষ্ঠান 'ছোট্ট ঢাকা মালগাড়ী' বলে একটী ছবি তুলেচেন। ছবিটীর বৈশিষ্ট্য, এতে একটীও মানুষকে অভিনয় করতে হয় নি। অভিনয় করেচে একদল শিম্পাঞ্জী। এদের কীর্ত্তিকলাপেই ছবিখানির আদ্যন্ত পরিপূর্ণ। অসভ্য শিম্পাঞ্জীদের হ্যাট-কোট-টাই পরিয়ে ছবিখানিতে যে ভাবে অভিনয় করান হয়েচে, তাতে বাস্তবিকই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এতে তারা [illegible] ছুড়েচে,···সভ্য মানুষদের মত 'বারে' বসে মদ খেয়েচে, টেলিফোনে আর একজনের সঙ্গে কথা কয়েচে। আধুনিক কালের উপযোগী এই সব কায়দা-কানুন তা'দের শেখাবার জন্যে প্রয়োগ-কর্ত্তাকে রীতিমত শ্রম-স্বীকার করতে হয়েচে। ছবিটীর আর একটী বৈশিষ্ট্য যে এটী নীরব নয়, মুখর। অবশ্য, শিম্পাঞ্জীরাই কথা বলেনি; তাদের বদলে মানুষকেই এই কাজ করতে হয়েচে। কিন্তু, তা'তে ছবিটীর দাম বেড়েচে বই কমেনি।

এখানে আমরা উপরিউক্ত বইখানির ছুটী ছবি দিলাম। একটীতে এক শিম্পাঞ্জী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন-কার্য্যে ব্যাপ্ত; অপরটীতে এক শিম্পাঞ্জী টেলিফোন 'রিসিভ' করচে।

প্রসাধন-নিরত শিম্পাঞ্জী

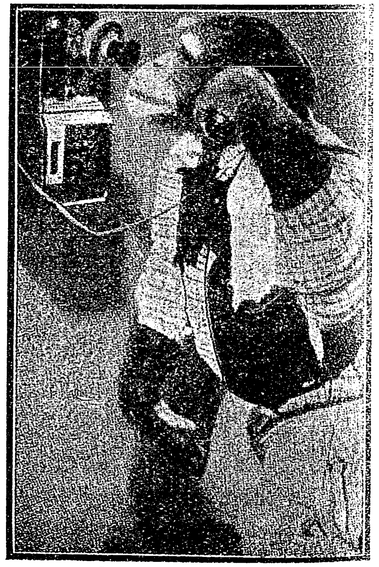

শিম্পাজী টেলিফোন 'রিসিভ' ক'রচে

আধুনিক পারস্য—

ইটালীকে যেমন মুসোলিনী সম্পূর্ণ নূতন করে গড়েচেন, পারস্যের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য ঠিক ততখানি চেষ্টাই করচেন শাহ রিজা খাঁ। প্রাচীন-পন্থী পারস্য বর্ত্তমানে শাহ রিজা খাঁর মন্ত্রগুণে সম্পূর্ণ আধুনিক হয়ে উঠেচে। তার পথঘাট, পোষাক-পরিচ্ছদ, সব কিছুতেই এমন একটা নূতনত্ব দেখা দিয়েচে, যা কিছু কাল পূর্ব্বে লোকে ধারণাও করতে পারত না। এখানে আমরা তেহেরাণ সহরের টেলিগ্রাফ-অফিসের দ্বারোদ্ঘাটনের সময়ের ছবি দিলাম। এই দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে পথে যে জন-সমারোহ হয়েচে তা'ও যেমন পারস্যে প্রচলিত ছিল না, তেমনি টেলিগ্রাফ কার্য্যালয়ের বাড়ীটির মধ্যেও পারস্যের দেশীয় বৈশিষ্ট্যের কোন পরিচয়ই নেই।

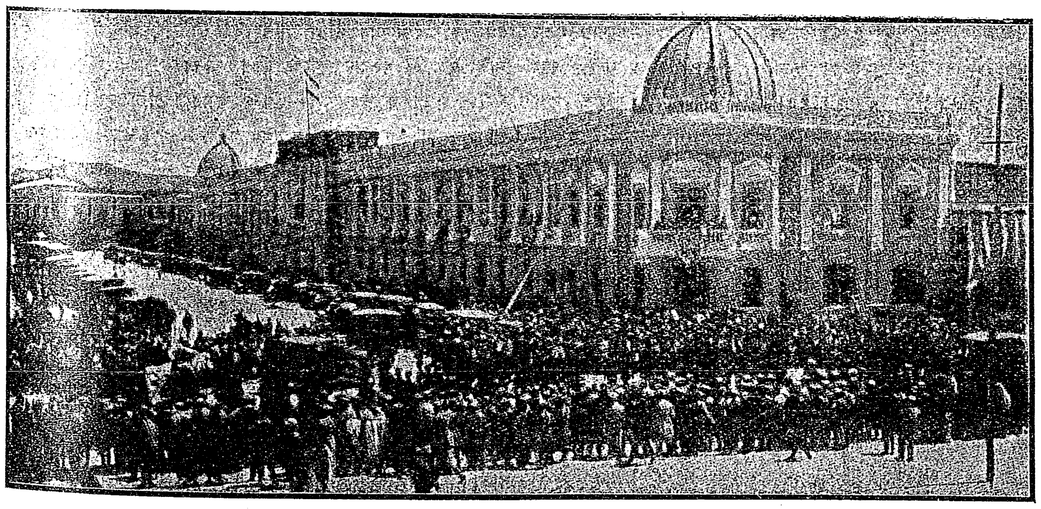

বিচিত্র রঙ্গশালা

তেহেরাণের টেলিগ্রাফ আপিস—পারস্য-পতি শাহ রিজা খাঁ সম্প্রতি এই নবনির্ম্মিত অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটন করেচেন

বিচিত্র রঙ্গশালা—

১৯৩৩ সালে শিকাগো সহরে এক বিরাট প্রদর্শনী হ'বে এবং তার নাম হ'বে 'বিশ্ব-প্রদর্শনী'। এই প্রদর্শনীকে উপলক্ষ করে সেখানে একটী বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হ'চ্চে। রঙ্গমঞ্চটী একটী হ্রদের বুকে জলের উপর ভাসতে থাকবে এবং তার উপরে কোনরকম আচ্ছাদন থাক্‌বে না। রঙ্গমঞ্চটী যাতে ভাসতে ভাসতে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে চলে না যায় তার জন্যে অনেকগুলি লোহার শিকল দিয়ে সেটীকে তীরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হ'বে। অভিনয়-মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগারের মধ্যে থাকবে জলের ব্যবধান। খুব কম করে দু'হাজার দর্শক প্রেক্ষাগৃহে স্থান পাবেন। প্রেক্ষাগার এবং অভিনয়মঞ্চের মধ্যে যে ব্যবধান হ'বে তা ৬৩ ফীট। নৌকায় করে দর্শকদের অভিনয় দেখতে যেতে হ'বে। নৌকাগুলি কাছাকাছি বেঁধে রাখবার ব্যবস্থাও থাকবে। সমস্ত রঙ্গশালাটী দৈর্ঘ্যে হ'বে ৪৬৮ ফীট এবং চওড়ায় ৬৩২ ফীট।

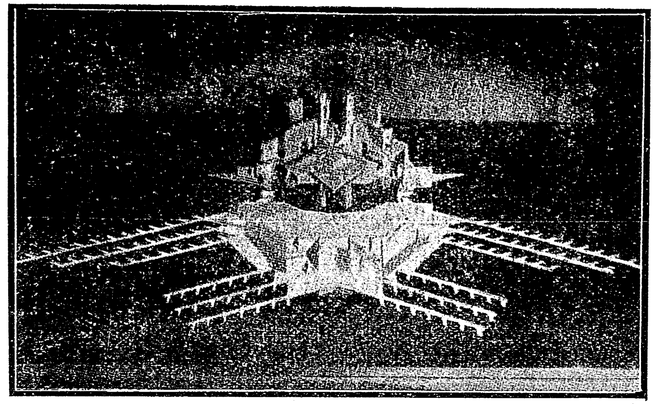

বিবিধ-প্রসঙ্গ

সমাজ, দারিদ্র্য-সমস্যা ও স্ত্রী সমস্যা

পঞ্চম প্রবন্ধ

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল

সন ১৩৩৭ সালের আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে দ্বিতীয় প্রবন্ধে জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার বাকী রহিল—বলি। এখন তাহা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই প্রবন্ধটী তৃতীয় প্রবন্ধ হওয়াই উচিত ছিল। নানা কারণে ইহা তৎকালে লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, সেই ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমাদের এই জাতিভেদ প্রথা পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে দেখা যায় না। এবং তন্নিমিত্ত সকলেই ইহা অতীব দোষণীয় বলিয়া থাকেন এবং ইহা আমাদের বহুকাল ধরিয়া রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার কারণ বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু যেমন এক দিকে দেখি যে আমরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে অন্য কোন সভ্য জাতির তুলনায় হীন নহি, তথাপি বহু শতাব্দি ধরিয়া আমরা পরাধীন,—এরূপ সভ্যজগতে আর কোথাও দেখা যায় না—আবার আর এক দিকে দেখিলেও ইহাও অকাট্য সত্য যে ভারতীয় সভ্যতার মতন এত দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতাও পৃথিবীতে কুত্রাপি কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এবং এতকাল এতরূপে বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ উত্থান হইতে দেখা যায় নাই—এবং এত অধিক শতাব্দি ধরিয়া কোন সমাজই সভ্যতায় অগ্রণী হইয়া থাকে নাই। সুতরাং শুধু আমাদের পরাধীনতা দেখিয়া যেমন ইহা আমাদের অধঃপতনের কারণ বলা যাইতে পারে তেমনিই আবার ইহা আমাদের বহু বৎসর ধরিয়া সভ্যতার অগ্রণী থাকিবার মূল কারণ ও আমাদের সভ্যতার সঞ্জীবনী শক্তির মূল উৎস ইহাতে নিহিত আছে তাহাও বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে ও বৌদ্ধযুগে জাতিভেদ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আবার ইহার স্থাপনা হইয়াছে। যদি জাতিভেদ প্রথা বাস্তবিক অত্যন্ত অনিষ্টকারী হয় এবং ইহা উঠিয়া গেলে—উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়, গরীবদের ও সাধারণ লোকদিগের সুবিধা হয় তাহা হইলে ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত। মুসলমান সভ্যতার প্রবল বন্যার মুখে সকল সভ্যতাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কেবল ভারতবর্ষ তাহার প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। সুতরাং শুধু আমাদের বহুকালের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার নিমিত্ত জাতিভেদ প্রথাকে দোষণীয় সাব্যস্ত করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের সংস্কারকেরা ও তরুণ ও তরুণীরা যেন এই রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই জাতিভেদ প্রথার দোষের অকাট্য প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ধরিয়া লওয়া ন্যায়শাস্ত্রসম্মত নয়। এখন ইহার প্রকৃত দোষ গুণ কি তাহার বিচার করা আবশ্যক।

আজকাল প্রধানতঃ সাম্যবাদের দোহাই দিয়াই জাতিভেদ প্রথাকে দোষাবহ বলা হয় ও তজ্জন্য ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিকাশের ও উন্নতির প্রতিবন্ধক বলা হয় ও ইহা নীচজাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার বলা হয়। এখন প্রথমে দেখা যাউক এই সাম্যবাদটার প্রকৃত অর্থ ই বা কি ও ইহা সর্ব্বস্থলেই প্রযোজ্য কি না ও ইহার প্রয়োগ কোন কোন স্থলে সীমাবদ্ধ করিতে হয় কি না এবং কেনই বা এইরূপ সীমাবদ্ধ করিতে হয়। সাম্যবাদের মানে কি সকলেই সমহারে একই জিনিষ খাইবে একই রকম কর্ম্ম করিবে, একই রকম কাপড় চোপড় পরিবে, একই রকম বাড়ীতে থাকিবে? তাহা তো নয়। যাঁহারা সর্ব্ব-অধিক পরিমাণে সাম্যবাদের প্রয়োগ করিতে চাহেন—রুষিয়ার তুল্যাধিকারবাদীরা তাঁহারাও "সকলের সমান আয় থাকা উচিত" ইহার ঊর্দ্ধে যাইতে চেষ্টা করেন নাই এবং এই মতবাদ কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখিলেন তাহাতে সমাজ বা রাজত্ব অচল হয়—গুণ ও ক্ষমতার তারতম্যের নিমিত্ত আয়ের পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী হয়। সংসারে অনভিজ্ঞ তরুণ তরুণীদের কাছে এই সহজ কথাটীও একটু বুঝানো আবশ্যক। যদি রাস্তায় বাহির হইয়া যত লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একশ জনকে তাহাদিগকে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া পাইবে তাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং ২ বিঘা জমি দেওয়া যায় তাহা হইলে কেহ বা সেই টাকায় ভাল আহার পরিচ্ছদাদি করিবে—কেহ বা তাহা হইতে নানান বীজাদি কিনিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় শস্যাদি উৎপাদন করিবে—কেহ গান-বাদ্যের চর্চ্চা করিবে—কেহ বা পুস্তকাদি কিনিবে। কেহ বা কেবলমাত্র সঞ্চয় করিবে—কেহ বা বিবাহ করিবে—এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহাদের ভিতর আয়ের অনেক পার্থক্য দাঁড়াইয়া যাইবে। সকলের একই আয় থাকা নিয়মটি প্রবর্ত্তিত রাখিতে হইলে যে পরিশ্রম করিয়া উহা বাড়াইল তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্য অপরিশ্রমী লোকদিগকে দিতে হয়। তাহা করিলে সে আর পুনরায় ওরূপ পরিশ্রম করিতে চাহিবে না—তাহাতে লোকদিগের শ্রম-পরাঙ্মুখতা বাড়াইবে।—উদ্ভাবনী শক্তির হ্রাস হইবে—দেশের ঘোর অমঙ্গল সাধিত হইবে। সকল কার্য্য সম্যক চালান অসাধ্য হয়; সেইজন্যই ক্রমেই অধিক পরিমাণে আয়ের তারতম্য হইতে দিতে রুষিয়াও বাধ্য হইতেছেন এবং এখনই অনেক তারতম্য হইয়াছে। অন্য কুত্রাপি এরূপ সমান আয় থাকার চেষ্টাও হয় নাই। তবে কোন

সমাজতত্ত্ববিদই আয়ের বিশেষ অধিক তারতম্য হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। আজকাল ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে যেরূপ ভয়ানক তারতম্য—এক দিকে কুবেরের ধন ও অন্য দিকে সমস্ত দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া বা করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও জীবনধারণোপযোগী আহার্য্যেরও অভাব, ইহা একান্ত দোষণীয়, এবং যাহাতে সেরূপ হইতে না পায় তাহা করা বিধেয় বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। সেইজন্য রুষিয়া ছাড়া অন্য সর্ব্বত্র সাম্যবাদের প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়াইয়াছে যে সকল লোকেরা তাহাদের নিজেদের জীবিকার নিমিত্ত বা উন্নতিকল্পে যে কার্য্য করিতে চাহে তাহা করিবার সুযোগ বা সুবিধা যেন সকলে সমভাবে পায় (equality of opportunity)। মুষ্টিমেয় তুল্যাধিকারবাদী ছাড়া অধিকাংশ যাঁহারা আমাদের জাতিভেদ প্রথার দোষ দেন তাঁহারা যে সাম্যবাদের দোহাই দিয়া আমাদের সমাজ গঠনের দোষ দেন তাহা নহে, তাঁহারা এই কর্ম্ম করিবার সমান সুযোগ না দেওয়ার নিমিত্তই দোষ দেন। এই সমান সুযোগ মতবাদটি শুনিতে বেশ ও ন্যায্য বলিয়াই বোধ হয়। এবং এই জন্যই আমাদের জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগত জীবিকোপায় ও স্ত্রীলোকদিগকে সচরাচর কোন অর্থকরী কার্য্য করিতে না দেওয়ায় আমাদের সমাজ গঠনের নিন্দা করা হয়। এই মতবাদীর মূলে সকলেই সমান ক্ষমতাপন্ন—সকল কার্য্য সমভাবে করিবার শক্তি আছে এইটি নিহিত রহিয়াছে—সেরূপ ধরিয়া না লইলে এই মতবাদটি অস্বীকার করা অন্যায় হয় না। সকল মানুষ যে সমান নয়—কি দেহবলে, কি রূপে, বুদ্ধিতে—তাহা সকলেই দেখিতেছেন। সুতরাং এই মতবাদের গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। এই জন্য পৃথিবীর কুত্রাপি লোকেরা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিবার সুযোগ সমভাবে পায় না—এবং যে সকল পাশ্চাত্য দেশে এই সাম্যবাদ প্রচারিত সেখানেও কার্য্যতঃ পায় না। প্রথমতঃ—সকল সভ্য দেশেই কার্য্য-সকল সুসম্পাদিত হইবার নিমিত্ত সেই সেই কার্য্য করিবার—কতকগুলি আবশ্যকীয় গুণ আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া তবে সেই সকল কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। যেমন সকল লোককে ডাক্তারী করিতে দেওয়া হয় না। এমন কি অনেক স্থলে পরীক্ষা দিতেও সকল লোককে দেওয়া হয় না—বয়স, স্বাস্থ্য, কতক প্রাথমিক শিক্ষা গুণ বা বিদ্যা আছে কিনা—তাহা দেখিয়া তবে পরীক্ষা দেওয়ারই অনুমতি দেওয়া হয়। অনেক দেশে—যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও জার্ম্মানীতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া তবে তাহাদের কর্ম্ম করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। মনে রাখিতে হইবে এই সকল পরীক্ষা অব্যর্থ নয়—অনেক স্থলে যথার্থ উপযুক্ত লোকদিগকেও পরীক্ষার দোষে কর্ম্ম করিবার সুযোগ বা সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়। সকলের সুবিধা বা মঙ্গলের জন্য বা অহিত বা প্রকৃত নিষ্ঠুরতা নিবারণ করিবার জন্য, বৃথা চেষ্টা ও সময়ের অপব্যয় নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল নিয়ম করিতে সকল সমাজেই বাধ্য হয়। দেখা গেল দেহের সামর্থ্য ও মানসিক শক্তির তারতম্য আছে বলিয়াই, সকলেই সকল কার্য্যে সমান পারগ নয় বলিয়াই, সাম্যবাদের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিতে হয়। এই ত গেল স্বাভাবিক শক্তির তারতম্যের নিমিত্ত সাম্যবাদের কার্য্যতঃ সীমাবদ্ধতা, তাহার উপর সেই সাম্যবাদ প্রচারক পাশ্চাত্যদেশে, সাম্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, অর্থের তারতম্যের নিমিত্ত সর্ব্বত্র সীমাবদ্ধতা আছে। পাশ্চাত্যে গরীবদের কোন কর্ম্মই করিবার অধিকার কার্য্যতঃ নাই—কোন বিদ্যা বা কর্ম্ম শিখিবার উপযোগী অর্থ না থাকিলে গরীবরা কোন কর্ম্মই কোন বিদ্যাই শিখিতে পায় না—এমন কি কোন ব্যবসাও করিতে কার্য্যতঃ পায় না—যদি সে কোন অর্থবান ব্যক্তির সহায়তা না পায়। অধিকাংশ স্থলেই সেই অর্থবান ব্যক্তি সেই কার্য্যে যে লাভ হইবার সম্ভাবনা বা প্রত্যাশা আছে তাহার স্বল্পাংশ সেই গরীবকে দেন, বক্রী সমুদয়ই তিনি গ্রাস করেন ও তদ্দ্বারা আরও অধিক ধনবান হন। পাশ্চাত্যে এখন এমন হইয়াছে যে কোন ব্যবসাই অনেক মূলধন না থাকিলে চলে না—সুতরাং দরিদ্রদিগের সকল দ্বারই রুদ্ধ। কদাচ কখন সামান্য অবস্থার লোকেরা কোন বিশেষ অনুকূল আবেষ্টনীর সাহায্যে বড় হইতে পায় এবং তাহাদের জীবনের কাহিনী চতুর্দ্দিকে জাহির হইতে দেখিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত নয় যে তথায় গরীবরা সকলেই এইরূপ বড় হইতে সুবিধা পায়। এই যে পাশ্চাত্যে রোজ রোজই এত জীবনচরিত পুস্তক বাহির হয়—তাহার অধিকাংশই কেবল হীন অবস্থা হইতে সে কেমন উন্নত ও অর্থশালী হইয়াছে তাহার বিবরণে পূর্ণ—সে পৃথিবীর উন্নতির পথ কোন অংশেই মুক্ত করে নাই—পরের জীবনের দুঃখ কষ্ট কিছুই নিবারণ করে নাই—অধিকাংশ স্থলে অনেককে পদদলিত করিয়া নিজের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়াছে। এইরূপ জীবন-চরিত কেন লেখা হয়? কেনই বা লোকে এই সকল জীবনচরিত পড়ে? হীন অবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থা পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য বলিয়াই লোকে দেখিতে চায় কেমন করিয়া সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি এইরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল—সেই জন্যই এরূপ জীবন-চরিত লেখা ও পড়া হয় ও তাহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে সেরূপ উন্নতি অতি অল্প লোকই করিতে পারে। সাম্যবাদটা যে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়, তাহার কারণ গরীবরা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টায় বা নিজের কোন বিশেষ শক্তি বিকাশের চেষ্টায় যেন বাধা না পায়। যদি কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় লোক এই সাম্যবাদ প্রচারের ফলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে তাহা হইলে সাধারণ লোকেদের তাহাতে কি আসে যায়? তাহারা যে তিমিরে—সেই তিমিরে রহিয়া যায়। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক বিধি-নিষেধ অধিকাংশ লোকেদের মঙ্গলের জন্য করা বিধেয়—এ স্থলে প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পায় না দেখা গেল। বরং ইহার ফল ঠিক বিপরীত হইয়াছে। ধনবান ব্যক্তিরা নানান রকম ব্যবসা করিয়া, নির্ধনদিগকে খাটাইয়া, তাহাদের বুদ্ধি কর্ম্ম ক্ষমতার সাহায্য লইয়া, লাভের স্বল্পাংশ দিয়া, নিজেরা কেবল ধনের বলেই—বিদ্যা বুদ্ধির বলে নয়—আরও বহু ধনী হইতেছে—সকল ব্যবসা বাণিজ্য গ্রাস করিতেছে—অল্পধনীদের সেই সকল কর্ম্ম ও ব্যবসাক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতেছে ও তাহাদের উন্নতির পথ প্রকারান্তরে রুদ্ধ করিতেছে—ধনের অসাম্য বাড়াইয়া, বিলাস ভোগ আতিশয্য দেখাইয়া, গরীবদের জীবন অধিকতর অশান্তিময় করিতেছে—দুর্ব্বিষহ করিতেছে। অপেক্ষাকৃত গরীবরাও তাহাদের দেখাদেখি

অধিকতরভাবে গৌণ অভাবগ্রস্ত হইতেছে ও তজ্জন্য জীবনের মুখ্য অভাব—স্বামী স্ত্রী পুত্রাদির ভালবাসা পাইবার ও ভালবাসিবার যে প্রকৃতি-গত টান আছে তাহা বলি দিতে একরূপ বাধ্য হইতেছে। সাম্যবাদ প্রচারক পাশ্চাত্য দেশেই গরীবদিগকে বিবাহ করিতে নিষেধ করেন—অপত্যোৎপাদন করিতে নিষেধ করেন—গরীবদের অপত্যোৎপাদন দোষণীয় বলেন—হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলেন। কিন্তু হৃদয়হীনতা কাহার? জীব মাত্রেরই প্রজনন করিবার ক্ষমতা আছে—যন্ত্রে প্রায় সকল কার্য্যই করিতে পারে—কিন্তু প্রজনন করিতে পারে না—জীবের ও যন্ত্রের পার্থক্য এই প্রজনন ক্রিয়ায়। অথচ এই সাম্যবাদীরাই, যাহারা গরীবদের সহিত সহানুভূতিতে সদাই বাষ্পাকুলনেত্র, তাহারাই গরীবদিগকে জীবত্বের অঙ্গীভূত প্রজনন ক্রিয়া নিষেধ করেন—উহা যে তাহাদের উপর ভীষণ নির্য্যাতন—তাহাদের সহিত এতই প্রকৃত সহানুভূতিহীন যে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইহাতে যে তাহাদিগকে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—যে "তোদের টাকা নাই—তোরা আমাদের ধন বৃদ্ধির ও বিলাসাতিশয্য যোগাইবার সহায়তা কর—আমাদের বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানায় যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া খাটিয়া মর" তাহা তাহাদের দেখিবারও শক্তি নাই। একে তো বড় বড় যন্ত্র সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করায় শ্রমিকদিগের কর্ম্ম আনন্দহীন হইয়াছে—আবার জীবত্বসূচক প্রজনন ক্রিয়াও বন্ধ করিতে বলেন—স্ত্রীলোকদিগের মাতৃত্বের অঙ্গ সকল নিষ্ক্রিয়তা হেতু শুষ্ক (Atrophied) করিতে বলেন—মাতৃত্বের প্রকৃতিজ আকাঙ্ক্ষাও নিরুদ্ধ করিয়া জীবনও শুষ্ক ও আনন্দহীন করেন। পুরাকালের ক্রীতদাস-দিগকেও অধিকাংশ দেশে এরূপ নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে হয় নাই। ক্রীতদাসেরা প্রভুদের অত্যাচার ও হুকুম যেরূপ সসম্মানে অবনত মস্তকে সহ্য করিত—পাশ্চাত্যে গরীবদের উপর এইরূপ অত্যাচার করে বলিয়া—আমাদের তরুণ তরুণীরা সেই অত্যাচার অবনত মস্তকে সহিতে প্রস্তুত ও গরীবদিগকে সহিতে বলিতেছেন। ধন্য পাশ্চাত্যের মোহ! ধন্য সাম্যবাদ নাম মাহাত্ম্য!! যাহাতে গরীবরাও তাহাদের জীবত্বসূচক প্রজনন ক্রিয়া (শুধু কাম উপভোগ নয়) হইতে বঞ্চিত না হয়—স্বামী স্ত্রী পুত্রাদিকে ভালবাসিয়া ও তাহাদিগের ভালবাসা পাইয়া জীবন যে সরস ও প্রফুল্ল থাকে—অশেষ দুঃখ দারিদ্র্য সত্ত্বেও জীবন উপভোগ্য থাকে—সেই নিমিত্তই আমাদের একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা ও জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসা—এবং তজ্জন্য-ই তাহারা এতাবৎকাল বিবাহ ও অপত্যোৎপাদন করিতে পাইয়াছিল—জীবনের মুখ্য অভাব পূরণ হইয়াছিল—তাহাদের জীবন উপভোগ্য ছিল তাহা আমাদের পাশ্চাত্যের পদাঙ্কানুসারী সংস্কারকেরা দেখেন না এবং তাহা ই ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর!!!

দেখা গেল সাম্যবাদ প্রচারে সাধারণ লোকেরা, গরিবরা কোন উপকার পায় না বরং নিষ্পেষিত হয়; কেবল ধনীদের-ই সুবিধা বৃদ্ধি হয়। এবং যে অল্প সংখ্যক গরীবরা কোন সুযোগে অবস্থার উন্নতি করিতে পারিতেছে তাহারাও ধনীশ্রেণীতে মিশিয়া যাইতেছে, তাহার আত্মীয় সহকর্ম্মীদের কোন উপকারে আসিতেছে না। গরীবদের কাছে এইরূপ সাম্যবাদ প্রচার প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মম পরিহাস মাত্র এবং মূর্খ ভোলানো প্রবঞ্চনা মাত্র!

এ কথা সত্য বটে যে সম্প্রতি গরীবদের যাহাতে সুবিধা হয়, উন্নতির পথ কতকটা মুক্ত হয়, তাহার নিমিত্ত অনেক প্রতিষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ দরিদ্র ও শ্রমিকদিগের সুবিধা ও সাহায্যার্থে রাজকোষ হইতে বহু ব্যয় হইতেছে অতি অল্পদিন মাত্র এবং তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়াছে—তাহারা নিজেদের ভিতর নানা নিয়মাদি করিয়াছে, সেই সকল নিয়ম পালন করিবার প্রতিশ্রুতি লইয়া তবে তাহাদের দলভুক্ত হইতে দেয়—না প্রতিশ্রুতি পাইলে দেয় না। এইরূপ সংঘবদ্ধতা হেতু-ই তাহারা শক্তিশালী হইয়াছে এবং যতই তাহারা সংঘবদ্ধতা দৃঢ়তায় শক্তিশালী হইয়াছে ততই তাহাদের সাহায্যার্থ এইরূপ উত্তরোত্তর অধিক ব্যয় হইতেছে, তাহার পূর্ব্বে হয় নাই। এইরূপ শ্রমিকও ব্যবসায়ীদিগের সংঘবদ্ধতা আমাদের জাতিভেদ প্রথার অনুরূপ এবং যাবৎ পাশ্চাত্যে আমাদের জাতিভেদ প্রথার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান হয় নাই তাবৎ সেখানকার শ্রমিকরা ভীষণ ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিল। আমাদের জাতিভেদ প্রথায় এই সংঘবদ্ধতা আরও দৃঢ়তর হইয়াছে এবং ইহা বংশগত থাকার নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আরও অনেক প্রকারে সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে যাহা আমি ১৩৩৬ সালের ভারতবর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং এই জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসা থাকার ফলেই আমাদের দেশের দরিদ্ররা ও শ্রমিকরা পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় কোন কালেই নিষ্পেষিত হয় নাই ও সকলের-ই মুখ্য অভাবগুলির পূরণ হইত। আমরা পাশ্চাত্যের অপ্রকৃত সাম্যবাদ—যেখানে সমান নয় সেখানে সমান ধরিয়া লওয়া উচিত—এই কথা আমরা মানি না; কিন্তু যেখানে তাহাদের প্রকৃত সমভাব আছে,—খাওয়া পরা, কাম উপভোগ ও অপত্য উৎপাদন করিতে পাওয়া ভালবাসা পাওয়া, ও ভালবাসিতে পাওয়া, সেই সকল মুখ্য অভাব যাহাতে পূরণ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে-ই আমাদের যৌথ পরিবার প্রথা ও জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসা। বংশগত ভাবে একই রূপ কার্য্য করায় সেই কার্য্য করিবার আবশ্যকীয় গুণগুলি পুরুষানুক্রমিকতা ও আবেষ্টনী এই দুইএর (heredity & environment) সাহায্যে বিশেষ বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল যাহা অন্য কোন প্রকারে হওয়া অসম্ভব। এই জন্য-ই ভারতের শ্রমিকদিগের নিজেদের কার্য্যের উপযোগী নিপুণতা অতুলনীয় হইয়াছিল এবং এখনও তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা বহু শতাব্দি আমাদের শ্রমিকগণকে কোন শিক্ষাই দিই নাই, তাহাদের ব্যবসায় বা কর্ম্মের উপযোগী কোন উচ্চ শিক্ষা তাহারা পায় নাই, তাহারা কেবল হাতে কলমে কাজ করিয়া-ই যায়—আমরা যদি তাহাদিগকে তাহাদের স্ব স্ব ব্যবসার উপযোগী উচ্চ শিক্ষা দিই, এখনও তাহাদিগকে আবার পূর্ব্বকালের মতন পৃথিবীতে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিতে পারি ও তাহাদের বংশগত নিপুণতা প্রস্ফুটিত করিতে পারি, তাহা আমরা দেখি না—চেষ্টাও করি না। আমাদের বৈশ্য শূদ্রেরা লেখা পড়া শিখিয়া চাকরীজীবী বা উকিল মোক্তার-ই হইয়া যায় (এ সকলেই সাহেবদের গোলামী আছে) পাশ্চাত্যের উর্দ্দি ও তকমাধারী আরদালী সাজিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন মনে করেন, জাতি ব্যবসার ও স্বজাতির উন্নতির কোন চেষ্টাও করেন না,

নিজেদের বংশধরেরাও যাহাতে সেইরূপ উর্দ্দি ও তকমাধারী হইতে পায় তাহার জন্যই চেষ্টিত হন। স্বজাতির ও স্বজাতীয় ব্যবসার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা তাহাদের এখন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

জাতিগত ব্যবসা ও একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা তুলিয়া দিলে সাম্যবাদের নামে অসাম্যের পরাকাষ্ঠাই স্থাপিত হয়। এবং আমাদের দেশে গরীব ও শ্রমিকদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে এবং কতক উঠিয়া যাওয়ার ফলেই আমাদের দুর্দ্দশা অসহ্য হইয়াছে। সাম্যবাদের নামে গরীবদের উপর কি ভয়ানক অত্যাচার হইতেছে দেখাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। এখন জীব-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান শাস্ত্রের দিক দিয়া একবার পরীক্ষা করা যাউক। আমাদের জাতিগত ব্যবসার মূলভিত্তি বুঝিতে হইলে বিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের একটি কথা—যাহা সকল সমাজ-তত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন,—তাহা এইখানে বলা আবশ্যক—যে সকল পৃথক সমাজই যেন এক একটি সজীব সত্ত্বা (A society is an organism), যেমন একটি জীব বাঁচিতে গেলে, সুস্থ ও সবল থাকিতে গেলে, তাহার শরীরের সকল অঙ্গেরই কার্য্য সম্যক নির্ব্বাহ করিবার আবশ্যকতা আছে, তেমনি সকল মনুষ্য সমাজেই তাহার আবশ্যকীয় সকল কার্য্যই সম্যক সাধন করিবার আবশ্যকতা আছে। যদি কোন সমাজের সকল লোকই কেবল নিউটনের মতন জ্ঞানী হয়, কিম্বা কেবল ভীমের মতন শারীরিক বলশালী হয়, অথবা কেবল যীশুখৃষ্টের মতন ধার্ম্মিক হয়, তাহা হইলে সে সমাজ অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না—অন্য সমাজ তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। সমাজে সকল রকমেরই লোক আবশ্যক। প্রত্যেক সমাজের আবশ্যকীয় কার্য্যের প্রধানতঃ চারিটি বিভাগ আছে—ধর্ম্ম ও জ্ঞান শিক্ষার—সমাজ রক্ষণ, সমাজের আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল উৎপন্ন করা ও সরবরাহ করা—ও শ্রমিক। প্রথমোক্ত তিন প্রকারের লোকেদের আদেশানুযায়ী কার্য্য করা—এই চারি প্রকার কার্য্য সম্যক সম্পাদিত করিবার উদ্দেশ্যেই আমাদের জাতি-ভেদ প্রথার সৃষ্টি এবং যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের দ্বারা সম্পাদিত হইত। এক একটি জাতির নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমূহের অন্তর্গত এক একটি কার্য্য সেই জাতির ভিন্ন শ্রেণীর বা শাখার দ্বারা সম্পাদিত হইত, তাহা অনেক স্থলেই বংশানুক্রমিক। লোকেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, ইত্যাদি কতটা পুরুষানুক্রমিকতা ও কতটা আবেষ্টনীর (environment) সাহায্যে বিকশিত হয় তদ্বিষয়ে জীবতত্ত্ববিৎদিগের ভিতর মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু বংশানুক্রমিকতা ও আবেষ্টনী, এ দুইএর সাহায্য পাইলে যে এই সকল গুণের উৎকর্ষতা বিকশিত হয় তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। আমাদের জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগত ব্যবসা স্বজাতির ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় সমাজের আবশ্যকীয় সকল প্রকার কর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হইবার উপযোগী গুণ ও নৈপুণ্য বিকাশের যে বিশেষ সহায়ক হয়, আবেষ্টনী ও বংশানুক্রমিকতার সাহায্য পায় সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং জাতিভেদ প্রথা দ্বারায় সমাজের আবশ্যকীয় সকল কর্ম্মই সুসম্পন্ন হইবার অতি সমীচীন, জীব-বিজ্ঞান-শাস্ত্র অনুমোদিত ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল, ও তাহারই ফলে ভারতবর্ষ বহু বহু শতাব্দি ধরিয়া সর্ব্ববিষয়ে—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে, শিল্পনৈপুণ্যে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে চরিত্রবলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল ও প্রত্যেক জাতি-শাখার এক একটি সমাজের আবশ্যকীয় কার্য্য করিবার অধিকার থাকায় ও অন্যজাতির কোন লোককে সেই ব্যবসা বা কার্য্য করিতে না দেওয়ায় তাহাদের সকলেরই সেই কার্য্য করিয়া সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত—তাহাদের মুখ্য অভাব সকল পূরণ করিতে পারিত ও সকলেরই জীবনে কর্ম্মের অবকাশ থাকিত—সকলেই আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি উপভোগ করিতে পাইত, যাহা পাশ্চাত্যের গরীবরা—তাহারাই সংখ্যায় সর্ব্বত্রই অধিক—এখনও পাইতে পারে না। সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে এরূপ সমাজে অতি অল্প সংখ্যক লোকেরা হয় তো তাহাদের কোন গুণ বা ক্ষমতা আশানুযায়ী বিকাশের বা আর্থিক উন্নতির সুবিধা হয় না—হয় তো তাহারা জাতিগত কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্মে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারিত ও তদ্দ্বারা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত; কিন্তু এই অতি অল্প সংখ্যক লোকেদের জন্য সাধারণ লোকেদের পক্ষে উপকারী প্রথা নষ্ট করা যাইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি জীব-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কথাও মনে রাখিতে হইবে যে পাঁচ সাত পুরুষ একই জাতিব্যবসায় করিয়া আসিলে সেই জাতিতে প্রায় অন্য ব্যবসায় বা কার্য্যের পক্ষে অধিক কর্ম্মদক্ষ লোকের জন্মিবার সম্ভাবনা বহু পরিমাণে কমিয়া যায়। পাশ্চাত্যে এক রকম কর্ম্মী বা ব্যবসায়ীদের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ নয়—সুতরাং সন্তানেরা পিতা মাতার ঊর্দ্ধতন পূর্ব্ব পুরুষের গুণ লইয়া জন্মিতে পারে—(atavism এর নিমিত্ত) কিন্তু আমাদের দেশে বহু পুরুষ ধরিয়া একই ব্যবসা করায়, একই রকম জীবনোপায় থাকায়, একই জাতিতে বিবাহ নিবদ্ধ থাকায়, এরূপ অন্য শ্রেণীর লোকের উপযোগী গুণ লইয়া জন্মিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কমিয়া যায়। পাশ্চাত্যে যত অধিক লোক পৈতৃক ব্যবসা বা কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্মে পারদর্শিতা দেখাইতে পারে আমাদের মতন পৈতৃক জাতি বিভাগের দেশেও সেইরূপ অনেক লোক আছে এবং তাহাদিগকে সেইরূপ কার্য্য করিবার পথ রুদ্ধ করা হয়—তাহাদের উপর অত্যাচার করা হয়—তাহা ধরিয়া লওয়া উচিত নয়। বংশানুক্রমিকতা (heredity) বশতঃ, একই আবেষ্টনী বর্দ্ধিত বলিয়া আমাদের দেশে এইরূপ লোকেদের সংখ্যা নগণ্য হইতে বাধ্য। পাশ্চাত্যে আবশ্যকীয় জন্তুদের ভিতর—যথা ঘোড়া, গরু, কুকুরদের একই জাতীয়ের ভিতর মৈথুন নিবদ্ধ করিয়া বিশেষ কার্য্য উপযোগী উৎকৃষ্ট জন্তু সকল উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন—যথা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, অধিক ভারবাহী ঘোড়া, অধিক দুগ্ধবতী গরু—তাহার ভিতর আবার যাহাদের দুগ্ধে অধিক মাখন হয়—যাহাদের দুগ্ধে অধিক ছানা হয়, শিকারের উপযোগী কুকুর, মেষ-রক্ষক কুকুর এবং তাহাদিগকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশে তদনুরূপ, তত্তৎ কর্ম্মোপযোগী অত উৎকৃষ্ট ঘোড়া, গরু, কুকুর নাই—কারণ আমরা সেই সকল জন্তুদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহা-দিগের ভিতর মৈথুন নিবদ্ধ রাখি নাই। আমরা কিন্তু সমাজের উপযোগী পৃথক পৃথক কার্য্য করিবার জন্য, সেই সকল কর্ম্মে বিশেষ

পটু মানুষ গড়িবার চেষ্টায় সেই সকল কর্ম্মে পটু মানুষদিগকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে অনেক ভিন্ন জাতীয় লোকের (race) বাস আছে—তাহারা সভ্যতা বিকাশের ভিন্ন স্তরের, তাহাদের অনেকের অনেক ভিন্ন রকম কার্য্য করিবার সহজ পটুতা আছে—যথা সাপুড়েদের সাপ ধরিবার বিশেষ পটুতা আছে—নুণীয়াদের সমুদ্রে নৌচালন করিবার, মৎস্যাদি জলজন্তু ধরিবার বিশেষ পটুতা আছে—অন্য বিষয়ে তাহারা অনিপুণ, আমরা তাহাদিগকে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলাম—তাহাদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাদের যেরূপ কার্য্য করিবার পটুতা ও উপযোগিতা আছে তাহাই তাহাদের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম এবং সেই পটুতার দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার করিয়াছিলাম—আবশ্যকীয় কর্ম্ম বলিয়া সেই কর্ম্মে তাহাদের জীবন যাত্রাই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। পাশ্চাত্যে উৎকৃষ্ট জন্তু উৎপাদন করিবার নিমিত্ত যে জীববিজ্ঞান শাস্ত্র-সম্মত উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন আমরা জাতিভেদ প্রথার দ্বারায় সমাজের আবশ্যকীয় পৃথক পৃথক কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সুদক্ষ মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছি। সফলকামও হইয়াছিলাম—সেই জন্যই আমাদের এত দীর্ঘকালস্থায়ী সভ্যতা এবং ভারতীয় শিল্পীদের নিপুণতা এখনও অনেক বিষয়ে অতুলনীয়। পাশ্চাত্যে যেমন ভারবাহী ঘোড়ার বাচ্ছাকে ঘোড়দৌড়ের উপযোগী করিবার চেষ্টাও করে না - করিলে হাস্যাস্পদ হয়—আমরা সেইরূপ মদ্য ব্যবসায়ীদিগকে তাঁতী নুণীয়াদিগকে আইন করিবার জন্য নিযুক্ত করি নাই—তদুপযুক্ত করিবার চেষ্টাও করি নাই—ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করিবার চেষ্টাও করি না—চেষ্টা করাটাও হাস্যাস্পদ মনে করি। মিশনারীরা নুণীয়া ও সাঁওতালদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া কয়টাকে পণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন? দুর্ভিক্ষপীড়িত নীচজাতিদিগকে খৃষ্টান করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদিগের নিমিত্ত প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া কয়টাকে পণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন, কয়টাই বা তাহাদের জাতিগত ব্যবসা ছাড়া অন্য ব্যবসা বা কর্ম্ম (গোলামী ছাড়া) বিশেষ দক্ষভাবে করিতে পারিয়াছে ও তদ্দ্বারা তাহাদের জীবন উজ্জ্বলতর হইয়াছে তাহা সংস্কারকদিগকে দেখিতে বলি। যতদিন মিশনারী ও সাহেবদিগের প্রভূত সাহায্য পায় ততদিন ফর্শা কাপড় পরিয়া ভদ্র সাজিয়া চলে; তাহার পরেই তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। আরও ভাবিতে বলি যদি লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া তাহারা যদি জাতীয় ব্যবসা করিত, তাহার উপযোগী শিক্ষা পাইত, তাহা হইলে তাহাদের কত উন্নতি সহজে হইত। কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্যের মোহাবদ্ধ-চক্ষু সংস্কারকরা মেথর ধাঙ্গড়দিগকে আইন করিতে পাঠাইয়া আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে মনে করেন, জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিতে বলেন।

যুক্তিতর্ক দেখাইলাম—অনেক পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা যে আমাদের মতাবলম্বী, তাহা দেখাইবার জন্য এই জাতিগত কর্ম্ম বিভাগ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ ও দার্শনিক W. Bateson M. A. অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁহার Biological Facts and Structure of Society নামক Herbert Spencer Lectureএ যে কথা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে দেখিবেন যে এরূপ কর্ম্মবিভাগ করায় জীব-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোন আপত্তি নাই—বরং অনুমোদনীয়। তিনি প্রথমে বলিলেন অনেক জন্তুদের মতন মানুষের ভিতর অনেক শ্রেণীর মানুষ আছে। তিনি প্রথমে W. Cobbetএর কথা অনুমোদন করিয়া তুলিয়া দিলেন। তাহা এই—"যেমন অনেক শ্রেণীর কুকুর আছে তেমনি অনেক শ্রেণীর মানুষ আছে। মানুষদিগের ভিতর অগাধ পার্থক্য কখনই কেবল শিক্ষার পার্থক্যের জন্য নয়। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে অর্থ সামাজিক অবস্থা ও মান্য (rank) ও শিক্ষা এক রকম হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য আছে—যেমন (poner) কুকুরে ও pug কুকুরে পার্থক্য আছে। যদি hound, Grey hound, Pointer, Spaniel প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় কুকুরদের পৃথক নাম নির্দ্দেশ না থাকে ও পৃথক পৃথক কার্য্যের জন্য তাহারা ব্যবহৃত না হয় তাহা হইলে পল্লী জীবনে কত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়? অথচ ঠিক সেইরূপ মানুষের বিষয়ে আমরা করিতেছি। মানুষ মাত্রেই মানুষ কিন্তু তাহারা কোন শ্রেণীভুক্ত তদ্বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ নাই এবং তাহারা সকল প্রকার কার্য্য করিবার জন্যই (তাহাদের প্রকৃতিগত শ্রেণী বিভাগ না দেখিয়া) নিয়োজিত হয়। যে শিকারী জমিদার তিতির পক্ষী শিকারের জন্য ওই পক্ষী খুঁজিয়া বাহির করিতে fox hound সঙ্গে লয়, তাহাকে লোকে কি বলে? কিন্তু ইহা কি তদপেক্ষা অধিক আহাম্মুকির পরিচয় নয় যে, যে মানুষ রাস্তা সাফ করিবার জন্য বা ড্রেণ পরিষ্কার করিবার জন্যই জন্মিয়াছে তাহাকে আইন করিবার জন্য নিযুক্ত করা?" সকল বুদ্ধির কার্য্যের জন্য বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক; যেমন, ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারী। আর সমাজ গঠন, সমাজের মঙ্গলের জন্য আইন করা—যাহা সুসম্পন্ন করা বহুদর্শিতা, দূরদর্শিতা, বহু গবেষণা ও সহানুভূতি সাপেক্ষ, তাহা কি যে সে করিতে পারে? আর আমরা ধাঙ্গড়, ও শুঁড়িদিগকে আইন করিবার জন্য নিযুক্ত না করিতে দেওয়াতেই আমাদের সংস্কারকদিগের কাছে আমাদের সমাজের মহাপাপ! আমরা আইন ও শিক্ষার কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য স্বার্থত্যাগী যড়রিপুজয়ী বহুজ্ঞানী ও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলাম এবং তাহারই ফলে আমাদের আপামর সাধারণ লোকের মঙ্গলদায়ক সমাজগঠন। অদূরদর্শী নিজ নিজ স্বার্থান্বেষী লোকেদের দ্বারায় গঠিত সমাজের নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়—যাহাদের হস্তে ক্ষমতা আসে তাহারা তখনই তাহাদের স্বার্থের অনুকূল নিয়ম করেন—আবার দুইদিন পরে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়—পাশ্চাত্যে তাহাই হইতেছে—ইহা অদূরদর্শিতারই নিদর্শন—কিন্তু পাশ্চাত্যে ইহা আবশ্যক হয় বলিয়া এই নিত্য পরিবর্ত্তনই প্রগতির চিহ্ন বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। Bateson সাহেবের উক্ত বক্তৃতা হইতে আরও খানিক অংশ তুলিতেছি—"লোকে বলে যে জীব-বিজ্ঞানশাস্ত্র আহার সংগ্রহের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা সমর্থন করে—তাহাতে যাহারা বাঁচিবার উপযুক্ত তাহারাই বাঁচে—অনুপযুক্ত মরিয়া যায়—কিন্তু এ কথা যাহারা কেবল নিজেকে নিজেকে লইয়া থাকে (অর্থাৎ একা একা থাকে—যাহারা সংবদ্ধ থাকে না, যেমন Thrush পক্ষী) তাহাদের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু যাহারা কোন সমাজভুক্ত থাকে তখন প্রতিযোগিতা সমাজে সমাজেই হয়—ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সহিত প্রতিযোগিতা হয় না। যেমন শরীরের ছোট ছোট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবশ্যকতা আছে, তেমনই সমাজের পক্ষে নিম্নস্তরের লোকেদেরও আবশ্যকতা আছে এবং যেমন একটিও অঙ্গের যাহ্যের অভাব হইলে শরীরই নষ্ট হয়, তেমনই সমাজের অন্তর্গত সকল লোকেদেরই প্রতিপালন করিবার আবশ্যকতা আছে—যতদিন তাহারা সমাজের রক্ষার বা স্থিতির সহায়ক কোন কর্ম্ম করে।" (Contributes to its efficiency)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে "সমাজের অন্তর্ভুক্ত নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মীরা (আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদন কারীরা) (producer) যাহাতে উপযুক্ত আহার ও অবকাশ পায় তন্নিমিত্ত অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সমাজের উচিত। কি পরিমাণে অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে হইবে তাহা কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী অর্থশাস্ত্রবিশারদরা বিবেচনা করিবেন। কতক প্রতিযোগিতা এখন নিবারিত সর্ব্বত্রই হইয়াছে ও তাহার সুফলও হইয়াছে। Herbert Spencer এরূপ প্রতিযোগিতার প্রতিরোধ করার ঘোর বিরোধী ছিলেন; কিন্তু আমি জীববিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে এরূপ বিরোধী হইবার কোন ন্যায্য যুক্তি দেখিতে পাই না। যদি প্রত্যেক সমাজই এক একটি সজীব সত্ত্বা হয় তাহা হইলে যাহাতে তাহার কোন একটি অঙ্গের অযথা বৃদ্ধি নিবারণ করা একান্ত আবশ্যক—যেমন জীব শরীরে এরূপ অযথা বৃদ্ধি নিবারণ সাপেক্ষ বন্দোবস্ত আছে।" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে "অনেক পণ্ডিত বলেন সকল লোকই সমান। জীববিজ্ঞানবিদেরা কিন্তু বলেন যে এ কথা সত্য নয়। রাজনীতিজ্ঞেরা বলেন যে সকল লোকেরা সমান এই কথা ধরিয়া লইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তজ্জন্য তাহার মন্দ ফল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আবার অনেকে বলেন সকল কার্য্য করিবার সমান সুবিধা পাওয়ার সকলেরই অধিকার আছে। এরূপ সকলকে সমান সুবিধা দেওয়ায় লাভ কি যদি তাহারা সে সুবিধা কার্য্যে লাগাইতে না পারে? যাহারা এইরূপ সুবিধার ফললাভ করিতে না পারে তাহাদিগকে সুবিধা দেওয়ায় কেবল বৃথা শক্তি ক্ষয় হয় অথবা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের জন্য এইরূপ সুবিধা দেওয়ায় যাহারা উচ্চশ্রেণীয়—যাহারা সে সুবিধা পাইলে উন্নতি করিতে পারে—তাহাদের সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়।" আমাদের দেশে সভ্যতার, বুদ্ধি বিকাশের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তরের লোকের বাস আছে। এরূপ স্থলে সকলকে সকল কার্য্য করিবার সমান সুযোগ দেওয়ায় নিম্নতর স্তরের লোকেদের একেবারে পিষিয়া মারা হয়—পাশ্চাত্যের যেখানে এরূপ ভিন্নস্তরের লোকেদের একত্রে বাস আছে—যথা আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে ও অষ্ট্রেলিয়ায়—সেখানে এইরূপ হইতেছে—তাহারা প্রায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আমরা ইংরাজদিগকে সকল ব্যবসা করিবার সমান সুযোগ দিতে প্রস্তুত নহি—জাতীয় মহাসভায় আপত্তি করিতেছি—সমুদ্র উপকূলের জাহাজে আমাদের বিশেষ অধিকার রাখিতে চাহিতেছি তাহাতে ইংরাজদিগের প্রবেশ নিষেধ করিতে চাহি। মুসলমানেরা সর্ব্বত্রই কি ইস্কুলে, কি চাকুরীতে, কি মিউনিসিপালিটিতে, কি ব্যবস্থাপক সভায় কতক অংশ তাহাদের একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চাহেন। কেন এইরূপ চাওয়া হয় দেখিলে বোঝা যায় যে বিদ্যার, বুদ্ধির, অর্থের, শক্তির তারতম্য থাকিলে সমান সুযোগ দেওয়ায় কোন লাভ হয় না, প্রকৃত ন্যায্য কার্য্য হয়না, ছোটরা-ই মারা যায়—বড়দের-ই সুবিধা হয়। তেলা মাথায়-ই তেল পড়ে। সুতরাং তাহাদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিতে হইলে, হয় মুসলমানেরা যেরূপ করিতে চাহিতেছেন সর্ব্বক্ষেত্রে-ই নিম্নস্তরের লোকেদের জন্য তাহাদের জন সংখ্যা অনুযায়ী কতক অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হয়, না হয় তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি অনুযায়ী ভিন্ন করিয়া রাখিতে হয়। প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হয়, কারণ অনুপযুক্ত লোক দ্বারায় অনেক কর্ম্ম পরিচালিত হয়—যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপযুক্ত সেনানায়কের দ্বারা সৈন্য পরিচালিত হইলে কিরূপ অনিষ্ট হয়—মূর্খ ডাক্তার দ্বারায় চিকিৎসিত হইলে কিরূপ অনিষ্ট হয়—মূর্খ বিচারক দ্বারা বিচার হইলে কিরূপ অনিষ্ট হয়—তাহা সহজেই বোঝা যায়। মুসলমানেরা যেরূপ চাহিতেছেন তাহা করিলে কুকী, গারো, ধাঙ্গোড়ের জন্য স্ত্রীলোকদিগের জন্য ওইরূপ করাই ন্যায়সঙ্গত। আমাদের গণতন্ত্রমুগ্ধ সাম্যবাদী তরুণ তরুণীরা সেরূপ করিতে প্রস্তুত আছেন? তাহারা যাহা করুন, আমাদের যাঁহারা সমাজ গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা দ্বিতীয়োক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন—তাঁহারা সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত এই কপট সাম্যবাদ মানিতেন না তাঁহারা যাহাদের যে বিষয়ে সহজ পটুতা আছে সেই কার্য্য করিবার এক-চেটিয়া অধিকার দিয়াছিলেন—তাহাই তাহাদের জাতিগত ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাহা দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকেদের মুখ্য অভাব সকল পূরণ হইতে পারিত—জীবনে আনন্দ ও অবকাশ ছিল—পাশ্চাত্যের মতন নিম্নশ্রেণীরা পশুত্বে নীত হয় নাই। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ

(২)

যেখানে মানব-চরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখাইবার আবশ্যকতা হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা হাস্যরসকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী এবং কৌতুকপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সকল ব্যঙ্গ চিত্র কোন বিশেষ জাতি বা শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া রচিত নয়,—যে সকল দোষ সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব, তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষে আরোপ করিয়া দেখানো হইয়াছে।

মুরারী শীল

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীদেবী ব্যাধ কালকেতুর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে সাত ঘড়া ধন এবং একটী বহুমূল্য রত্নাঙ্গুরী দিয়া, তাঁহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে নূতন রাজ্য স্থাপন করিবার আদেশ দেন। এইখানে অঙ্গুরীয়টী বিক্রয় করিবার জন্য একজন ধনাঢ্য বণিক আবশ্যক। কাব্যের এই প্রয়োজন সাধনের জন্য কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে ধূর্ত্ত মুরারী শীলের আবির্ভাব। মুরারীর পরিবর্ত্তে অন্য কোন বণিক হইলেও চলিত, এবং চণ্ডীমঙ্গলের অপর কবিগণ সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে সোমদত্ত নামক সরল প্রকৃতির এক বণিককে দেখিতে পাই। সোমদত্ত বিনা বাক্যব্যয়ে অঙ্গুরীর ন্যায্য মূল্য প্রদান করেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এই সুযোগে মুরারী শীলের পরিকল্পনা করিয়া যে ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয়। বস্তুতঃ মুরারী শীলের চরিত্র কবিকঙ্কণের মৌলিক সৃষ্টি।

কালকেতু অঙ্গুরী বিক্রয়ের জন্য প্রাতঃকালেই মুরারীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। মুরারী তখন বহির্বাটীতে বসিয়া "লেখা যোখা করে টাকা কড়ি।" কিন্তু,

পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর পাড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥

মাংসের মূল্য বাবদ্ তাহার নিকট কালাকতুর দেড় বুড়ি কড়ি পাওনা ছিল, সে তাহারই তাগাদায় আসিয়াছে মনে করিয়া মুরারী অন্দরে গিয়া লুকাইল। অথচ মুরারী এত বড় ধনী যে এক কথায় সাতকোটি টাকা বাহির করিতে পারে!

যাহা হউক মুরারী তাহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীকে বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

বীরের বচন শুনি আসিয়া বলে বেণ্যানী
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার ॥

এইরূপে নিরর্থক মিথ্যা কথা বলিয়া কেবল যে দরিদ্র ব্যাধকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা হইল তাহা নহে, অধিকন্তু নূতন ফরমাইস করাও হইল,—

আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাঠ আন এক ভার হাল বাকী দিব ধার
মিষ্ট কিছু আনহ বদর ॥

সরল হৃদয় ব্যাধের মনেও এবার একটু দুষ্ট বুদ্ধি যোগাইল। সে বলিল—"বাকী কড়ি না হয় কালই দিও, আমি এখন অন্য কোন বণিকের বাড়ী যাই,—একটী অঙ্গুরী বিক্রয় করিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া বেণেনীর সুর বদলাইল,—

বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন।
সহাস্য বদনে বাণী বলে বেণে নিতম্বিনী
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন ॥

ওদিকে মুরারী অন্তরালে থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিল, অঙ্গুরীর কথা শুনিয়া আর লুকাইয়া থাকিতে পারিল না। তখন—

ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেণে খিড়কীর পথে।
মনে বড় কুতুহলী কাঙ্খেতে কড়ির থলি
হড়পী তরাজু করি হাতে ॥ *

সে খিড়কীর পথে বাহির হইল এবং ঘুরিয়া গিয়া সদর দরজায় হাজির হইল,—যেন সত্যসত্যই "খাতক পাড়া" হইতে ফিরিয়া আসিতেছে! যেন হঠাৎ কালকেতুকে দেখিয়া মৃদু ভৎর্সনার সুরে,

বেণে বলে ভাইপো এবে নাহি দেখি তো
এ তোর কেমন ব্যবহার ॥

আহা, ভাইপোকে দেখিবার জন্য তাহার কি আগ্রহ!

যাই হোক, এইবার কাজের কথা আরম্ভ হইল। মুরারী অঙ্গুরী লইয়া বেশ করিয়া কষিয়া ওজন করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিল,—

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥ †

সুতরাং প্রত্যেক রতির মূল্য দশ গণ্ডা কড়ি হিসাবে অঙ্গুরীর দর ধার্য্য হইয়া তাহার মূল্য দাঁড়াইল আটপণ পাঁচ গণ্ডা। মুরারী শীল অতি অমায়িকভাবে কালকেতুর সমস্ত প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে চাহিল,—কিছু চাউল, কিছু ক্ষুদ এবং কিছু নগদ কড়ি দিয়া। কিন্তু কালকেতু বিষম সংশয়ে পড়িয়া গেল। দেবী তাহাকে বহুমূল্য মাণিক্য অঙ্গুরী দিয়া গিয়াছিলেন, শেষে তাহার মূল্য দাঁড়াইল কি না আট পণ পাঁচ গণ্ডা কড়ি! তবে হয়ত সাত ঘড়া ধনও মিথ্যা? কিন্তু দেবী কি তাহাকে এতই প্রতারণা করিবেন? সে তখন অঙ্গুরী ফিরাইয়া লইতে চাহিল,—

কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি চাই।
যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাই ॥

এমন দাঁও শেষে হাত-ছাড়া হয় দেখিয়া ধূর্ত্ত বণিক একটু বর চড়াইল,—

বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট।
আমা সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট ॥
ধর্ম্মকেতু ভাগ্না সঙ্গে ছিল লেনা দেনা।
তাহা হৈতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা ॥
* * * *
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া ॥
* * * *
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি।
চাল খুদ না লও গণে লও কড়ি ॥ †

---

* হড়পী=ছোট পেটরা বা হাতবাক্স।
† বেঙ্গা পিতল=পিঙ্গল বা হরিদ্রাবর্ণ পিত্তল, দেখিতে স্বর্ণের ন্যায়।
† পঞ্চবট=পাঁচ কড়া।

এইরূপ দর কষাকষি চলিতেছে, এমন সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল। চণ্ডী দেবী বণিককে অঙ্গুরীর উচিত মূল্য সাত কোটি টাকা দিতে আদেশ করিলেন। সে তখন নিতান্ত ভালমানুষটীর মত আট পণ দশ গণ্ডার স্থলে একেবারে সাত কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হইল।

কিন্তু মুরারী শীল অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নয়; সে হাসিয়া বলিল—এতক্ষণ পরিহাস কৈনু ভাইপোরে।

ভাঁড়ু দত্ত

মুরারী শীল অপেক্ষা শতগুণ হীন চরিত্র ভাঁড়ু দত্ত। বস্তুতঃ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ভাঁড়ু দত্তের মত নরাধম আর দ্বিতীয় নাই। শঠতা, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা কৃতঘ্নতা, নির্লজ্জতা প্রভৃতি নানা অবগুণের সমাবেশ এই ভাঁড়ু দত্তেই পাওয়া যায়। সে এক দিকে যেমন শক্তের ভক্ত তেমনই দুর্ব্বলের প্রতি ঘোর অত্যাচারী। মুরারী শীলের মত লোক কেবল খাতককে উৎপীড়ন করিয়া এবং খরিদ্দারকে প্রতারিত করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু ভাঁড়ু দত্তের মত নীচাশয় ব্যক্তি সকলেরই অনিষ্ট-সাধন করিয়া সমাজের সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকে। এরূপ নরাধম সর্ব্বকালে সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ভাঁড়ু দত্তের ব্যঙ্গ-চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাহার পাপের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া নীতিশিক্ষাও দিয়াছেন।

চণ্ডী দেবীর প্রদত্ত অর্থে ব্যাধ কালকেতু নূতন রাজ্য স্থাপন করিলে, কলিঙ্গ-রাজ্য হইতে বুলান মণ্ডল প্রমুখ বহু প্রজা এই নব-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে বাস করিতে আসিল। ভাড়ু দত্ত তাহাদের সঙ্গে আসিল না, সে একাকী ভেট লইয়া রাজ দর্শনে আসিল এবং মিথ্যা পরিচয় দিয়া একটু প্রতিষ্ঠা জমাইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

ভেট লয়ে কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ু দত্তের প্রয়াণ।
ফোটা কাটা মহাদম্ভ ছিড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ ॥
প্রণাম করিয়া ধীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছিড়া কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেই বাহুনাড়া ॥
আইলুঁ বড় প্রতি আশে বসিতে তোমার দেশে
আহ্বানে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ ভাড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুলে শীলে বিচারে মহত্বে ॥
* * * *
গঙ্গার দুকূল কাছে যতেক কায়স্থ আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
পট্টবস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন ॥ * (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

ভাঁড়ু যে নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, এ কথা তাহার প্রথম দর্শনে এবং কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝা যায়। কিন্তু মুখে সে এমন লম্বাই-চৌড়াই করিল, যে মনে হয় সে কতই অবস্থাপন্ন। গঙ্গার দু-ধারে যত কায়স্থের বাস আছে, সকলকে সে একা অন্ন-বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করে, কেহ গৃহে রন্ধন করে না। কিন্তু এ হেন ভাঁড়ু দত্ত যখন দয়া করিয়া গুজরাটে বাস করিতে আসিল তখন তাহার সংসার পাতিবার জন্য যত কিছু সামগ্রীর দরকার সমস্তই রাজাকে জোগাইতে হইবে,—ঢেঁকি কুলা পর্য্যন্ত!

যাহা হউক এইরূপে ভাঁড়ু দত্ত নিজেই অযাচিতভাবে রাজার পাত্র বা অমাত্য হইয়া বসিল,—

আমি পাত্র তুমি রাজা ইহা জানি কর পূজা
অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবে ॥ (ঐ)

প্রজাগণের নেতা হইয়া আসিয়াছিল বুলান মণ্ডল। এ ব্যক্তি অতি বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ এবং প্রজাগণের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। এরূপ লোকের নেতৃত্ব বজায় থাকিলে ভাঁড়ুর স্বার্থ-সাধনের সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, সে বুলান মণ্ডলের নামে কুৎসা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। সে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—

দিয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা
যারে বল বুলান মণ্ডল।
... ...
পরি দু-পণের কাচা ভানিত আমার ভাচা
সেই বেটা হবে দেশমুখ।
নফরের হাথে খাণ্ডা বহুড়ী জনের ভাণ্ডা
পরিণামে বড় পায় দুখ ॥ † (ঐ)

এইরূপ বাক্-চাতুরীর দ্বারা ভাঁড়ু দত্ত "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হইয়া ক্রমে ভয়ানক যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। সে মূল্য দিয়া কোন জিনিষ কিনিত না, আপনাকে রাজার "মহামণ্ডল" বলিয়া পরিচয় দিয়া, জোর করিয়া তোলা আদায় করিত। সে হাটে গেলে,

পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ার তরাসে ॥

---

* শ্রবণে কলম=কাণে কলম গোঁজা, কারণ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। প্রতি আশে=প্রত্যাশা করিয়া। ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ—অর্থাৎ আমি সকলের অগ্রগণ্য।

† যাহাকে বুলান মণ্ডল বলিয়া এত সম্মান করিতেছে সে ব্যক্তি অতি হীন। নীচবংশে তাহার জন্ম, দু-পণ দামের খাটো কাপড় পরিত, বেতন লইয়া আমার ধান ভানিত এবং কাগজ পত্র বহিয়া বেড়াইত। সেই আজ দেশের মোড়ল! ভৃত্যের হাতে খাঁড়া এবং বালিকা বধূর হাতে ভাঁড়ার পড়িলে যে পরিণাম হয় তাহাই হইবে।

পসরা লুঠিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি।
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি॥
লণ্ডে ভণ্ডে গালি দেই করে শালা শালা।*
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা॥
টানাটানি করে ভাঁড়ু পসারী না ছাড়ে।
জটে ধরে কীল লাথি মারে তার ঘাড়ে॥ (ঐ)

অনেকেই ভাঁড়ুকে ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু তেমন শক্ত পাল্লায় পড়িলে তাহার লাঞ্ছনাও হইত। একদিন কাছায় বাঁধা ছয় বুড়ি কানাকড়ি সম্বল করিয়া হাটে আসিয়া,

মৎস্য পসারে গিয়া দিলা দরশন॥
ডোমনা বসিয়াছে মৎস্যের পসারে।
বাছিয়া বাছিয়া সেই শৈল মৎস্য ধরে॥
মৎস্য ধরি ডোমনারে করে টানাটানি।
কড়ি নাহি দিয়া বেটা মৎস্য লও কেনি॥
দুষ্ট বেটা কহে ডোমনা বলিরে তোমারে।
এতকাল মৎস্য বেচ কড়ি দেও কারে॥
ডোমনা বলেরে বেটা তুমি তার কে।
কর হেতু ধরিবে মনিব হয় যে॥
গালাগালি তুমুল লাগিল হুড়াহুড়ি।
কচ্ছ হতে ভারাদত্তের পড়ে ভাঙ্গাকড়ি॥
কানাকড়ি পরে ভারা বহু লাজ পায়।
মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পলায়॥ * (মাধবাচার্য্যের চণ্ডী)

ভাঁড়ুর অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া হাটুরিয়াগণ রাজা কালকেতুর কাছে গিয়া নালিশ করিল। কালকেতু তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, অনেক অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে, কিন্তু প্রজার পীড়ন সহ্য করিতে পারিল না। ভাঁড়ুকে ডাকাইয়া আনিয়া

মহাবীর বলে ভাঁড়ু কি তোর ব্যাভার।
কি কারণে লুঠ কৈলে আমার বাজার॥
... ...
ইনাম বাড়ী তোলা ঘরে তুমি কর ঘর।
ঋণ বাড়ি নাহি দাও নাহি দেহ কর॥ † (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

ভাঁড়ু অম্লান বদনে উত্তর করিল—

কিসের কারণে খুড়া ধর মোর ছলা।
পরম্পরা আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা॥ ‡ (ঐ)

কালকেতু তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—

মণ্ডল বলিতে মুখে নাহি বসে লাজ।
খর্ব্ব হয়্যা ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ॥
প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।
নগর ভাঙ্গিলি বেটা করিয়া কন্দল॥ (ঐ)

এইবার ভাঁড়ুদত্ত নিজ মূর্ত্তি ধরিল। রাজা কালকেতু যে এক সময়ে দরিদ্র ব্যাধ ছিল সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে কহিল—

খুড়া তিন গোটা শর ছিল একখান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস॥
দৈব বসে যদি আমি ছিলাম কাঙ্গাল।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল॥
... ...
যদি হরিদত্তের বেটা হঙ জয় দত্তের নাতি।
হাটে যদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাতী॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা॥ * (ঐ)

রাজার প্রতি এতবড় অপমানের কথা কাহারও সহ্য হইল না। কালকেতুর আদেশে সকলে ভাঁড়ুদত্তকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিল।

ভাঁড়ুর মত অপদার্থ লোক যে অনায়াসে কিল খাইয়া কিল চুরি করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? সে আপনার পত্নীকেও মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারণা করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। স্বামী রাজসভা হইতে আসিল, কিন্তু গায়ে এত ধূলা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে—

ভারুয়ে বলয়ে প্রিয়া শুনহ কর্কশা।
মহাবীর সনে আজ খেলিয়াছি পাশা॥
ক্রমে ক্রমে মহাবীর হারে ছয় পাড়ি।
রসে আবেশ হইয়া করেছি হুড়াহুড়ি॥
কি বলিতে পারি প্রিয়া বীরের মহত্ত।
যাহার পিরীতে বশ হইল ভারুদত্ত॥ † (মাধবাচার্য্যের চণ্ডী)

তাহার পর নরাধম সত্য সত্যই তাহার উপকারী প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল। সে স্থির করিল কলিঙ্গ-রাজকে গিয়া জানাইবে যে ব্যাধ কালকেতু তাঁহার বিনানুমতিতে তাঁহার রাজ্য মধ্যে বন কাটাইয়া একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। এখন, রাজ-দরবারে ভেট লইয়া যাইবার জন্য একজন লোক চাই, কিন্তু কোথায় পাইবে? তাহার ছোট ভাই, তখনও বিবাহ হয় নাই বলিয়া দাদার উপর ভয়ানক চটিয়া ছিল; ভাঁড়ু তাহাকে বুঝাইল যে কলিঙ্গ-রাজকে খুশী করিয়া রাজ্যের মোড়ল হইতে

* ডোমনা=জেলে। শৈল=শোল মাছ।

† ইনাম বাড়ী ইত্যাদি—বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দান করিয়াছি, তাহাতে তোমার বাস; বিনা সুদে টাকা ধার লইয়াছ, রাজকরও দাও না; এতদূর রাজ-অনুগ্রহ পাইয়াও এরূপ অত্যাচার করিতেছ কেন?

‡ ছলা=ছল, দোষ। মণ্ডলিয়া তোলা=মোড়লের প্রাপ্য তোলা।

* ঠাকুরাল=প্রভুত্ব; তুমিও যে কেমন বড়মানুষ ছিলে তাহা আমি জানি। হঙ=হই। বেচাঙ=বেচাই।

† পাড়ি=বাজি।

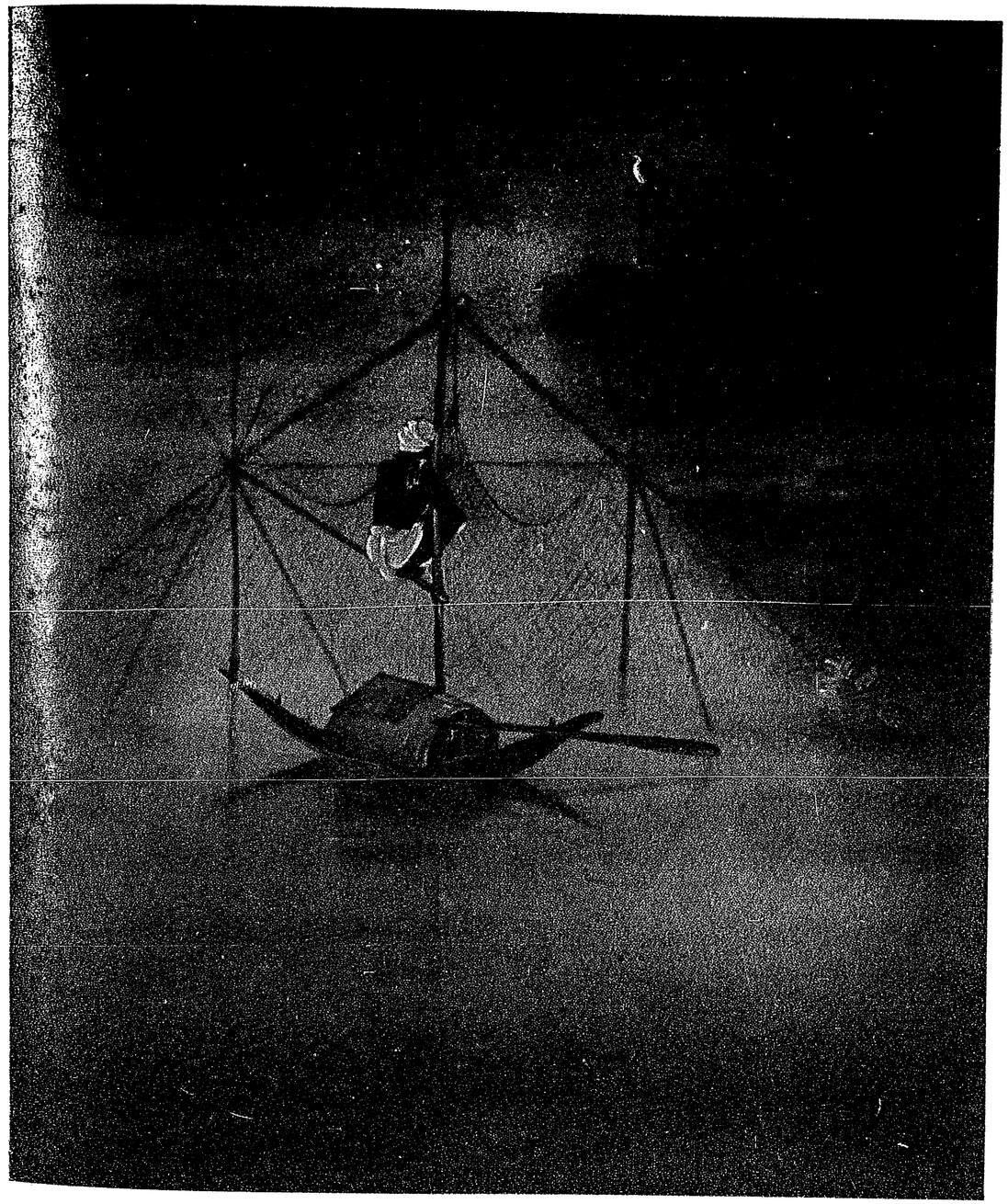

মাছধরা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

পারিলে ভায়ের বিবাহ দেওয়া তাহার প্রথম কাজ হইবে। এইরূপ মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভাইকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহাকে চাকর সাজাইয়া মোট বহাইয়া লইল। কবিকঙ্কণ এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

রাজভেট নিল কাঁচকলা পুইশাক ॥
চুপড়ি করিয়া নিল কদলীর মোচা।
মাগের বসন পরে ভুমে নামে কোঁচা ॥
পাগখানি বান্ধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ।
কেশরের তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ ॥
কৈফিয়তী পাঁজীখান নিল সাবধানে।
শ্রীহরি বলিয়া ভাঁড়ু কলম গোঁজে কাণে ॥
তাঁড়ুর এক ভাই ছিল নাম তার শিবা।
পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় বিভা ॥
বিভা হয় নাই তার দুই পায়ে গোদ।
ছোট ভাইয়ে সাম্য বাক্যে নিবারিল ক্রোধ ॥
বল ভাঁড়ুদত্ত ভাই দর কর হিয়া।
এবার মণ্ডলী পাইলে করাইব বিয়া ॥
ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ুদত্ত করিল গমন ॥ *

কালকেতুর সংবাদ অবগত হইয়া কলিঙ্গরাজ তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কালকেতু রাজসৈন্য পরাস্ত করিল; কিন্তু ভাঁড়ুর কৌশলে ধৃত ও কলিঙ্গদেশে আনীত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর কলিঙ্গরাজ চণ্ডীদেবীর আদেশে কালকেতুকে কারামুক্ত করিয়া তাহার বিলক্ষণ সম্মান করিলেন এবং তাহাকে সামন্তপদে বরণ করিয়া বিদায় দিলেন।

ইহাতে ভাঁড়ুদত্ত বড় ফাঁপরে পড়িল। কালকেতুর কোন অনিষ্টই হইল না, বরং তাহারই দুই কুল গেল। কিন্তু ভাঁড়ুর মত নির্লজ্জ লোকের মান-অপমান জ্ঞান কোথায়? কালকেতুর তোষামোদ করিয়া পুনরায় তাহার অনুগ্রহ লাভের আশায়—

ভেট লয়্যা কাঁচকলা শাক বেগুণ কচু মূলা
ভাঁড়ুদত্ত করিল পয়ান।

সে যে কালকেতুর কতবড় হিতৈষী এবং তাহার কতদূর উপকার সে করিয়াছে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বলিল—এতদিন তুমি গোপনে রাজত্ব করিতেছিলে, এখন যে কলিঙ্গরাজের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়াছ, ইহা আমারই চেষ্টার ফল। তোমার কারাদণ্ড হইলে,—

ধরিয়া রাজার পায় খণ্ডালু সকল দায় ॥
খুড়ী সে জানয়ে মোর মতি ॥

* মাগের=স্ত্রীর। কৈফিয়তী পাঁজী=যে পাঁজী সংক্ষিপ্ত নয়, যাহাতে জ্যোতিষ-তত্ত্বের কৈফিয়ৎ বা বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। দর=দৃঢ়।

যে জন আপন হয় সেহ কভু পর নয়
আপন জানিবে ভাঁড়ু দত্তে।
... ...
খুড়া তুমি মৈলে বন্দী অনুক্ষণ থাকি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিলুঁ সব দুখ
দশ দিগ হৈল অবদাত ॥
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাসনে বৈস খুড়া
আমাকে রাজ্যের লাগে ভার।
থাকহ পুরাণ শুনি রাজ্য জানে আমি জানি
নফরে করহ ব্যবহার ॥ † (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

—আমি তোমার আপন জন, রাজ্যের ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত থাক।

এরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাঁড়ুদত্তের সুখের সীমা থাকিত না বটে, কিন্তু কালকেতু তাহার খোসামোদে আর ভুলিল না, কটুবাক্য বলিয়া তাহার বিলক্ষণ অপমান করিল। তাহার পর ভাঁড়ুদত্তের শাস্তির পালা;—

হারিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
মনের সন্তোষে আনে ক্ষুর ভোঁতা ধার ॥
... ...
চামটি রহিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।
দেখিয়া ঠগের প্রাণ করে দুর দুর ॥
দূরে হইতে শুনিয়া ক্ষুরের চড়চড়ি।
নাক মোচে ধরি তার উপড়য়ে দাড়ি ॥
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
ভাঁড়ু বলে খুড়া দোষ ক্ষম একবার ॥
পাঁচ ঠাঁই ভাঙ্গুর মাথায় রাখে চুলি।
নাগরিয়া মিলি মুখে দেয় চূণ কালি ॥
পুরের কোটাল ভাঁড়ুর শির ঢালে ঘোল।
পাছু পাছু ভাঁড়ুর বাজায় কেহ ঢোল ॥
মালাকার আনি দেয় গলে ওড় মাল।
হাততালি দেয় যত নগর্য়া ছাওয়াল ॥
পুরের বাইর কৈল মারিয়া চাবাড়ি।
ছড়া হাঁড়ি ফেলি মারে কোণের বৌয়াড়ী ॥ * (ঐ)

কবিকঙ্কণ এইখানেই ভাঁড়ুকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া কালকেতুর দয়া হইল, তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুনরায় ঘর বাড়ী দিয়া তাহাকে নিজের রাজ্যে আশ্রয় দিল। কিন্তু মাধবাচার্য্য তাহার দুর্গতির একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। ভাঁড়ুকে একেবারে গঙ্গাপার করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর—

† বহু=বধূ; ভাঁড়ুর স্ত্রী। অবদাত=নির্ম্মল।
* ওড়মাল=জবাফুলের মালা, বলির পশুর গলায় যাহা পরানো হয়।

গঙ্গাপার হইয়া ভারা ভাবে মনে মনে।
এত অপমান লোকে ভাণ্ডিব কেমনে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ভারা মনে কৈল সার।
সকল মাথার চুল মুণ্ডাব পুনর্ব্বার॥
লোকের সাক্ষাতে ভারা কহে মিথ্যা কথা।
গঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়াইয়াছি মাথা॥
এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগর † (মাধবাচার্য্যের চণ্ডী)

মহামদ

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মাহুত্থা বা মহামদ ভাঁড়ুদত্তের মত নগণ্য লোক নয়—সে গৌড়েশ্বরের শ্যালক এবং মহাপাত্র বা প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু একটা মহৎ দোষের জন্য তাহার চরিত্র অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে।

ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের আদেশে বিদ্রোহী ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল, তাঁহার চারি পুত্র নিহত হইল, এবং পুত্রশোকে তাঁহার রাণীরও মৃত্যু ঘটিল। গৌড়েশ্বর প্রভুভক্ত কর্ণসেনের এই বিপদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় সংসারী করিবার জন্য আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বৃদ্ধ কর্ণসেনের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিতে মাহুত্থার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, অথচ প্রভুর কার্য্যে আপত্তি করিবারও সাহস হইল না। তাই রাগটা গিয়া পড়িল ভগিনীর উপর এবং পরে তাহার পুত্র লাউসেনের উপর।

লাউসেন অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য ও চরিত্রবলে গৌড়েশ্বরের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলে, মাহুত্থা ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল, এবং লাউসেনের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিল। লাউসেন ধর্ম্ম ঠাকুরের আশ্রিত ভক্ত। তাহার ভক্তি এবং সাধনার পরীক্ষা লইবার জন্য মাহুত্থা গৌড়েশ্বরকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ফলে লাউসেনের উপর আদেশ হইল ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা করিয়া সাধনার দ্বারা তাহাকে পশ্চিমে সূর্য্যোদয় করাইতে হইবে,—না পারিলে প্রাণদণ্ড হইবে। লাউসেন হাকণ্ড নামক স্থানে গিয়া তাহাই করিয়া আসিলেন। কিন্তু মাহুত্থা মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল যে লাউসেন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

হরিহর বাইতি (বাদক বা ঢাকী) লাউসেনের সহিত হাকণ্ডে গিয়া পশ্চিম-উদয় দেখিয়া আসিয়াছিল। মাহুত্থা তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য ঘুষ দিল, কিন্তু সে রাজদরবারে আসিয়া সত্য কথাই বলিল। মাহুত্থা তখন অভিযোগ করিল যে হরিহর রাজভাণ্ডার হইতে ধন চুরি করিয়াছে, এবং সেই অপরাধে তাহাকে শূলে দিবার আদেশ হইল। কিন্তু হরিহরকে শূলে তুলিয়া দিতেই সে স্বীয় পুণ্যবলে সশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেল,—দেবগণ তাহাকে পুষ্পক-রথে তুলিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে পদে পদে বিফল-মনোরথ হইয়া মাহুত্থার মতিভ্রম ঘটিতে আরম্ভ হইল। হরিহর বাইতিকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে দেখিয়া সে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল,—

যে কালে শুলির গাছ কেটেছে কামার।
মাহেন্দ্র যোগের কিছু ছিল অধিকার॥
না হলে বাইতি বেটা মরে যেত ঠায়।
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া বেটা স্বকায় স্বর্গ যায়॥ *
(মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল)

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে যাহা সংকল্প করিল তাহা আরও অদ্ভুত! বলিল—

বড় বেটা আমার বিনোদকান্ত রায়।
এই শূলে চাপালে স্বকায় স্বর্গ যায়॥
রাজা কয় ধন্য পাত্র ধরণীর মাঝ।
বিচার করেছে ভাল বিলম্বে কি কায॥ (ঐ)

রাজা দেখিলেন এ মন্দ কৌতুক নয়, সুতরাং অবিলম্বে মাহুত্থার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ধরিয়া আনিয়া শূলে দিবার অনুমতি দিলেন। মাহুত্থা পুত্রকে বুঝাইয়া বলিল—"হরিহর আমাদের শত্রু, সে ফাঁকি দিয়া সশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেল; তুমিও সেই পথে স্বর্গে যাও এবং সেখা বাইতি বেটার সঙ্গে করিবে বিবাদ।" বিনোদকান্ত আপত্তি তুলিল,—হরিহর পুণ্যাত্মা ছিল, স্বর্গে গিয়াছে, কিন্তু

তার সম ভাগ্যবান আমি কি হইব।
পরশে দারুণ শুলি পরাণ তেজিব॥
ক্রোধ করি মাহুত্থা কহিল নিদারুণ।
স্বর্গে যাবি স্বকায় শুলের আছে গুণ॥
কোটালে কহিল তবে কঠিন অন্তর।
ধরে বেঁধে তুলে দেয় শুলির উপর॥
মনে সুখী মহামদ মাতিয়া বেড়ায়।
বলে এইবার বিনোদ আমার স্বর্গে যায়॥ (ঐ)

বিনোদ মরিল দেখিয়া মাহুত্থা হায় হায় করিতে লাগিল। কিন্তু আবার নূতন বুদ্ধি জোগাইল। বলিল,—

বিনোদ বেলিক ছিল বলে সৎ নয়॥
পাপ করে পুণ্য পথে দিয়াছিল কাঁটা।
স্বর্গে যেতে শক্তি খাট সদ্য হল খটা॥
দ্বিতীয় আত্মজ আছে দামুদর রায়।
কৃষ্ণ সেবা করে সদা কৃষ্ণগুণ গায়॥
স্বকায় যাবে স্বর্গ শুলি দিলে তাকে।
বজ্জর পড়িবে আজ লাউসেনের বুকে॥ (ঐ)

দামোদরও মরিল, কিন্তু মাহুত্থা তখনও নিরস্ত হইল না, বরং লোক বাড়িয়া চলিল।

† ভাণ্ডিব=ভাঁড়াইব।

* স্বকায়=সশরীরে।

এইরূপে পাঁচ পুত্র করিয়া সংহার।
তথাপি অধম পাত্র ক্ষমা নাহি আর॥
অভাগা অধম পাত্র ক্ষমা নাহি মনে।
কোটালে কহিল আন কোলের নন্দনে॥
ছমাসের শিশুটী সংসারে পাপহীন।
তারে স্বর্গে পাঠালে প্রসন্ন হয় দিন॥
... ...
শূলেতে তুলিবা মাত্র শিশু হলো ধ্বংশ।
এতদূরে মহাপাত্র হইল নির্ব্বংশ॥
করিলে পরের মন্দ ফলে এই ফল।
(ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল)

মাহুত্থার আচরণ নিতান্ত অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈর্ষা ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিও কতদূর বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতে পারে এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ পাটনের রাজা চন্দ্রকেতু

চাঁদ সদাগর বাণিজ্য করিতে গিয়া দক্ষিণ পাটনে উপস্থিত হইলে রাজা চন্দ্রকেতুর কাছে সংবাদ গেল। এই বিদেশী আগন্তুকের বিবরণ শুনিয়া ভয়ে রাজার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, ইহারাই পূর্ব্বে সমুদ্র-বন্ধন করিয়া, রাবণকে বধ করিয়া, লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়াছে; এইবার আমার রাজ্য কাড়িতে আসিয়াছে। সুতরাং ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, প্রাণ লইয়া পালানোই ভাল। শূন্য পুরী পাইয়া ধনরত্ন লইয়া চলিয়া যাইবে। প্রাণে বাঁচিলে সকলই আবার পাইব।

রাজা তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে যাইয়া রাণীদের এই সংবাদ দিলেন। তখন সুযোগ্যা পাটরাণী এইরূপ পরামর্শ দিলেন,—

মহাদেবী বলে রাজা চিন্ত কি নিমিত্তে।
কিসের ভাবনা তব আমরা থাকিতে॥
উপায় করিছি তোমা রাখিবার কাজে।
পলাইয়া থাক গিয়া দাসীর সমাজে॥
স্ত্রীবেশে কাপড় পিন্ধ খোপা বান্ধ শিরে।
হাতে কাচ পরি যাহ পাছের দুয়ারে॥
তোমা লাগি বৈরিদল বিচারে যখনে।
পালাইলেও না মারিব দাসী হেন জ্ঞানে॥ *
(বংশীদাসের পদ্মপুরাণ)

* কাজে=উদ্দেশ্যে। পিন্ধ=পরিধান কর। কাচ=চুড়ি। বিচারে=অনুসন্ধান করিবে।

যাহা হউক ক্রমে রাজার একটু ভয় ভাঙ্গিলে তিনি রাজসভায় গিয়া বসিলেন এবং স্বীয় বিক্রমের পরিচয় দিয়া বলিলেন—

আমার দেশেতে আসি কেহ না যায় সারি।
বড় বড় ক্ষত্রিয় পাইলে ধনে প্রাণে মারি॥
বিপক্ষ পাইলে মোর কভু নাহি ক্ষমা।
... ...
বড় বড় ক্ষত্রী আসি মোর রাজ্য লৈল বেড়ি।
দেখ গিয়া তা সবার হাতে পায়ে দড়ি॥
বড় বড় বীর ধরিয়া খালিখালি।
শিরচ্ছেদ করি দেই দেবী দুর্গার বলি॥ * (ঐ)

তখন চন্দ্রধর মিথ্যা চাটুবাক্যে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া নানাবিধ উপহার সামগ্রী বাহির করিয়া দেখাইলেন। তাহার মধ্যে নারিকেল এবং পান লইয়া রাজসভায় যে কিরূপ হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়াছিল পূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

অবশেষে কিরূপে পাণ সাজিয়া খাইতে হয় তাহা দেখাইয়া দিলে রাজা খুশী হইয়া গেলেন এবং সভা ভঙ্গ করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন,

গুয়া পাণ খাইয়া রাজার রাঙ্গা মুখ।
অন্তঃপুরে দেখিয়া রাণীরা পায় দুঃখ॥
মহাদেবী বলে আজি একি বিপরীত।
কি হেতু পড়িছে তব মুখেতে শোণিত॥
নেয়াধি হৈয়াছে মুখে মনে মনে বাসি।
দেখিয়া সুখের রক্ত হৈয়াছি তরাসী॥
রাজা বলে আজি এক বস্তু খাইলাম।
আসিতে আসিতে তার ভুলিয়াছি নাম॥
তিনখানি বস্তু দিল করিয়া সংযোগ
আসিয়াছি খায়্যা যেন দেবতার ভোগ।
তোমারে আনিয়া দিমু কালি যদি পাই।
* * * * *
কি অপূর্ব্ব বস্তু সৃজিয়াছেন গোঁসাই॥ (ঐ)

আর একটা অপূর্ব্ব সামগ্রী রাজা উপহার পাইয়াছিলেন—চট। এমন সৌখীন জিনিস দেখিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন, পরম আগ্রহ সহকারে পাটের পোষাক পরিধান করিলেন এবং

চট পিন্ধিয়া রাজা বসিল সভাত।
কি কহিব চটের মহিমা
পূর্ব্বের পুণ্যের ফলে হেন বস্ত্র আনি মিলে
রাজার ভাগ্যের নাহি সীমা॥ (ঐ)

* খালিবিখালি=খালি খালি, কেবলই, সর্ব্বদা

সেবিকা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সকালে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল, জ্ঞান ফিরিল, সন্ধ্যার পরে। কিন্তু আলফ্রেডের মনে হইল যেন, কত মাস, কত দিন পূর্ব্বে সাহেব ডাক্তার তাহাকে অজ্ঞান করিয়া অঙ্গে তাহার অস্ত্রোপচার করিয়াছিল! খাটের সঙ্গে তাহার বক্ষঃস্থল বাঁধা; খাটের বাজুতে পা দু'টিও বাঁধা; হাত দু'টা বদ্ধ নয় বটে, তবে সে দু'টি নাড়িবার সাধ্য বা শক্তি আদৌ নাই। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, তৃষ্ণায় যেন ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।

খাটের পাশে টুলে একটি যুবক বসিয়া ছিল, আলফ্রেডের হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল—এখন কেমন আছ?

আলফ্রেড কথা কহিতে পারিল না, চক্ষু নাড়িয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল, ভাল নয়।

এই সময়ে নার্স ঘরে ঢুকিয়া, এক চাহনিতে রোগীকে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া, অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসিল—'সেন্স' কতক্ষণ হ'য়েছে?

অনুচর উত্তর দিল—এইমাত্র।

নার্স হাতঘড়িটি দেখিয়া, রোগীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; ললাটের উপর সেবা-নিপুণ হাতটি রাখিয়া আত্মীয়ের মত স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল—কিছু খাবেন?

আলফ্রেড ঘাড়টি ঈষৎ নাড়িয়া আহারে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে, নার্স ধীরপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। আলফ্রেড চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

পাঁচ-সাত মিনিট পরে, ফিডিংকাপে বরফজল আনিয়া আবার তেমনি স্নেহ-করুণ স্বরে কহিল—হাঁ করুন ত?

আলফ্রেড ঠোঁট নাড়িয়া প্রশ্ন করিল—কি ও?

নার্স হাসিয়া, ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনার খাবার।

আলফ্রেড পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিল—কি?

নার্স প্রশ্নটা বুঝিতে পারিতেছে না ভাবিয়া অনুচরটি বলিল—জিনিষটা কি তাই জান্তে চাইছেন।

নার্স হাসিয়া বলিল—ওঁর খাবার, এর বেশী জানবার দরকার নেই। হাঁ করুন তো একবারটি!

খাওয়াইয়া, তোয়ালেতে ঠোঁট দু'টি মুছাইয়া দিয়া, নার্স বলিল—এইবার ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

আলফ্রেড হতাশভাবে জানাইল, ঘুমের আশা নাই।

"কিন্তু ঘুম যে দরকার। এমনি না-হয়, ঘুমের ওষুধ দিতে হবে। আপনি ত আছেন, একটু পরে আমায় খবর দেবেন, ওষুধ দিয়ে যাব।"

দ্বারের বাহির হইতে নারীকণ্ঠে কে বলিল—সিষ্টার, থারটি-সেভেন গ্যাস্‌পিং!

"এত শীগ্‌গির! এই যে অক্সিজেন দিয়ে এলুম রে—" বলিতে বলিতে নার্স বাহির হইয়া গেল।

আলফ্রেড ইঙ্গিতে অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিল—কি বল্লে?

এতদিনের একটা রোগীর কানের কাছে, জীবন ও মরণের দ্বন্দ্বে যে লোক বিধ্বস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সামনে ভয়ঙ্কর কথাগুলা বলায়, আলফ্রেডের অনুচর মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; আলফ্রেডের প্রশ্নে সে আরও ব্যস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু যা-হোক একটা কিছু বলিয়া চাপা না দিলেও নয়।

কিন্তু, কোন কথা বলিতেও হইল না, চাপা দিতেও হইল না। কোন এক অদৃশ্য স্থান হইতে তখনি ঘোররবে আর্ত্তনাদ উঠিল। সে করুণ মর্ম্মভেদী হাহাকারের মধ্য হইতে "ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হলো রে!" কথাগুলা বজ্রনির্ঘোষে হাসপাতালের চারিভিত প্রকম্পিত করিতে লাগিল।

আলফ্রেড চক্ষু মুদিল। অনেকক্ষণ তাহাকে শান্ত, নীরব থাকিতে দেখিয়া, অনুচরটি ঘরের বাহিরে আসিতেই দেখিল, নার্সটি একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে এদিকেই আসিতেছে। আলফ্রেডের অনুচরকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় নার্স বলিয়া গেল, আসছি এক্ষুনি।

তাহারা বলাবলি করিতে করিতে যাইতেছে শুনা গেল,

নার্সটি সেই প্রবীণা স্ত্রীলোককে বলিতেছে—ও-দু'টোও এখুনি মরবে, আপনি দেখবেন মাসিমা। এই বেলা বরঞ্চ ডাক্তারকে 'স্লিপ' পাঠিয়ে দিন, ওদের লোকজনকে খবর দিয়ে রাখুক। কে জানে বাবা, এসে তেরিয়া হবে।

ব্যাপারটা জলের মতই স্পষ্ট। একটা রোগী এইমাত্র ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে; আর দুইটার জন্য যমদূত হাসপাতালের দরজায় রথ প্রস্তুত রাখিয়াছে। কিন্তু উহারা কি মানুষ? উহারা কি নারী? লোক মরিতেছে, হয়ত তাহাদের জন্য কত ঘরে, কত প্রাণে হাহাকার উঠিতেছে, কত সংসার মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, আর ইহারা কেমন সহজভাবে, কেমন অকুণ্ঠচিত্তে তাহা লইয়া রঙ্গ-রসিকতা করিতেছে! যমরাজার দূত কখনও দেখি নাই; ইহারা কি তাহারা নহে?

পাশ কাটাইয়া, আর দুইটি নার্স চলিয়া গেল; তাহাদের মুখেও ঐ কথা।

একজন বলিতেছে—সুমতির ওয়ার্ডে তিনটে, আমার ওয়ার্ডে, ভাই, চারটে টেঁসেছে আজ; আর একটা রাত্রেই পটল তুলবে।

অপরা বলিল—আমার ঘরের সেই বুড়ীটে দাঁত মুখ ছিরকুটে পড়ে আছে; গেলেও যেতে পারে।

তরলমতি যুবক আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না; ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আলফ্রেড চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে। গায়ে হাত দিতেই আলফ্রেড চক্ষু খুলিয়া বলিল—নরেন, বাড়ী যা।

নরেন বলিল—সুধীর আসুক।

আলফ্রেড আর কিছু বলিল না।

পদশব্দ শুনিয়া নরেন দ্বারের বাহিরে আসিতেই নার্সের সঙ্গে দেখা। নার্স বলিল—উনি ঘুমিয়েছেন?

নরেন উচ্চস্বরে কহিল—যা ভয় দেখিয়ে গেছেন আপনি, ঘুম ওর ত্রিসীমানাতেও আজ আসবে না।

"কি ভয় দেখালুম আমি?"

"থারটি সেভেন গ্যাস্‌পিং···"

"ও-হ্! সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে, আমায় মাপ্ করুন। চলুন ত দেখি।"

ঘরে ঢুকিয়া নারী ললাটে তাহার কোমল করস্পর্শ দিতেই আলফ্রেড চক্ষু মেলিল।

"একটু ঘুমের ওষুদ দিই, কেমন?"

কয়টি অক্ষরের কয়টি কথার প্রশ্নটি! কিন্তু রোগীর কর্ণে স্বরটি, স্বরের ভিতরকার অনুভূতিটি মধুর হইয়া বাজিতে লাগিল; আলফ্রেড নারীর মুখের পানে চক্ষু রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রমণী আবার বলিল—ঘুমুতে ইচ্ছে হয় না, বলুন ত? ঘুমুলে কিন্তু কাল সকালে অনেকখানি ভাল বোধ করবেন। কি বলেন, দিই?

আলফ্রেড বলিল—দিন।

ঔষধ খাওয়াইয়া অস্ফুট চম্পক সদৃশ অঙ্গুলি দ্বারা আলফ্রেডের চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে নারী বলিল—আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব এখান থেকে।

আলফ্রেড চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এতোদিন হাসপাতালে রহিয়াছে, দিনে তিনবার নার্স বদল হইয়াছে, ইহাকে একদিনও দেখে নাই। একহারা ফুটফুটে লম্বা চেহারাখানি, মুখে কোমলতা যেন ভরা রহিয়াছে, চশমাবৃত নয়ন দু'টি করুণায় যেন টলটল করিতেছে। ইহাকে দেখিয়া মনে হয় না যেন সে নার্স; মনে হয় যেন সে তাহারই কোন আত্মীয়া অথবা বান্ধবী! দেখিতে দেখিতে হঠাৎ প্রলাপাচ্ছন্ন রোগীর মত, আলফ্রেড ব্যগ্র বাহু দু'খানা তুলিয়া নার্সের হাত ধরিয়া বলিল—তুমি কে?

নার্সের মুখে সেই হাসি, নয়ন-কোণ করুণায় করুণ, কণ্ঠে বিশ্বের মাধুর্য্য, কহিল—নার্স। আপনাকে ঘুম পাড়াচ্ছি। কথা বলবেন না, তাহ'লে ঘুম আসবে না।

সে ক্ষমা চাহিয়াছিল সত্য, তথাপি নরেন 'মাগীটাকে' ক্ষমা করে নাই। এই শ্রেণীর ছলাকলাকুশলা নারীদের দু' চক্ষু পাড়িয়া সে দেখিতে পারিত না। 'ইয়ং বেঙ্গলে' সে একটা সম্মানজনক ব্যতিক্রম বলিয়া বন্ধুমহলে উপহসিত। নরেন গম্ভীরভাবে বলিল—আপনি যেতে পারেন, আমি আছি এখানে।

নার্স হাসিমুখেই বলিল—উনি ঘুমুলে যাব। তাহার কণ্ঠ দৃঢ়, কঠিন; কিন্তু বড় কোমল, বড় মধুর।

আলফ্রেড আবার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তোমার নাম কি?

"নার্স।"

আলফ্রেড হাত ছাড়িয়া দিয়া, হতাশভাবে পাশ ফিরিতে

গেল, সকল অঙ্গ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা, পারিল না ; কেবল বেদনাটা বাড়াইয়া ফেলিল।

নার্স তাহা বুঝিল ; সযত্নে হাত দু'টি, মাথাটি, পা দু'টি ঠিক করিয়া দিয়া, চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—নাম জান্তে চান ? আমার নাম সুমতি।

"সুমতি"—জিহ্বায় জড়াইয়া গেল, এমনভাবে নামটি একবার উচ্চারণ করিয়া, আলফ্রেড ঘুমাইয়া পড়িল। নিশ্চিত নিদ্রিত বুঝিয়া, নার্স (সুমতি) নরেনকে বলিল—ঘণ্টা আষ্টেক বেশ ঘুমুবেন বলে ত মনে হয়। যদিই কোন দরকার টরকার হয়, বলবেন, দুটো পর্য্যন্ত আমার ডিউটি।

নরেন কথা বলিল না।

সুমতি বলিল—আর সেইটের জন্যে ক্ষমা করবেন। দেখুন দিনরাত ঐ করে করে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আর কিছু নেই।—দোষ নেবেন না। শুভরাত্রি!

এ শুভেচ্ছার উত্তরও নরেন দিল না।

দুই

আলফ্রেড বোস্ কলিকাতার কোন ছাত্রাবাসে থাকিয়া ল' পড়িত। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগে কোন এক পল্লীগ্রামে তাহার গৃহ। গৃহ মাত্র—কারণ গৃহে কেহ নাই, গৃহও নাই। খৃষ্টান মিশনারীদের দয়ায় জেলার পাদ্রী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া, কলিকাতায় আসিয়াছিল। তদবধি প্রত্যেকটি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া এম-এ পাশ করিয়াছে ; আর কয়েক মাস মধ্যেই আইন পরীক্ষা দিবে। বয়স বছর চব্বিশ পঁচিশ হইবে। হঠাৎ বাতশ্লেষ্মাবিকারে আক্রান্ত হয় ; অবস্থা যখন খুবই আশঙ্কাজনক তখন ছাত্রাবাসের ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষ পরামর্শ করিয়া তাহাকে হাসপাতালে রাখিয়া যায়। ছাত্রেরা পালা করিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিত। রোগটা যখন একটু কমিয়াছে, সেই সময়ে পাকস্থলীতে একটা ফোড়া হইয়া রোগ পুনরায় জটিল ও ভীতিপ্রদ হইয়া উঠে। নরেন্দ্র ও সুধীর তাহার সহপাঠী ; তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই তাহার কাছে থাকে।

সেই রাত্রে, প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আলফ্রেডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নরেন্দ্র বসিয়া আইন পুস্তক পাঠ করিতেছিল, বন্ধুকে জাগিতে দেখিয়া, বহি রাখিয়া দিল।

আলফ্রেড জিজ্ঞাসিল—নরেন, তুই রইছিস্ এখনও! সুধীর আসে নি ?

নরেন বলিল—না, সুধীর হঠাৎ বাড়ী থেকে তার মায়ের অসুখের 'তার' পেয়ে সন্ধ্যের গাড়ীতে দেশে চলে গেছে, আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, কাল থেকে তার বদলে রমেশ এখানে আসবে।

আলফ্রেড বলিল—রমেশ সেন ?

"হ্যাঁ। এখন শরীর কেমন, বোস ?"

"ভালই। কত বেজেছে ?"

"সাড়ে তিনটে। কিছু খাবে ?"

"দাও।"

নরেন বলিল—নার্সকে বলে আসি।

আলফ্রেড দ্বারের দিকে চাহিয়া শুইয়া রহিল। একটু পরে নরেন একা ফিরিয়া আসিল। রোগী চক্ষু মুদিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবুও আহার্য্য আসে না দেখিয়া নরেন আবার বাহির হইয়া গেল এবং রাগে গর গর করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া গজ গজ করিতে করিতে বলিল, হতুম আমি এখানকার অফিসার, ধরে ধরে সব চাবকাতাম।

আলফ্রেড ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসিল—কি হ'লো নরেন ?

"আধঘণ্টা আগে নার্স বেটীকে বলে এসেছিলাম তোমায় কিছু খেতে দেবার জন্যে। এলো না দেখে বল্‌তে গেলাম, তা বল্লে বেটী, রোগী ত ঐ একটা নয়, সময় হ'লেই যাব।"

"কথাটা সত্যি।"

"কি সত্যি ?"

"রোগী এই একটাই নয়।"

নরেন বলিতে লাগিল, বলতে গেলাম ডাক্তারকে, সে বল্লে, ব্যস্ত হ'বেন না, সময় পেলেই নার্স যাবে। দাঁড়াও না, কাল আমি সাহেবকে বল্‌ছি।

আলফ্রেড মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—বলে কি হবে ভাই ? হাজার হাজার রোগী যেখানে, সেখানে তুমি বাড়ীর ব্যবস্থা পেতে পার কেমন করে ?

নরেন রাগতভাবে বলিল—না, না, ও-সব বদমাইসি! ঐদিকের কেবিনে একটা ছোট ছেলে হাত না পা কি ভেঙ্গে এসেছে, হাসপাতালশুদ্ধ ডাক্তার, নার্স, কুলি, মেথর দিনরাত সেইখানে ছুটোছুটি করছে। গবর্ণমেণ্টে তার মেসো-পিসে কে-নাকি বড় চাকুরে আছে, তাই সব

ব্যাটাবেটী একেবারে তটস্থ! ঐ যে ট্যাঁকখোর ডাক্তারটা, দিনরাত রোগীদের ওপর তাঁইশ করে সেখানে একেবারে 'ডাম্ ড্রিভন ক্যাট্‌ল।' আচ্ছা, কাল আসুক সাহেব, দেখে নিচ্ছি একবার।

আলফ্রেড কথা বলিল না। বন্ধুকে সে জানে, চিনে, রাগের সময় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র, ইহা সে ভালরূপ জানিত ; তাই চুপ করিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচেক পরে নার্স আসিল। আলফ্রেড তাহার দিকে চাহিয়াই চক্ষু মুদিয়া ফেলিল। নিঃশব্দে ফিডিংকাপ্ ঠোঁটের উপরে ধরিয়া নার্স কহিল—খান্।—স্বর কোমল নহে, কর্কশ ; স্পর্শ স্নেহতপ্ত নহে, শীতল। আলফ্রেডও নিঃশব্দে খাইয়া ফেলিল্।

কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া 'নার্স' দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া গেল, পিঠে, ঘাড়ে, পায়ে পাউডার লাগাইয়া দিয়া গেল—শব্দহীন যন্ত্রের মত একটির পর একটি কার্য্য করিয়া গেল—রোগীর সঙ্গে শুশ্রূষাকারিণীর যে সাময়িক স্নেহের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা কোন পক্ষই যেন অবগত নয়।

রমেশ আসিয়া সকালেই নরেনকে 'রিলিভ' করিতে চাহিল ; কিন্তু নরেন গেল না, সাহেবের সঙ্গে দেখা না করিয়া সে যাইবে না বলিল। আলফ্রেড নিজেও অনুরোধ করিল ; কিন্তু সে 'ব্যাটা-বেটীদের' 'দেখিয়া লইয়া' তবে যাইবে প্রতিজ্ঞা করিল।

সাহেব অভিযোগ শুনিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না ; নরেন 'অমানুষিকতা, হৃদয়হীনতা, বর্ব্বরতা' প্রভৃতি অনেক বড় বড় কথা বলিয়া সাহেবের মৌনভঙ্গের চেষ্টা করিল—কিন্তু ফলোদয় হইল না। সাহেবের সহকারী, তিনি বাঙ্গালী, বলিলেন—পরে আমায় বল্‌বেন, শুনবো।

নরেন প্রতিজ্ঞা করিল, আর কাহাকেও বলিবে না, সে খবরের কাজে প্রবন্ধ লিখিয়া ইহাদিগকে ঢিট্ করিবে। মনে মনে ভাবী প্রবন্ধটার মুসাবিদা করিতে করিতে রমেশকে রোগীর ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে ছাত্রাবাসে চলিয়া গেল।

এগারোটার সময় আর একজন নার্স আসিয়া তাপ পরীক্ষা করিয়া, এক কাপ হরলিক্স খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। নরেন যাঁহাকে ট্যাঁকখোর ডাক্তার বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল, সেই ভদ্রলোক একবার আসিলেন, সংক্ষিপ্ত দুই একটি প্রশ্ন করিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া লইলেন। তারপর রমেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—আপনিই বুঝি সাহেবের কাছে কম্‌প্লেন করেছিলেন ? কিন্তু ক'রে লাভ কি! হাসপাতাল হাসপাতাল, কারু ঘর বাড়ী ত নয় যে, মুখের কথা খসাতে না খসাতে কাজ হ'বে। পাঁচ সাত শ' রোগী যেখানে, সেখানে কুড়ি পঁচিশজন নার্স, এর বেশী আর কি করতে পারে বলুন তো ? দিন চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে নার্সিং হোমে থাকুন গে, হোম্ কম্ফার্ট্‌স্ কতকটা পেতে পারেন। গরীবের দেশ, ফাণ্ডে টাকা কম, সবই প্রায় ফ্রি বেড, তবু গবর্ণমেণ্টের তদারকে আছে ব'লে চলে ; আপনাদের দেশী লোকের হাসপাতালে যান্-না, শুয়ে শুয়ে কাঁদতে হ'বে। আমাদের জাতের আর একটা দোষ কি জানেন ? আমরা মনে করি, হাসপাতাল যখন পাব্‌লিকের, পাবলিক্ আমরা, চোখ রাঙিয়ে কাজ নোব। তা কি হয় মশায় ? কথাতেই আছে, Courtesy begets courtesy. মিষ্টি কথায় যত কাজ পাওয়া যায়, চোখ রাঙিয়ে তা কি হয় ? আপনি সাহেবের কাছে কমপ্লেন করবার আগেই মরণিং নার্স রোগীর টিকিটে অনুচরের নামে বদ মেজাজের কথা লিখে রেখে গেছে। অবশ্য হাসপাতালের রোগী বা রোগীর সঙ্গীদের কথা বা কাজের বিরুদ্ধে এ্যাকসন আমরা নিই নে ; কারণ তাদের ত মাথার ঠিক থাকে না, সবাই ত জানে। আমরা ও-সব ধর্ত্তব্যের মধ্যে বলেই মনে করি না। যাক্, আপনাদের এখন কিছু করাবার আছে কি ?

রমেশ আগের ইতিহাস কিছুই জানিত না, সে হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। আলফ্রেড বলিল—ডাক্তারবাবু, আপনারা আমাদের ক্ষমা করবেন। আমার সে বন্ধুটি ঐ-এক-রকমের লোক, বড্ড শীগ্‌গির সে চটে যায়। আমার অনুরোধ, তার কথায় রাগ করবেন না, ডাক্তারবাবু!

রণজয়ী বীর দুর্ব্বল প্রতিপক্ষকে যেমন অবহেলে ক্ষমা করে, সেইভাবে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ফেলিয়া ডাক্তার কহিলেন—আরে না না, ও-সব কথায় কি কেউ রাগ করে ? পাগল হ'য়েছেন আপনি! হাসপাতালে ডাক্তারী করতে হ'লে কানে তুলো এবং পিঠে কুলো বাঁধতেই হ'বে। যাক্ গে। আপনি আজ ত ভালই আছেন, দেখছি।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, চলি এখন। আবার বৈকালে দেখে যাব'খন।" —বলিয়া ডাক্তারবাবুটি গম্ভীর চরণক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন।

অপরাহ্নে নরেন 'ডিউটি'তে আসিয়া রমেশের কাছে সব কথা শুনিয়া মহা গরম হইয়া উঠিল; বলিতে লাগিল —ওঃ কি আমার ডক্টর হ্যারিস সে! সার্মণ প্রীচ করে গেছেন! আজ মজা দেখবেন'খন বাছাধন, এক ডাক্তারের ছেলের পেটে টিউমার হ'য়েছে, ডক্টর হ্যারিস পর্শু তাকে একটা মিক্স ইঞ্জেক্সান দিয়েছিলেন, আধখানা দিয়ে সেই এ্যাম্পুলটার মুখ গালা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন, আজ সেই আধখানা আবার ইঞ্জেক্ট করেছে। ডাক্তার এই-না দেখে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! তার ছেলের জ্বরও হয়েছে আজ একেবারে একশো চার। বল্‌ছে, ডক্টর হ্যারিসের নামে মোকর্দ্দমা করবে; বাছাধনকে দু'টি বচ্ছর দিয়ে তবে আর কথা!

রমেশ হাসিয়া বলিল—ওতে মামলাই বা হবে কি করে! আর জেলই বা কেন হ'বে!

নরেন 'এম্‌ফ্যাটিক্যালি', দৃঢ়তার সহিত কহিল—হ'বে না! 'এক্সপোজড', একবার ব্যবহার করা এ্যাম্পুল ব্যবহার করা উচিত নয়, তা জানো? শ্রীমান হ্যারিসকে অন্ততঃ দু'টি বচ্ছর যেতে হচ্ছে, তা তুমি দেখে নিও। আমি সেই বুড়ো ডাক্তারটিকে—ছেলের বাপকে গো—খুব রাগিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি ল'ইয়ার শুনে বুড়োও খুব উৎসাহিত হয়েছে।

আলফ্রেড বলিল—এরই মধ্যে এতো কাণ্ড করে এসেছ!

নরেন বলিল—নয় ত কি! ইস্ একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি, রমেশ, পাঁচমিনিট বোস্ তুই, বুড়োকে আর একটা কথা বলে আসি।—সে বাহির হইয়া গেল।

রমেশ হাসিয়া বলিল—বদ্ধ পাগল।

তিন

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, নরেন আইন কেতাব হইতে একটা জটিল মোকর্দ্দমার বিবরণ পাঠ করিয়া শুনাইতেছে, দ্বারে কে 'নক্' করিল। নরেন উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই, হাসিমুখে সুমতি ঘরে ঢুকিয়া দুইজনকে দুইটি নমস্কার করিয়া, আলফ্রেডের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া কহিল—জ্বরটর নেই, সমস্ত দিন ভালই আছেন। শরীর বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে?

আলফ্রেড অনিমেষদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কি-যে প্রশ্ন, তাহাও যেমন শুনে নাই, কি-যে উত্তর তাহাও তেমনি জানে না।

সুমতি আবার জিজ্ঞাসিল—শরীর কি হাল্কা মনে হচ্ছে না? কোথাও কোন কষ্ট আছে কি?

"না।"

"এখন যাই, পরে আবার আসব।"

হঠাৎ আলফ্রেড ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—সমস্ত দিনের মধ্যে কি একবারও আস্‌তে নেই?

সুমতি বিরক্ত হইল কি-না বলা যায় না, তবে তাহার চিরফুল্ল ওষ্ঠাধরের হাসি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল; সে আস্তে আস্তে কহিল—আমার যে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ২টো ডিউটি। অন্য সময়ে ত আসতে পারি না।

আলফ্রেড আপনার মনে বিড়বিড় করিয়া বলিল—এতো কষ্ট পাচ্ছি, একবার দেখতে আসতেও কি পারতে না সুমতি?

সুমতি চমকিয়া উঠিল। নাম তাহার ঐ-ই বটে কিন্তু ও-নাম এখানে চলে না, ও-নামে কেহ তাহাকে ডাকে না; অধিকারও নাই। এখানে সে 'সিষ্টার' মাত্র! হাসপাতালের কোন লোক শুনিলে জবাবদিহি করিতে হইতে পারে; বলিল—আমাদের 'সিষ্টার' বলে ডাক্‌তে হয়।

নরেন এতক্ষণ নীরব ছিল; কিন্তু আর পারিল না; মনে হইল, 'মাগী' বড্ডই ঢং করিতেছে, বলিয়া উঠিল—বেশ, তাই বলেই ডাকা যাবে।

কথাটিও শেষ হইয়াছে, মেঘ না চাহিতেই জল। ডাক্তারবাবুটি হাজির। প্রথমেই নার্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন—টেম্পারেচার নিয়েছেন?

সুমতি নতমুখে কহিল—না, সাতটায় নোব।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; জিব্ দেখিলেন, গায়ের কাপড় সরাইয়া ব্যাণ্ডেজ লক্ষ্য করিলেন; তারপর বলিলেন—বেশ ভাল আছেন।

সুমতি আবার ঘরে ঢুকিয়া নম্রকণ্ঠে কহিল—ডক্টর ঘোষ, একটি ভদ্রলোক।

"কে?"

"আজ্ঞে আমি"—যে ভদ্রলোক ঢুকিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নরেন তাঁহাকেই বাদী খাড়া করিয়া এই ডাক্তারটির নামে মামলা দাঁড় করাইবার উদ্যোগ-আয়োজন প্রায় শেষ করিয়া আসিয়াছিল। তাঁহাকে এখানে আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ এবং বুঝিবা কতকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

আগন্তুক বলিলেন—ডক্টর ঘোষ, আপনি শুনলুম, আমার ওপর খুব রাগ করেছেন।

ডক্টর ঘোষ (নরেনের ডক্টর হ্যারিস) উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—রাগ করবারই ত কথা মশায়। আপনি ওয়ার্ডে একঘর রোগীর সামনে আমাকে যা তা বলে গাল দেবেন, আর আমি হেসে হেসে "ভীম নাগ" খাব?

"কিন্তু আমি আপনাকে গাল দিই নি ত!"

"নিশ্চয়ই দিয়েছেন—নার্স, ড্রেসার, কুলি সবাই বল্লে"—

"জানি না, তারা কি বলেছে, কিন্তু গাল আমি দিই নি। আমি বলেছি, জানেন ত আমিও ডাক্তার; এক্সপোজড্ এ্যাম্পুল আমরা মফঃস্বলেও ব্যবহার করি নে"—

"এক্সপোজড্ হলো কি করে মশাই! আপনার সামনেই গালা করে রেখেছিলুম, দেখেন নি! গালা ক'রে রাখবো না ত কি ঐ দামী জিনিষটা অর্দ্ধেক খরচ করেই ফেলে দেব। যান-না যে-কোন বড় ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন-না, কে-না এ্যাম্পুল গালা করে!"

"সেটা জান্তম না বলেই বলেছিলুম। তার জন্যে যদি মনে কিছু করে থাকেন"—

নরেন এই সময়ে এমন জোরে কেসো রোগীর মত কাসিয়া উঠিল যে বাধ্য হইয়া ভদ্রলোককে থামিয়া যাইতে হইল। কাসি থামিলে, ভদ্রলোক বলিলেন—যদিই কিছু মনে করে থাকেন, দয়া করে—

নরেন আবার কাসিতে লাগিল; এবারের কাসিটা আরও প্রবল; যেন দম বন্ধ হইবার মত। কাসি থামিবার মত নয় বুঝিয়া ডক্টর ঘোষ ভদ্রলোকটিকে ইঙ্গিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তিনি দৃষ্টির বাহির হইবামাত্র নরেন ভদ্রলোকের জামা ধরিয়া খুব জোরে এক টান দিল। ভদ্রলোক ঝাঁকানি দিয়া জামাটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন—যান্ মশাই, ছেলে নিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার আপনার কথা শুনে মামলা মোকর্দ্দমা করতে মারা যাই আর কি!

নরেন ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিতস্বরে বলিল—তার আর বড় দেরী নেই।—সেও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

সুমতি এতক্ষণ দ্বারের পাশটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘর নিরিবিলি হইতেই আলফ্রেডের কাছে আসিয়া মধুর কণ্ঠ মধুরতর করিয়া বলিল—তিনটের সময় শেষ খেয়েছেন, চার ঘণ্টা হয়ে গেছে; এখন কিছু খেতে দিই—কেমন?

অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে আলফ্রেড বলিল—খেতে আমার ইচ্ছে নেই।

কথাটা রোগীর পক্ষে বলা খুব স্বাভাবিক। তেমন অবস্থায় বাড়ীর লোকে কি-বলে, কি-করে তাহা কাহারো অজানা থাকিতে পারে না; কিন্তু হাসপাতালের নার্স তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না, অবসরও পায় না। কিন্তু সুমতি মাথা ঘামাইল। একেবারে খাটের ধারে, রোগীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িয়া, আদর করিয়া বলিল—রাগ করে খাবেন না?

"রাগ! কার ওপর রাগ করব?"

"কেন, আমার ওপর। সমস্ত দিন আসি নি বলে! কিন্তু আসবো কেমন ক'রে বলুন তো? গবর্ণমেণ্টের হাসপাতাল, সব বাঁধাধরা নিয়মে, ঘড়ির কাঁটার মত চলে, অনিয়ম করবার কি উপায় আছে?"

আলফ্রেডের অন্তরপ্রদেশ মিষ্ট কথাগুলিতে শীতল হইয়া গেল; সে চুপ করিয়া রহিল।

সুমতি ম্লান হাস্যের সহিত বলিল—অবশ্য সব নিয়ম যে সবাই মেনে চলে, তা নয়! এই দেখুন-না, একটি রোগীর কাছে এতোক্ষণ থাকার কি নিয়ম আছে? না, রোগীর বিছানায় বসে' তার আঙুল নিয়ে খেলা করারই নিয়ম আছে? খাবার আনি, কেমন?

আলফ্রেড তাহার হাতটির উপর মৃদু একটু চাপ দিয়া বলিল—আন।

সুমতি বাহির হইতে যাইবে, আলফ্রেড ডাকিল—সুমতি!

সুমতি ফিরিয়া হাসিয়া, কৃত্রিম কোপের সহিত বলিয়া উঠিল—আবার! বলেছি না, 'সিষ্টার।'

"না! আমি তোমাকে সুমতি বল্‌বো।"

কাছে আসিয়া, মুখের কাছে মুখ আনিয়া, নীচু গলায় সুমতি বলিল—কিন্তু আর কারু সামনে নয়—আমার চাকরী যাবে।—বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নরেন তখনও ফিরে নাই, ঘর 'নির্জ্জন'ই ছিল, আলফ্রেড বলিল—আর কারু হাতে খেতে আমার ভাল লাগে না; তোমার হাত ছাড়া। কেন বল ত সুমতি?

সুমতি খেলাচ্ছলে নিজের খালি হাত দুইটা ওলট পালট করিয়া দেখিয়া বলিল—কি জানি কেন—মধুটধু ত কিছু দেখছি নে। যাই, জেনারল ওয়ার্ডে একটা বুড়ী এসেছে, বড্ড কাতরাচ্ছে।

"কাতরাক্"—বলিয়া আলফ্রেড তাহার সেই শীর্ণ শুভ্র হাতখানি ধরিয়া ফেলিল।

সুমতি ম্লানমুখে বলিল—ওকথা বলতে নেই; বড্ড কষ্ট পাচ্ছে, একটা মরফিয়া ইঞ্জেকসান করে দিই গে, ঘুমুবে'খন।

"আবার আসবে, বল?"

"আসবো।"

"দেরী করবে না?"

"না।"

চার

নরেন তাহার ডক্টর হ্যারিসের খুব ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন সে বলে, লোকটার বাইরেটা ঐ রকম 'রাফ্' বটে, ভেতরটা চমৎকার। রোগীদের যা যত্ন করে, দেখ্‌লে পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করে।

আলফ্রেড হাসে; কোন কথা বলে না। তাহার বন্ধুটিকে সে চিনে ত!

অধুনা নরেন সুমতি নাম্নী নার্সটার উপর ভয়ানক রাগিয়াছে। সে ঘরে ঢুকিলেই, নরেন বাহির হইয়া যায়। তাহার অসাক্ষাতে আলফ্রেডকে শুনাইয়া শুনাইয়া কত কথাই বলে! "কি যে দাঁত বের করে হাসে ছুঁড়ী।" "ঢং করে করে চলাই বা কেমন?" "রোগীরা যেন ওঁর পেস্‌তুতো ভেয়ের মেস্‌তুতো ভাই।" "একে বলছেন 'লক্ষ্মীটি, খাও'; ওকে আদর করছেন, ঘুমোও ত সোণা; তাকে বল্‌ছেন, ছিঃ মণি, অমন অস্থিরপণা করে কি!" মরে যাই আর কি!

আলফ্রেড শুধু শুনিয়া যায়। নরেন বোঝে না, খবরও রাখে না, তাহার বিরুদ্ধ মন্তব্যের তীব্রতা আর একজনের অন্তরে কি মধুরতার সৃষ্টিই না করিয়া চলিয়াছে; নরেন যত উষ্ণ হয়, অন্যের হৃদয় তত আর্দ্র, তত সরস, তত কোমল হইয়া পড়ে; নরেনের বিদ্রূপবাণগুলা যখন তাহাকে অলক্ষ্যে দগ্ধ করিতে ধায়, এ-ব্যক্তি তখন চক্ষু মুদিয়া অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত প্রীতি উজাড় করিয়া সেই একহারা রোগা মেয়েটার সকল অঙ্গে ঢালিয়া দেয়। নরেন লোকটার রুচিটা ভিন্ন প্রকৃতির। পুরুষের সব অপরাধ, ত্রুটী, বাচালতা সে চিরকাল উপেক্ষা করিতে এতই অভ্যস্ত যে চোখেই পড়ে না; কিন্তু নারীর 'পাণ হইতে চুণ খসিলে' আর রক্ষা নাই।

সুমতি এ-সপ্তাহে সকালে ডিউটি করিতেছে, ১০টায় চলিয়া যায়, আর আসে না। নরেন তাই কতকটা প্রকৃতিস্থ আছে। কিন্তু, তাহার বন্ধু?

সেদিন অনেক রাত্রে আলফ্রেডের ঘুম ভাঙ্গিল; মনে হইল, খুব নিকটেই কে-যেন খুব করুণ সুরে কাঁদিতেছে; কাণ পাতিয়া পড়িয়া রহিল। নরেন অল্প দূরে শুইয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে। ইচ্ছা হইল, ডাকিয়া তোলে; আবার ভাবিল, কাজ নাই, সমস্ত দিন ঠায় বসিয়া থাকে, ঘুমটি ভাঙ্গিয়া দিলে আর হয়ত ঘুমাইতে পারিবে না; শরীরটা খারাপ হইয়া পড়িবে।

বাহিরে অনেকগুলা লোক জুতার শব্দে হাসপাতাল কাঁপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল; আর সঙ্গে সঙ্গেই নারী-কণ্ঠে তীব্র আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে বায়সকুল কা-কা রবে যেন ঐ নারীর দুঃখে সমবেদনা জানাইতে হা হা করিয়া উঠিল। কোথায় ছিল, পেচকের দল, তাহারাও চীৎকার করিতে লাগিল। কি করুণ, কি মর্ম্মভেদী! আলফ্রেডের বুকটা ধড়ফড় করিতে লাগিল। নরেনকে ডাকিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কণ্ঠ শব্দহীন, শক্তিহীন।

বাহিরে নারী আছাড়-বিছাড় করিয়া কাঁদিতেছে,—বলিতেছে, ওগো কেন তোমরা আমার বাছার পেট কাটাতে গেলে গো? আমার বাছাকে আমার বুকে এনে দাও গো! কেন তার পেটের শত্রুকে মেরে আমার বাছাকে বাঁচালে না গো!.....

ভয়ে আলফ্রেড আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইল, যে টেবিলের ওপর শোয়াইয়া তাহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল, ঐ অভাগিনীর কন্যাকে সেই টেবিলে শোয়াইয়া অস্ত্র করা হইয়াছিল, হয়ত সেই টেবিলের উপরেই অভাগিনীর বাছা শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে! সে যেন চোখের উপর সেই দৃশ্য দেখিতে পাইতেছে। তাড়াতাড়ি চক্ষু মুদিয়া, প্রাণপণ শক্তিতে নরেনকে ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া একটা শব্দও বাহির করিতে পারিল না। তাহার ভয় হইল, সদ্যোমৃতার মত তাহারও বুঝি বা দম বন্ধ হইয়া যায়!

কাহার কোমল করস্পর্শে চক্ষু খুলিতে খুলিতে ডাকিল—নরেন!

নরেন নয়! আলফ্রেড ব্যগ্র বাহু দু'টি মেলিয়া তাহার কটিদেশ চাপিয়া ধরিয়া, নত করিয়া বলিল—তুমি! সুমতি!

সুমতি বলিল—চুপ্! ভয় পেয়েছিলেন বুঝি?

"হ্যাঁ। বাইরে কে কাঁদছে অত? কি হয়েছে ওর?"

"শুনে আপনার লাভ কি হ'বে বলুন!"

"যে কাঁদছে, ওর মেয়ে বোধ হয়?"

"হ্যাঁ। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, ঘুমুন।"

আলফ্রেড জিজ্ঞাসিল—ছেলেমানুষ মেয়ে, না?

সুমতি বলিল—হ্যাঁ। দয়া করে আপনি চুপ করুন। অতি কষ্টে, সবার চোখ এড়িয়ে আপনার কাছে এসেছি। কেউ জান্তে পারলে, কাল আর এ মুখো হতে হবে না।—দূর করে দেবে।

আলফ্রেড বলিল—দেয়, দেবে।

"তারপর?"

"তারপর আবার কি!"

"খাব কি?"

"সে হ'বে।"

সুমতি বলিল—আপনি না ঘুমোন্ যদি, আমি যাই।

আলফ্রেড মিনতিভরা-কণ্ঠে বলিল—না, যেও না; আমি চুপ করছি, তুমি বস।

সুমতি খাটের উপর বসিয়া, বলিল—আলো নিবিয়ে দিই, কি বলেন? অন্ধকার থাক্‌লে নার্স-টার্স কেউ আসবে না, ভাববে, রোগী ঘুমুচ্ছে।

আলফ্রেড বলিল—দাও।

অন্ধকার হইতে, আলফ্রেড বলিল—তোমার ত এখন ডিউটি নয়—

"না। সিজারিন অপারেশন ছিল একটা, দেখবার, শেখবার জন্যে সকলকে আস্‌তে হয়েছিল। অপারেশন হয়ে গেল,—"

"ওঃ! সেই মেয়েটিই মারা গেল, বুঝি?"

সুমতি হাঁ না কিছু না বলিয়া, বলিতে লাগিল—ভাবলুম, আপনি ঘুমুচ্ছেন কি-না দেখে যাই। যা ভয় করেছিলুম, এসে দেখি ঠিক তাই।

"কি ভয় করেছিলে সুমতি?"

"ঐ কান্নার শব্দে—। যাক্ একটা সুখবর দিই আপনাকে। কাল আপনার পায়ের পিঠের বাঁধা খুলে দেবে। দশ দিন আজ একরকম ভাবে শুয়ে পড়ে আছেন, কাল থেকে পা'টাগুলো নাড়তে-চাড়তে পারবেন। আজ সাহেব নিজের হাতে আপনার 'টিকিটে' লিখে দিয়ে গেছেন।"

হাসপাতালে রোগীর বৃত্তান্ত-সম্বলিত নথিকে টিকিট বলা হয়।

আলফ্রেডকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, সুমতি আবার বলিল—বাঁধা যখন খুলে দিচ্ছে, তখন পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ছেড়েও দেবে বলে মনে হয়। তখন, ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাবেন।

আলফ্রেড ম্লানস্বরে কহিল—ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাব! কিন্তু আমার ত ঘরে নেই সুমতি! ঘর নেই, বাড়ী নেই, আত্মীয় স্বজন আমার যে কেউ নেই।

সুমতি ব্যথিতকণ্ঠে কহিল—তা জানি।

আলফ্রেড অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া তাহার কোলের উপর হাতখানা ফেলিয়া বলিল—তুমি জান? কেমন করে জানলে সুমতি? আমি ত তোমায় বলি নি; বন্ধুরা কি কেউ বলেছে?

"না। আপনার জন্যে এক পাদ্রীসাহেব আমাদের বড় সাহেবকে চিঠি লিখেছিলেন, যত্ন করে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করবার জন্যে, সেই চিঠি আপনার টিকিটে গাঁথা আছে, আমি দেখিছি।"

"হ্যাঁ—সে চিঠি আমরাই এনেছিলুম।"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আলফ্রেড ম্লানকণ্ঠে কহিল—বুঝতেই পারছ সুমতি, আমার পক্ষে হাসপাতালও যা, ঘর'ও তাই। এখানে তবু তুমি আছ—

সুমতি বাধা দিয়া বলিল—আমি আছি; কিন্তু আমার সঙ্গে ত ঐ দু'দিনের সম্পর্ক! ভগবান করুন, এমন সম্পর্ক যেন আপনার জীবনে আর না পাতাতে হয়!

আলফ্রেড বলিল—যদি তোমার আমার সম্পর্ক চিরদিনের সম্বন্ধ হয় সুমতি? তুমি জান, আমি ক্রীশ্চান—

সুমতি বলিল—অসুখের সময় ওসব চিন্তা করতে নেই! আপনি ঘুমোন্।

"চিন্তা—ওছাড়া আমার চিন্তা নেই; ঐ চিন্তাই আমি করি; ঐ চিন্তা রাতদিন আমার মনে লেগে আছে সুমতি। সারা দিন সারা রাত্রি তোমার মুখখানি, তোমার স্পর্শটি, তোমার কথাগুলি আমার মনের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়ায়।"

"অন্যায় করে! তবে অন্যায় আপনার নয়; আমার! কিন্তু আর একটিও কথা নয়, আপনি ঘুমোন্।"—বলিয়া সে একরকম জোর করিয়া আলফ্রেডের হাত দু'টাকে সরাইয়া দিয়া, মাথাটাকে চাপিয়া ধরিয়া শোয়াইয়া দিল।

ভোরের দিকে নরেনের ঘুম ভাঙ্গিতে, সে হৈ চৈ বাঁধাইয়া ফেলিল। "আলো নেবালে কে? কারেণ্ট গেল না-কি? আলফ্রেড কি ঘুমুচ্ছিস্"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে নরেন সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল—খাটের পিঠের বাজুতে মাথা রাখিয়া শ্রান্ত নারী এলাইয়া পড়িয়াছে; আর তাহার কোলের উপর মুখ চাপিয়া রুগ্ন, অশক্ত পুরুষ নিশ্চিন্ত-আরামে পরম সুখে নিদ্রামগ্ন!

নরেন তাড়াতাড়ি আলোটা নিবাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

পাঁচ

সপ্তাহ-ভোর সুমতির মর্ণিং ডিউটি। ৬টার সময় ডিউটিতে আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তিনীর নিকট হইতে 'ভার' বুঝিয়া লইয়া সর্ব্বপ্রথম সে আলফ্রেডের ঘরেই আসিত। তাহার মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, নিজের হাতে এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া খাওয়াইয়া তবে অন্য কাজে যাইত। আজ কুলী মুখ ধুইবার জল, তোয়ালে দিয়া গেল; এবং একটু পরে সেই ব্যক্তিই চা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। নরেন বলিল, মুখ ধো, চা খা। আলফ্রেড সাড়া দিল না। নরেনের পীড়াপীড়িতে মুখ ধুইয়া, চা খাইতে হইল কিন্তু চা যে এত বিস্বাদ, এত তিক্ত হইতে পারে তাহা আজিকার আগে সে জানিত না।

তাহার ভাব দেখিয়া নরেন চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল; এবং এই জাতীয় লোকের পক্ষে যাহা করা সম্ভব, সে তাহাই করিল। হাসপাতালের যতগুলি ডাক্তার ছিলেন, একে একে সে সকলকেই আক্রমণ করিল। হাসপাতালের ডাক্তাররা কুরুক্ষেত্রের অভিমন্যুর চেয়েও দক্ষ, কোনো অবস্থাতেই ব্যূহ-ভেদ করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নয়।

বড়বাবু বলিলেন—কিচ্ছু ভয় নেই, আপনি চলুন, আমরা যাচ্ছি। ভাল করে দেখব'খন।

কিন্তু, ঐ পর্য্যন্ত!

আলফ্রেডের মনে হইল, ঠিক পাশের কেবিনটাতে যেন সুমতি কথা বলিতেছে। কাণ পাতিয়া রহিল; শুনিল, রোগী বলিতেছে—থার্মোমিটার দিয়ে আর কি করবেন দিদিমণি! অসুখ ত অন্য কোথাও নয়—বেদনা যে এইখানে!

সুমতি বলিল—সে বেদনা বাড়ী গেলেই সেরে যাবে।

আলফ্রেড মনশ্চক্ষুতে দেখিল, সেই রোগীটি যেন বুকে হাত দিয়া বেদনা-স্থল নির্দ্দেশ করিতেছে!

কয়েক মিনিট পরেই নার্স (সুমতি) থার্মোমিটার ঝাড়িতে ঝাড়িতে এই কেবিনে প্রবেশ করিল; আলফ্রেড তাহা বুঝিয়া, চক্ষু মুদিয়া আড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

সুমতি কাছে আসিয়া বলিল—'থার্মেটার' দোব যে!

ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল, আলফ্রেড বলিল—বেদনা সারিয়ে এলে?

সুমতি হাসিয়া বলিল—ওঃ, তাই রাগ হয়েছে বুঝি! নাঃ, সারাতে আর পারলুম কৈ? সব্বাইয়ের যদি ঐ একজায়গাতেই বেদনা হয়, একলা মানুষ, আমি, সারাই কেমন করে বলুন তো!

আলফ্রেড রুক্ষভাবে কহিল—উঃ লোকটা কি অসভ্য!

সুমতি বলিল—খুব বেশী অসভ্য কি?

কথাটা কশার মত আলফ্রেডের পিঠের উপর যেন সপাৎ করিয়া পড়িয়া জ্বালা ধরাইয়া দিল। কথাটা সত্য, খুবই সত্য। সে ত আরও অনেকদূর 'অগ্রসর' হইয়াছিল। মনে হইতেই লজ্জায় সে আর সুমতির দিকে চাহিতে পারিল না।

কিন্তু, সুমতির সে-সকল ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিবার অবসর অথবা ইচ্ছা ছিল না। সে জামার বোতাম খুলিয়া, বগলে থার্মোমিটার দিয়া, তাপ পরীক্ষা করিয়া, আবার পারা নামাইতে নামাইতে বলিল—চা পাঠিয়েছিলুম, খেয়েছিলেন ত? আজ আর নিজে আস্‌তে পারি নি। শেষের কেবিনে হাত-ভাঙ্গা একটি ছেলে আছে, কাল সন্ধ্যের পর সাহেব আবার তার হাত অপারেশান করেছে, কাল সারা রাত, আজ এখন পর্য্যন্ত ছেলেটি বড্ড যন্ত্রণা পাচ্ছে। সুন্দর ছেলেটি, হাসপাতাল-শুদ্ধ লোক ছেলেটিকে ভালবাসে। সাহেব-হেন লোক, অপারেশন টেবিল থেকে নিজে কোলে করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলেন। আজ ভোরে ডিউটিতে এসে পর্য্যন্ত তাই সেখানেই থাক্‌তে হয়েছিল।

নরেন ঐ ছেলেটির সম্বন্ধেই একদিন সম্ভবতঃ কতকগুলি কথা বলিয়াছিল, আলফ্রেডের তাহা মনে ছিল; ভিতরটায় তখনও জ্বালা ছিল; বলিল—জানি; ছেলেটার বাবার কে-এক খুড়ো না মেসো গভর্ণমেণ্টের বড় চাকরে। হাসপাতাল-শুদ্ধ লোক তাই তার জন্যে সদা ব্যস্ত।

সুমতি হাসিয়া বলিল—বড় চাকরে কি-না, তা জানিও-নে, তবে সুন্দর ছেলেটি, এক মাস ধরে কী কষ্টই পাচ্ছে; আর তার বাপ-মা দু'জনেই···

আলফ্রেড ব্যঙ্গস্বরে কহিল—সজ্জন, চমৎকার, না?

সুমতি আর কোন কথা বলিল না; চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, আলফ্রেড ডাকিল—সুমতি!

সুমতি হাসিয়া ফেলিল; কহিল—নামটা আর ভুলতে পারছেন না, না?

"না, জপ করি। আমরা যে 'ক্যাথলিক', মালা জপে আমরা অভ্যস্ত।"

"কিছু বলছেন?"

"আমি শুনেছি, তুমিও ক্রীশ্চান।"

"হ্যাঁ, তাতে কি?"

"বল্‌বো?"

সুমতি মাথা নত করিয়া বলিল—না; নার্সকে ওকথা বলতে নেই।

"কেন, নার্স কি মানুষ নয়?"

"তা নয়।"

"তবে?"

"তার জীবন নিজের সুখের জন্য নয়; পর-সেবাই তার জীবনের ব্রত।"

"কোন নার্স কি বিয়ে করে না? ঘর সংসার করে না?"

সুমতি বলিল—কে কি ক'রে, না-করে তা ত' জানি নে! বলতেও পারবো না। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে যে ব্রত নিয়েছি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাই পালন করব।

আলফ্রেড তিক্তস্বরে বলিল—পাশের ঘরে যার বেদনা সারাচ্ছিলে, সে রোগীটি কে?

সুমতি বলিল—আপনারই মত একজন ইয়ংম্যান, শুনেছি, ডেপুটি।

"ডেপুটি মস্ত চাকরি, অনেক টাকা মাইনে, খুব মান, না সুমতি?"

"তা ত জানি নে। জানবই বা কি-করে বলুন? খৃশ্চান মিশনরী স্কুলের বোর্ডিং থেকে সোজা এইখানে এসেছি। পৃথিবীর সঙ্গে জানা শোনা, চেনা পরিচয় নেই বল্লেই হয়। মাপ করুন মিষ্টার বোস্। পঞ্চাশ-বাহান্নটা রোগী দোরের দিকে চেয়ে হা-পিত্যেশ করে পড়ে আছে—" বলিয়া নারী নম্র চরণ ফেলিয়া, ততোঽধিক নম্রনয়নে চাহিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

নরেন শুনিলে বলিত—ন্যাকামি! ঢং! ইত্যাদি, ইত্যাদি!

মধ্যাহ্নে সাহেব আসিয়া আলফ্রেডকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্টমনে 'টিকিটে' লিখিয়া দিয়া গেল—এখন ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারা যায়।

সুখবরটা সুমতিই দিয়া গেল; বলিল—সাহেব ত আপনাকে ছুটি দিয়ে গেলেন, মিষ্টার বোস্! কবে যাচ্ছেন, বলুন?

ব্যথিতকণ্ঠে আলফ্রেড বলিল—আমি বিদায় হলেই তুমি বাঁচ, না?

সুমতি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আলফ্রেড বলিল—কি এমন ক্ষতি তোমার করিছি আমি, সুমতি, যে আমাকে বিদায় দেবার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত? চুপ করে রইলে কেন? বল।

সুমতি বলিল—বল্‌বো! তা' বলি—দোষ কি! বিদায় করায় আমার স্বার্থ আছে।

"কি স্বার্থ তাই শুনি? ডেপুটী বাবু রাগ—"

"কি স্বার্থ শুনবেন? আপনি আর বেশী দিন থাক্‌লে আমার ব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে"—সুমতি ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

নরেন তখনি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মাগীটা চোখে কাপড় দিয়ে বেরিয়ে গেল কেন, আলফ্রেড? কিছু বলেছিস বুঝি? বেশ করেছিস্! কি করেছিল কি? একটা রিপোর্ট করে দিয়ে আসবো না কি? এ কি এ?

নরেন আলফ্রেডের চেখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল—তাহার চোখের পাতাও যে ভিজা!

আলফ্রেড অবরুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিল—কাল মেসে যাব, নরেন, সাহেব ছুটি দিয়ে গেছে!—কথাগুলা যেন ভোরের দূর্ব্বাঘাসের মত, আর্দ্র!

নরেন ছুঁড়ীটার উপরে হাড়ে চটিয়া গেল।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে আলফ্রেড একজন নার্সকে ডাকিয়া বলিল—সুমতিকে একবার ডেকে দিতে পারেন? আজ চলে যাচ্ছি, সকলের কাছেই বিদায় নিতে ইচ্ছে হয়। আপনারা সকলেই অনেক কষ্ট করেছেন, সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, সকলেই আমার ধন্যবাদ নেবেন।

নার্সটি সবিনয়ে জানাইল, ধন্যবাদের আশায় তাহারা কিছু করে নাই, তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য করিয়াছে, এই মাত্র।—সে নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আলফ্রেড বলিল—আর সুমতিকে একবার—

"খবর পাঠাচ্ছি।"

নরেন আসিয়া বলিল—চল্ রে! ট্যাক্সি এসেছে।

আলফ্রেড বলিল—তুই ততক্ষণ জিনিষপত্র তোল্। আমি আসছি।

"সে-সব হয়ে গেছে। আচ্ছা দাঁড়া, ডক্টর হ্যারিসের সঙ্গে দেখাটা করে আসি আমি।"—নরেন বাহির হইয়া গেল।

নার্স ফিরিয়া আসিয়া বলিল—very sorry মিষ্টার বোস্। সুমতি আজ সকাল থেকে সেপটিক ওয়ার্ডে গেছে। কাল রাত্রে দু'টো স্মল্ পক্সের ব্যাড (খারাপ) কেস্ এসেছে, সুমতি জোর করে সেই ওয়ার্ডে ট্রান্সফার নিয়েছে। সেখান থেকে অন্য কোনও ওয়ার্ডে আসার নিয়ম নেই। বুঝতেই পারছেন তো—

"হ্যাঁ।"

"কোয়ার্টারে ফিরলে আমি বলব'খন তাকে, আপনি দেখা করতে চেয়েছিলেন। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

বক্‌শিশের আশায় কুলী, দারোয়ানেরা ট্যাক্সির পাশে রথ দোল বসাইয়াছিল, তাহাদেরই একজনকে আলফ্রেড জিজ্ঞাসিল—সেপ্‌টিক্ ওয়ার্ড কোন্ দিকে?

সে লোকটা আঙ্গুল দিয়া পাশেরই একটা বাড়ী দেখাইয়া দিল। আলফ্রেড ট্যাক্সিচালককে সেই দিক দিয়া গাড়ী চালাইতে বলিল।

দূর হইতেই দেখা গেল, একটা খোলা জানালায় একটি নারী দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিতেই আলফ্রেড তাহাকে চিনিল। মুখ বাড়াইয়া, দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

সুমতি নমস্কার করিয়া, ত্রস্তে জানালা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

চলিয়া গেল বটে; কিন্তু করুণ দৃষ্টিটা, ততোঽধিক করুণ মুখচ্ছবিখানা লইয়া যাইতে পারিল কি?

নরেন মনে মনে বলিল—আঃ বাঁচা গেল, মাগীটা যেন আলফ্রেডকে পেয়ে বসেছিল। ছিনে জোঁক আর কি! আমি তাই পারলুম, সুধরে ফুধরে হ'লে আলফ্রেডকে একলা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত না কি! সবাই মিলে গাদার মড়া হয়ে উঠ্‌তো!

আত্মপ্রসাদে নরেন বিড়ির পর বিড়ি ফুঁকিয়া চলিল।

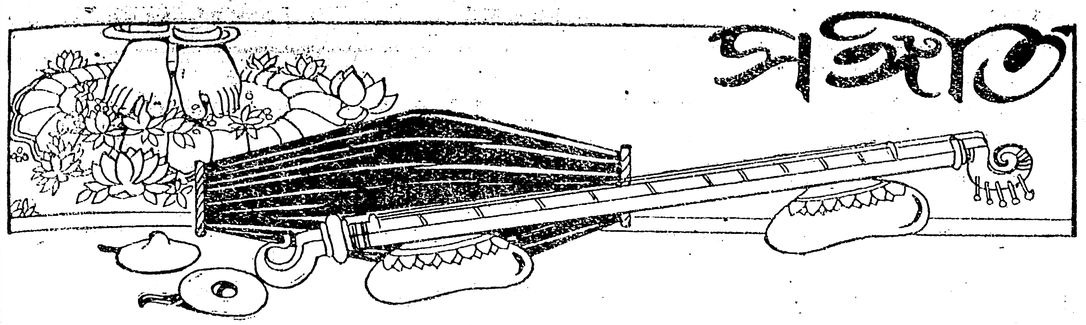

অভীপ্সা*

(ASPIRATION)

কথা ও সুর ঃ—শ্রীদিলীপকুমার রায় স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

রামকেলী-ভৈরবী-ভৈরব-জৌনপুরী……তেতালা

দিনমণি-কিরণ নীলাম্বর
ছায় সুন্দর
দূরি শর্ব্বরী অমাপুঞ্জে ;
অরুণ-বীণায় জ্যোতি সঙ্গীত
ফুটে নন্দিত
আশা-কম্পিত হৃদি-কুঞ্জে।

লহরীর বুকে যার অঞ্চল
চল-চঞ্চল
লুটে উচ্ছল কল হাস্যে ;
গাহে প্রাচী তারি স্তোম-বন্দনা
রচে মূর্চ্ছনা
মরীচি-মৃদঙ্গের লাস্যে।

যাহার বিরহে নিশি বঞ্চিত
ছিল শঙ্কিত
আজি ঝঙ্কৃত সে দিগন্তে ;
আরোহি সে উদয়-তুরঙ্গমে
ঊষা-সঙ্গমে
ধায় হিয়া দুরাশা দুরন্তে।

উরিল যে হিরণ্য স্যন্দনে
ধরা নন্দনে,—
সৃজে সেই যত প্রাণ ছন্দ ;
তাহারি বরণ উলু-উল্লোলে
ফুল-দোল্-দোলে
মিলে দিশা—ঘুচে পথ ধন্দ।

গাহে সে-সারথী! "হের পান্থ গো!
জিত ধ্বান্ত গো!
দ্রুমদল ঝলে বৈদূর্য্যে!
"কাটে ধরণীর বাধা-বন্ধন
আঁধা-খণ্ডন
ঘোষে অর্য্যমা—জয় তূর্য্যে!

"নিরালোক যত মরু কন্দর
হ'ল উর্ব্বর
সে-আলো-আসারে ওগো যাত্রী!
"শতদলে লভিল রূপান্তর
ধূলি কঙ্কর ;—
উদিল অহনা বরদাত্রী।"

* সুরটি সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলিবার আছে, যেহেতু ইহা সম্পূর্ণ নূতন ঢঙে রচিত। প্রথমতঃ যেখানে যেখানে যতিচিহ্ন (।) সেখানে সেখানে নির্দ্দিষ্ট মাত্রাকাল বিরাম দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। নহিলে সুরটির নৃত্যভঙ্গী বা "লচক" তেমন ফুটিবে না। তাই বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে এই কয়টি বিরামের প্রতি ঃ—

০ ১ + ৩
রা মা পা পর্সা | ণদা ণদা পর্দা মা | মপা -া পা পা | া া দপা মগা |
দি ন ম ণি কি র ণ নী লা ম্ ব র - - ছা য়
উ রি ল যে হি ০ র ন্ ন স্য ন্ দ নে - - ধ রা

০ ১ + ৩
গমা পদা পা পা | া া া া | পা ণা ধা ণা | পা ণদপা মগা মা |
সুন্ - দ র - - - - দূ রি শ র্ ব রী অ মা
নন্ - দ নে - - - - স্ব জে সে ই য ত প্রা ণ

০ ১ + ৩
গমা পদা মপা -া | া া া া | পা ণদা না না | র্সা -া র্সা র্সা |
পুন্ - জে - - - - - অ রু ণ বী ণা য় জ্যো তি
ছন্ - দ - - - - - তা হা রি ব র ণ উ লূ

০ ১ + ৩
নর্সা নর্সনা দা পা | -া দা না র্সা | নর্সা নর্সনা দা পা | দা -া মা -া |
সং - গী ত - - ফু টে নন্ - দি ত - - - -
উল্ - লো লে - - ফু ল দোল্ - দো লে - - - -

০ ১ + ৩
মা ণা দপা মা | গমা সঋা গা মা | গঋা গঋা সা -া | -া -া -া -া |
আ শা ক ম্ পি ত হৃ দি কু ন্ জে - - - - -
মি লে দি শা ঘু চে প থ ধ ন্ দ - - - - -

সা ঋা সমা মা | মা মা মগা মা | গপা -া পজ্ঞা পা | া া দপা মগমা |
ল হ রী র বু কে যা র অ ন্ চ ল - - চ ল
গা হে সে সা র থী হে র পা ন্ থ গো - - জি ত

"নীলাম্বর" ও "স্যন্দনে," "অঞ্চল" ও "পান্থগো," "বন্দনা" ও "বন্ধন"—এই কয়টি কথার পরে দুইমাত্রা বিরাম প্রত্যেক ক্ষেত্র ; "সুন্দর" ও "নন্দনে" "পুঞ্জে ও "ছন্দে" "হাস্তে" ও "বৈদূর্য্যে"—এই কয়টি কথার পরে চারিমাত্রা বিরাম প্রত্যেক ক্ষেত্রে। ইহা ভিন্ন দ্রষ্টব্য যে, গানটিতে বিশেষ করিয়া হর্ষ ও উল্লাসের তানই লাগিবে এইভাবে :—

"দিনমণি-কিরণ...পুঞ্জে" ও "উরিল...ছন্দ"তে জৌনপুরীর তান ;
"অরুণ...কুঞ্জে" ও "তাহারি ধন্দ"তে রামকেলীর তান ;
"লহরীর...লাস্তে" ও "গাহে সে...তূর্য্যে"তে ভৈরবের তান ;
"আজি ঝঙ্কৃত...দুরন্তে" ও "সে আলো...বরদাত্রী"তে ভৈরবীর তান।

ইহা ভিন্ন কালাংড়া ও তোড়ির নানা ছোট ছোট তান লাগিতে পারে। সে-সব গায়কের সৃষ্টি-প্রতিভার উপর নির্ভর করে—স্বরলিপিতে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব নহে।

গমা পদা দা দা | -া -া -া -া | পা দা পা দা | মা দা দা না |
চ ন্ চ ল - - - - লু টে উ চ্ ছ ল ক ল
শ্রা ন্ ত গো - - - - ক্র ম দ ল ঝ লে ব ই

না সা নর্সা নদা | া া া া | দা ঋর্া র্সা র্সঋর্া | র্সনা র্সা দা র্সা |
স্ব স্ সে - - - - - গা হে প্রা চী তা রি স্তো ম
দূ র্ যো - - - - - কা টে ধ র নী র বা ধা

নদা ধদা দা পা | া া পা র্সা | নদা ধদা দা পা | দা মা -া -া |
ব ন্ দ না - - র চে মূ র্ ছ না - - - -
ব ন্ ধ ন - - আঁ ধা খ ন্ ড ন - - - -

মা ণা দা পমা | গমা গমা সা ঋা | সমা -া মা -া | -া -া -া -া |
ম রী চি মূ দ ঙ্ গে র লা স্ স্তে - - - - -
বৈ যে অ র্ য্য মা জ য় তূ র্ য্যে - - - - -

মা পা পা ণদা | দা না না র্সা | র্সা -া র্সা ঋর্া | -া -া র্সা র্সনা |
যা হা র বি র হে নি শি ব ন্ চি ত - - ছি ল
নি রা লো ক য ত ম রু ক ন্ দ র - - হ' ল

র্সা -া র্সা ঋা | -া -া -া -া | র্সা জ্ঞর্া ঋর্া র্সা | ণদা ণদা ণদা দমা |
শ ঙ্ কি ত - - - - আ জি ঝ ঙ্ কৃ ত সে দি
উ র্ ব র - - - - সে আ লো আ সা রে ও গো

ণদা র্সণা র্সা -া | -া -া -া -া | র্সা র্মা জ্ঞর্া ঋর্া | র্সা ণা ণা র্সা |
গন্ - তে - - - - - আ রো হি সে উ দ য় তু
যা - ত্রী - - - - - শ ত দ লে ল ভি ল রূ

ণপা ণা দা পা | -া দা ণা র্সা | ণপা ণা দা পা | -া -া মজ্ঞা রজ্ঞা |
র ঙ্ গ মে - - উ ষা স ঙ্ গ মে - - - -
পা ন্ ত র - - ধূ লি ক ঙ্ ক র - - - -

জ্ঞা -া জ্ঞরা মজ্ঞা | সা জ্ঞা পা মা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া | -া -া -া -া |
ধা য় হি য়া দু রা শা দু রন্ - তে - - - - -
উ দি ল অ হ না ব র দা- - ত্রী - - - - -

প্রাচীন কলিকাতা-পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ

শত বৎসর পূর্ব্বে হাইকোর্টের জুরিদিগের এক প্রকার কোট্ জামা পরা নিয়ম ছিল—অন্য রূপ পোষাক চলিত না।

* * * *

সাহেব আলবোলায় তাম্রকুট সেবন করিতেছেন

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডিনার-পার্টিতে যাইবার জন্য এক প্রকার সাদা জ্যাকেট্ জামা পরিধানের ব্যবস্থা ছিল।

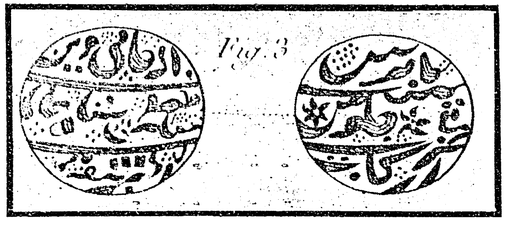

আর্কট্ মুদ্রা

* * * *

ইংরাজ-মহলে সেকালে যাঁহারা তাম্রকুট সেবন করিতেন, তাঁহারা প্রায় আলবোলা ব্যবহার করিতেন। পাছে আলবোলার নল নষ্ট হইয়া যায়, এ জন্য প্রত্যেকের চেয়ারের পশ্চাতে একখানি কার্পেটের উপর উহা রাখা হইত। মেয়েরাও কেহ কেহ তামাকু সেবন করিতেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে একজন সিভিলিয়ান্ এই প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন, "……It is too masculine" সাহেবদের জন্য তামাকে তখন মৃগনাভি, গোলাপজল, কিশমিশ প্রভৃতি দেওয়া হইত। অনেকে প্রত্যেক খানার পর এবং কেহ কেহ সমস্ত দিন তামাকু সেবন করিতেন।

* * * *

হিন্দুস্থানী ও ফার্সি ভাষা শিক্ষার জন্য পূর্ব্বে সাহেবদের সপারিষদ গভর্ণর কর্ত্তৃক পারিতোষিক স্বরূপ বহু মুদ্রা দিয়া সম্মানিত করা হইত। এই হিসাবে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ৫০০ হইতে ১৬০০ সিক্কা টাকা চৌদ্দটি পারিতোষিক দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

* * * *

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফোর্ট্ উইলিয়ম্ দুর্গে সামান্য সিপাহী হইতে মেজর, হাবিলদার, সুবাদার প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর সামরিক কর্ম্মচারীদের পোষাকের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকার বস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

* * * *

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কোম্পানীর অধিকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহের নিম্নলিখিতরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।—

(১)	দুর্গ ও তাহার মধ্যবর্ত্তী গৃহসমূহ	১২০০০০৲
(২)	হাঁসপাতাল্	১২০০০৲
(৩)	আস্তাবল সমূহ	৪০০০৲

(৪)	জেলখানা	৭০০০৲	(১১)	ডক্ ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি	৭০০০৲
(৫)	সোরার গুদাম	৭০০০৲	(১২)	নবনির্ম্মিত মালগুদাম	২৫০০০৲
(৬)	কাছারি বাটী	১৫০০৲	(১৩)	বাগবাজারের রিডাউট্ বা রক্ষামঞ্চ	২১০০০৲

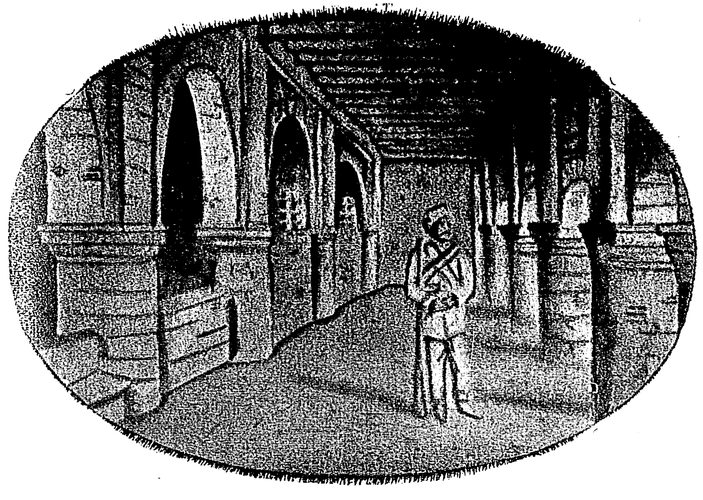

অন্ধকূপ-হত্যার ঘর। (কাল্পনিক চিত্র); লোহার গরাদে দেওয়া জানালা দেখা যাইতেছে

(৭)	কোতোয়ালি হাজত	১০০০৲	অপরাধী নয়ান ছুতারকে প্রথম তোপের মুখে উড়াইয়া
(৮)	দুইটী পোল	৭০০০৲	দেওয়া হয়।

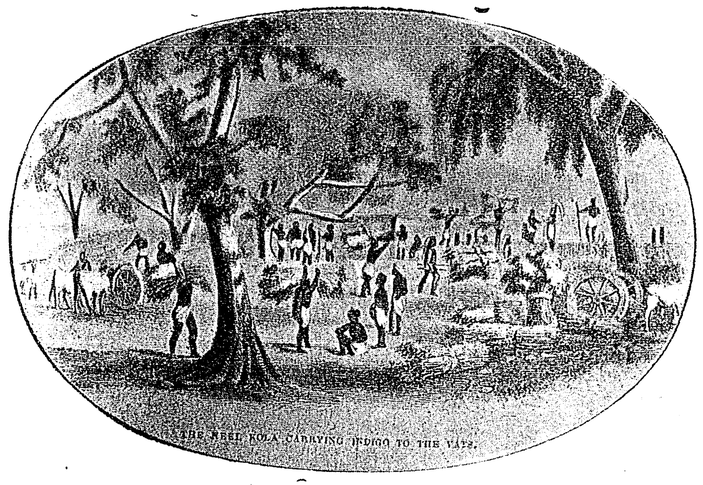

নীলখোলা—ভ্যাটে নীল লইয়া যাইতেছে

(৯)	ছিট্ প্রস্তুতকারকদের বাটী	৬০০০৲	দিতেন। নবাব মিরজাফর কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে যে
(১০)	বারুদখানা	৬৯২৫৲	উপহার দেওয়া হইয়াছিল তাহার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা।

* * * *

পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানীর প্রধান প্রধান অফিস-সমূহে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

* * * *

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ডের আদেশ হয়, পূর্ব্বের প্রথানুসারে চরম অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে চাবুকের আঘাতে মৃত্যু সংঘটন ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। এই আদেশ প্রচারের কয়েক দিন পরে হত্যাপরাধে

* * * *

ডাকচৌকী ও ডাক-পিয়াদা দ্বারা কলিকাতা হইতে মুরশীদাবাদ এবং মুরশীদাবাদ হইতে কলিকাতায় ৩০ ঘণ্টার মধ্যে সংবাদাদি আসিবার ও যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাই ধরিতে গেলে কলিকাতার প্রথম ডাক-ব্যবস্থা।

* * * *

সেকালে কোন বিশিষ্ট অতিথি আসিলে কোম্পানী বাহাদুর তাঁহার আদর আপ্যায়নে কলিকাতায় বহু অর্থ ব্যয় করিতেন; তদ্ভিন্ন বহু প্রকার মূল্যবান দ্রব্য উপহার

মহারাজ তিলকচাঁদকে যে উপহার দেওয়া হইয়াছিল তাহার মূল্য প্রায় আট হাজার টাকা।

* * * *

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ কৃত ভগবদ্গীতার ইংরাজি অনুবাদ প্রতি কপি সুর সাণ্ডার্স্ ও লেসি কোম্পানীর কার্য্যালয়ে এক মোহর মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। উহার ছাপা হইয়াছিল বিলাতে।

* * * *

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থশালী সাহেবরা রাত্রে বাতির আলো বেশী ব্যবহার করিতেন। ঐ বাতি কালনায় প্রস্তুত হইত। দর ছিল প্রতি মণ ৫৫ সিক্কা টাকা।

* * * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সন্ধ্যার পর মদের দোকান খোলা রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় পূর্ব্বে বহু প্রকার মুদ্রা প্রচলিত

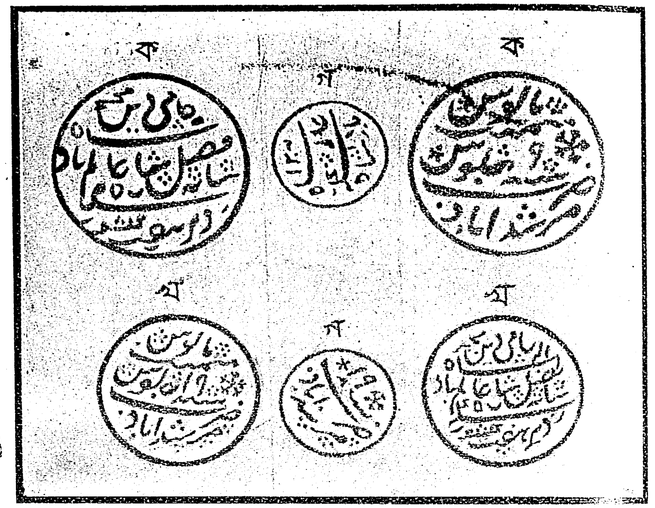

মুরশীদাবাদ টাঁকশালে প্রস্তুত মুসলমান বাদশার নামাঙ্কিত কোম্পানির মুদ্রা

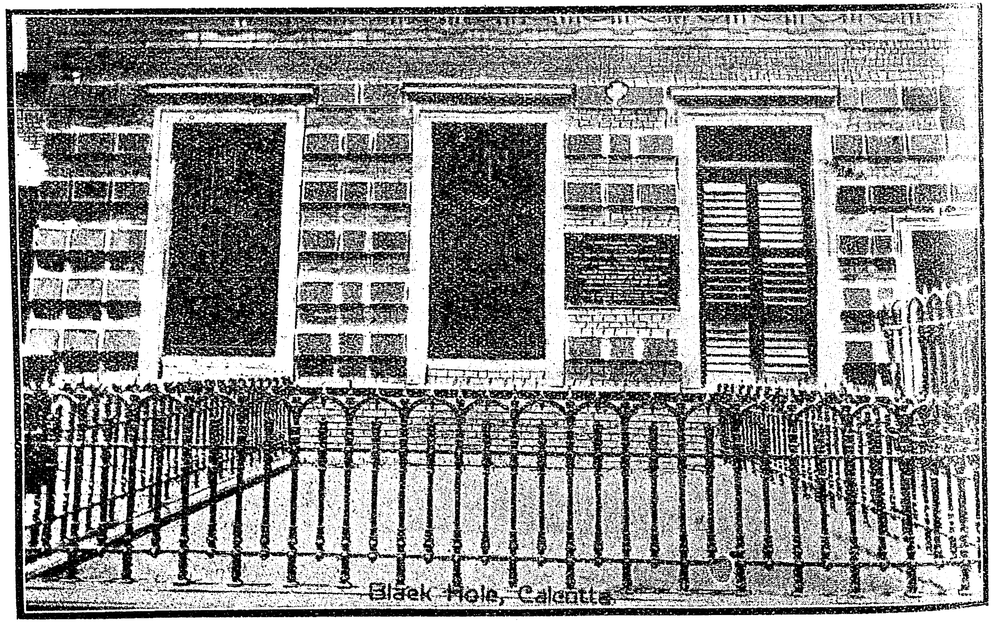

এই স্থানে অন্ধকূপ-হত্যা হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে

ছিল। কলিকাতার সিক্কা টাকার সহিত ঐ সকল মুদ্রার আসল মূল্যের তুলনা এই প্রবন্ধের অন্যত্র দেওয়া হইল।

ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে কোম্পানী নিজের টাঁকশালে সর্ব্বপ্রথম টাকা তৈয়ারি করেন। অবশ্য এ টাকা উর্দ্দু-ফারসী ভাষায় দিল্লীর বাদশাহের নামাঙ্কিত হইয়া বাহির হইত। ইংলণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়মের সময় হইতে কোম্পানী ইংলণ্ডাধিপের মূর্ত্তি সম্বলিত মুদ্রার প্রথম প্রচলন করেন।

* * * *

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রেরিত ভারতীয় নীল ইণ্ডিয়া হাউসে প্রতি বৎসর যাহা বিক্রয় হইত তাহার মূল্য দেড় লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক।

* * * *

পূর্ব্বে যখন বরফের প্রচলন হয় নাই, তখন সাহেবদের পানীয় জল ও মদিরা শীতল করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সোরা ব্যবহৃত হইত। এই সকল সোরার জল নালা

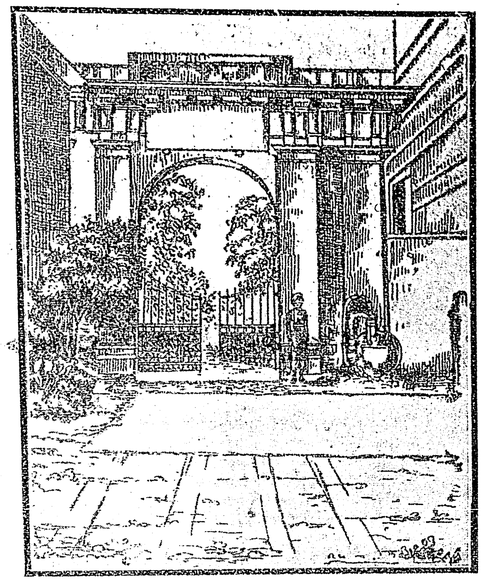

ইহার নিকটেই অন্ধকূপ-হত্যা হইয়াছিল

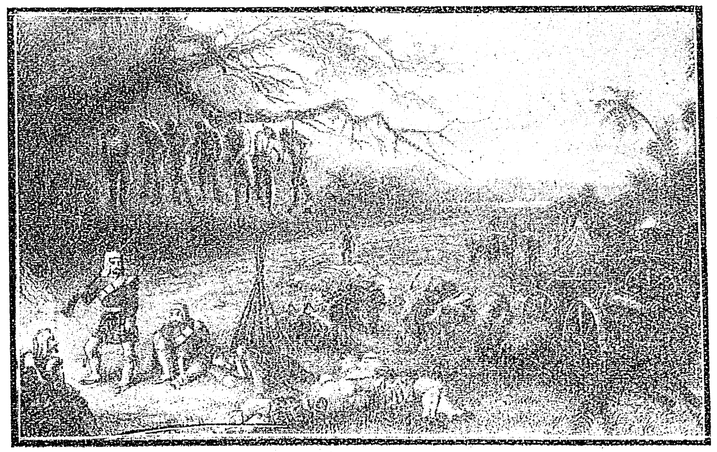

সিপাহী বিদ্রোহের দৃশ্য।—১ম চিত্র

বাহিয়া পড়িয়া বৃথা নষ্ট হইত। কিন্তু উহা ফুটাইয়া লইলে এই জল হইতে পুনরায় সোরা পাওয়া যাইত। এই জন্য

সোরার জল সংগ্রহ করিবার জন্য জমা দিবার ব্যবস্থা ছিল। উহার বাৎসরিক হার ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল এক শত টাকা।

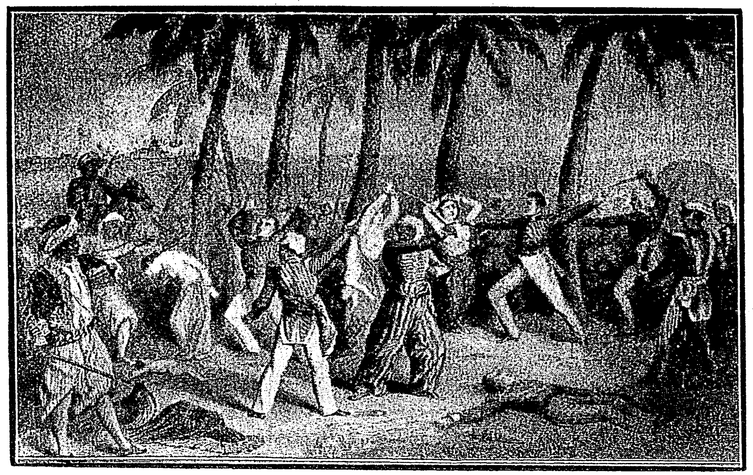

সিপাহী-বিদ্রোহের দৃশ্য—২য় চিত্র

* * * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও খিদিরপুরে ছোট ছেলে ও বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিবার একটী

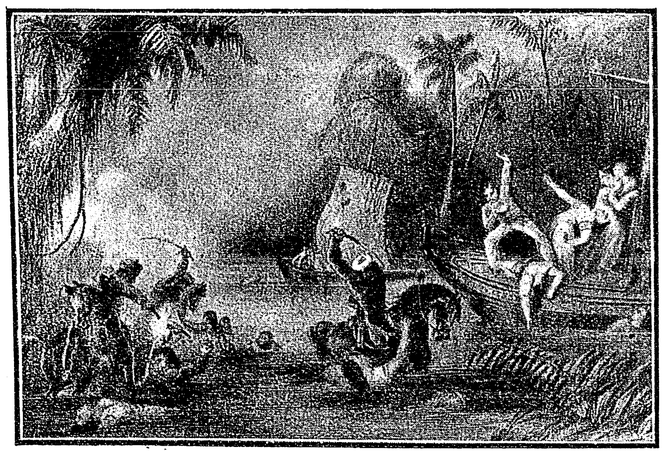

সিপাহী-বিদ্রোহের দৃশ্য—৩য় চিত্র

গুপ্ত আড্ডাগৃহ ছিল। এখান হইতে অনেক ক্রীতদাস নানা স্থানে চালান হইত।

* * * *

সেকালে নববর্ষ ও ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষে প্রভাতে তোপধ্বনির সহিত আরম্ভ হইয়া সারা দিনরাত্রি-ব্যাপী নৃত্যগীত ভোজাদির দ্বারা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে দেশীয় বাইনাচেরও স্থান ছিল।

* * * *

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে কোন ভদ্রশ্রেণীর প্রজা তাহার অভাব অভিযোগ জানাইতে পারিত।

* * * *

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর রাসেল্ (The Hn'ble John Russell) সাহেবের বাৎসরিক বেতন ছিল ১৬০০৲ টাকা, এবং তিনি পারিতোষিক হিসাবে পাইতেন ৮০০৲।

* * * *

এদেশে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মুদ্রার সিক্কা টাকার তুলনায় আসল মূল্য

		Rs.	A.	P.
Siccas of Murshidabad, Patna and Dacca, per Sicca weight	100	100	0	0
Pholy Sonats	„	100	0	0
Delhy Mahomet Shai	„	99	8	0
Money Surat, large	„	99	8	0
Benares Sicca	„	99	8	0
Bissun Arcot	„	97	14	0
Sonats Sabic and Duckie	„	97	8	0
Forshee Arcots	„	97	6	6
French Arcots	„	97	0	0
Patanea Arcots	„	96	9	6
Aurangzebee Arcots	„	96	9	6
Gursaul	„	96	9	6
Madras Arcots, new	„	96	4	9
	100	Rs.	As.	P.
Muslipatam & Shardar Arcots	„	96	0	0
Patna Sonatts, old	„	96	0	0
Benares Rupees, old	„	95	14	6
Madras Arcots, old	„	95	14	6
Furrackabad Rupees	„	95	12	9
Jehanjee Arcots	„	95	11	3
Chunia Arcots	„	95	11	3
Calcutta & Moorshedabad Arcots	„	95	6	6
Old Arcots	„	95	3	3
Dutch Arcots	„	95	0	0
Surat Arcots	„	94	0	0
Benares Trisolie	„	92	6	6
Viziercy Rupees	„	63	0	0
Narrany Half-rupee, new	„	63	0	0

দস্যুদের উৎপাত আরম্ভ হয়,—উহাই বর্গীর হাঙ্গামা নামে খ্যাত। এই বর্গীদের জন্য বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ সত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার

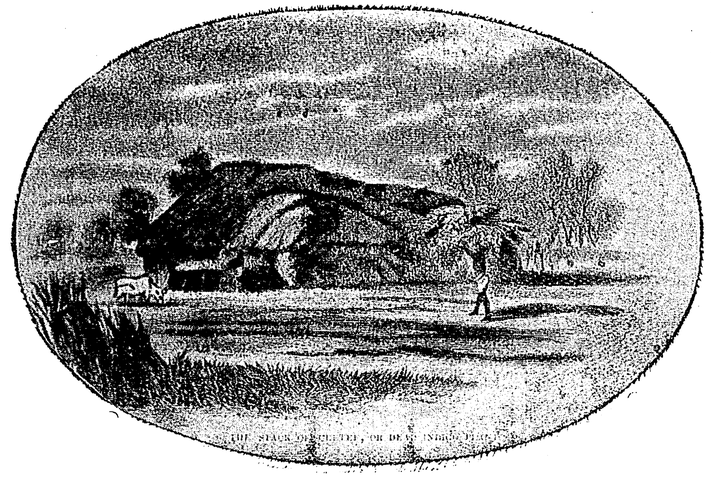

নীলের স্তূপ

উৎপাৎ হইতে কলিকাতাকে নিরাপদ করিবার জন্যই সহরের চতুর্দ্দিকে "মহারাষ্ট্র খাত" (Mahratta Ditch) খননের ব্যবস্থা হয়। ছয় মাসে প্রায় অর্দ্ধেকাংশ খনন করা হইয়াছিল। পরে কাজ বন্ধ করা হয়। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে এই খাত সহরের জঞ্জাল ও ময়লা দ্বারা ভরাট করিয়া ফেলা হয়।

* * * *

বর্গীর হাঙ্গামা—নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে মহারাষ্ট্র

বিবিধ দৈব বিপত্তি

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ঝড়—এরূপ ভীষণ ঝটিকা বঙ্গদেশে পূর্ব্বে কখন হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। নব উন্নতি-মুখ-প্রধাবিত কলিকাতা নগরীর ইহাতে ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল। উহার উন্নতি-পথের ইহাই প্রথম প্রতিবন্ধক। উহা ৩০এ সেপ্টেম্বর বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ হইয়া ৬০ লিগ্ দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রধাবিত হয়। ইহার সঙ্গে ভূমিকম্পও ছিল। কথিত আছে, বিশ হাজার নৌকা ভড়, বোট, জাহাজ, বজরা, জেলেডিঙ্গী প্রভৃতি ডুবিয়া বা ভাঙ্গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং বহুসংখ্যক মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ও পক্ষী মারা পড়িয়াছিল।

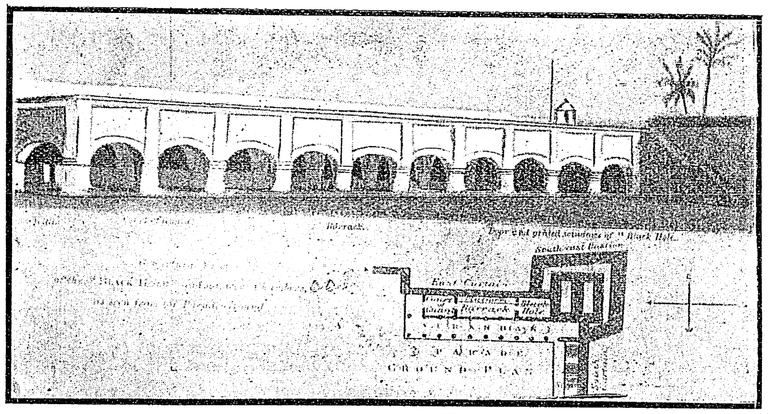

দুর্গমধ্যস্থ অন্ধকূপ-হত্যার গৃহ ও তৎসংলগ্ন কক্ষসকল—(কাল্পনিক চিত্র)

* * * *

নবাব কর্ত্তৃক আক্রমণ—উন্নতিশীল কলিকাতা নগরীর ইহাই দ্বিতীয় প্রবল আঘাত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং দুর্গ জয় করেন। এই সময় অধিকাংশ ইংরাজ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ফল্‌তায় পলায়ন করেন। এই আক্রমণের ফলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ "অন্ধকূপ হত্যা" ঘটে। নবাবের সহিত

সোরীর দ্বারা জল ঠাণ্ডা করিতেছে

এই যুদ্ধের জন্য লালদীঘির পার্শ্বস্থ বহু সংখ্যক বড় বড় বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বড়বাজার ও লালবাজার প্রভৃতি স্থানের অনেক অট্টালিকা নবাব সৈন্যের দ্বারা অগ্নিযোগে এবং গোলার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। দুর্গ-সান্নিধ্যে

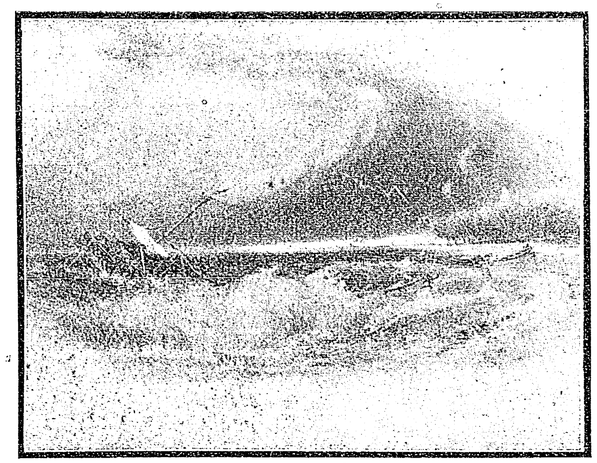

কলিকাতায় নদীবক্ষে ঝড়

প্রাচীন সেণ্টএন্ গির্জ্জাটিও বিধ্বস্ত হয়। কিছুদিনের জন্য প্রাচীন কলিকাতা অনেকাংশে হতশ্রী হইয়া পড়ে। সিরাজ্ কলিকাতার নাম আলিনগর রাখিয়াছিলেন।

পলাশী যুদ্ধের পর নবাব মীরজাফরের সহিত ইংরাজের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নবাবকে এক ক্রোর টাকা দিতে হয়। কটন সাহেবের মতে ইংরাজ অধিবাসীরা পঞ্চাশ লক্ষ, হিন্দু-মুসলমানেরা কুড়ি লক্ষ এবং আর্ম্মিনীয়গণ সাত লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইয়াছিলেন। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের সাত মাস পরে লর্ড ক্লাইভ্ ও ওয়াটসন্ কর্ত্তৃক উহা পুনরাধিকৃত হয়।

* * * *

ভীষণ মড়ক—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভীষণ মড়ক হইয়াছিল। সে সময় জ্বরই প্রধান ব্যাধি ছিল। এড্‌মিরাল্ ওয়াটসন্ ও বহু ইংরাজ এই সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৬২ অব্দে আর একবার মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

* * * *

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী—সমগ্র বঙ্গদেশ-ব্যাপী এই দুর্ভিক্ষ ও সঙ্গে সঙ্গে মহামারীতে অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক কলিকাতাতেই জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট প্রায় ৭৬০০০ লোক মারা যায়। তন্মধ্যে ১৫০০ সাহেব ছিল। কলিকাতার রাজপথ ও অলি-গলি সমূহ মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সৎকারের লোকের অভাব হইয়াছিল।

* * * *

১৮৬৪ ও ৬৭ খৃষ্টাব্দের ঝড়—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর বেলা ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত হয় তাহাতে অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে এক সহস্রের উপর লোক মারা পড়ে এবং ৫০০ বাড়ী ও বহু সহস্র কুঁড়ে ঘর বিনষ্ট হয়।

* * * *

বিচারপতি নরম্যানের হত্যা—১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে এক্টিনী প্রধান বিচারপতি জন্ নরম্যানকে (Mr. John Paxton Norman) টাউন-হলের উত্তর বারাণ্ডায় সিঁড়িতে একজন ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান আহত করে। তিনি সেই দিন রাত্রেই মারা যান। তৎকালে টাউনহল্ অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল।

* * * *

লর্ড মেয়োর হত্যা—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড্ মেয়োকে পোর্ট ব্লেয়ারে একজন কয়েদী ছুরি মারে, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ১৭ই তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনীত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুকালীন অভিপ্রায় অনুসারে সমাধির জন্য উহা আয়ারল্যণ্ডে প্রেরিত হয়।

* * * *

সেকালের দুর্ভিক্ষ—১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে একবার দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় শস্যের দর কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নিম্নের লিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

	চাউলের দর প্রতি টাকায়	অন্যান্য শস্যাদি প্রতি টাকায়	গম প্রতি টাকায়	ময়দা প্রতি টাকায়	তৈল প্রতি টাকায়
১৭৫১	১ মঃ ৩২ সের	১ মণ	১মঃ ৩২ সের	১ মঃ ৩ সের	১ মণ
১৭৫৭	১ মঃ ১৬ সের	২২ সের	১ মঃ ২ সের	১ মণ	১ মণ

* * * *

সিপাহী-বিদ্রোহ—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কানপুর দিল্লী লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির তুলনায় কলিকাতার বিশেষ অনিষ্ট সাধিত না হইলেও এই স্থানও ভীষণ ত্রাস-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত ইংরাজদের পক্ষে ভারতে এরূপ নিদারুণ চিন্তাকর ঘটনা কখনও ঘটে নাই।

৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সেকালে বাঙ্গলাদেশের অনেক লোক প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, একালেও অনেকে করিতেছেন। কিন্তু, উপার্জ্জিত অর্থের ব্যয়ের ব্যবস্থার সম্বন্ধে সেকালে ও একালে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। একালের লোক অর্থ ব্যয় করেন নিজের ভোগ-সুখের জন্য। ক্বচিৎ কদাচিৎ কেহ কেহ "নাম কা ওয়াস্তে" কোন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাই একালের অর্থ ব্যয়ের সাধারণ নিয়ম। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও যে ঘটে না তাহা নহে; এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ, সার তারকনাথ পালিত প্রভৃতি এই ব্যতিক্রমের দলে।

সেকালে কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করাই সাধারণ নিয়ম ছিল। ক্বচিৎ কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত। সেকালের যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, আজ "ভারতবর্ষ" তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-কথার আলোচনায় সুযোগ পাইয়া ধন্য হইল।

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় জমিদার-বংশ দেশবিশ্রুত। বহু মনীষী ব্যক্তি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিয়া গিয়াছেন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বংশের অন্যতম কুলতিলক ও অলঙ্কার। এই কারণে পুণ্যশ্লোক জয়কৃষ্ণের প্রাতঃস্মরণীয় নাম বঙ্গদেশবাসী ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিয়া থাকেন।

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃত্তিবাসের জন্মভূমি সুপ্রসিদ্ধ ফুলিয়া গ্রামে। জয়কৃষ্ণের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ গঙ্গাধর সেকালের একজন বিখ্যাত সমাজপূজ্য কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ফুলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী খামারগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। জয়কৃষ্ণের পিতামহ নন্দগোপাল ঢাকার কালেক্টারীতে মুন্সীগিরি

করিতেন। তিনি পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশে বিবাহ করিয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। জয়কৃষ্ণের পিতা জগমোহন উত্তরপাড়ার ৺তারাচাঁদ তর্কসিদ্ধান্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি কলিকাতায় কমিসেরিয়াট বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। জয়কৃষ্ণের মাতুল জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার তৎকালে ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

জয়কৃষ্ণ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। সন ১২১৫ সালের ৯ই ভাদ্র (১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট) জন্মাষ্টমী তিথিতে উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথিতেই দ্বাপরযুগে মথুরায় কংস-কারাগারে দেবকীর গর্ভে বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

জয়কৃষ্ণের পিতা জগমোহন তৎকালে চতুর্দ্দশ সংখ্যক গোরা পল্টনের বেনিয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে জয়কৃষ্ণ শৈশবকাল হইতেই গোরা ফৌজের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। তিনি বৃটিশ সৈনিকদিগের পুত্রগণের সহিত একত্র অধ্যয়ন ও খেলাধূলা করিতেন। ইহার ফলে সেনাবিভাগের নিয়মানুবর্ত্তিতা, বীরত্বব্যঞ্জক ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে বীরোচিত ভাব সকলের উন্মেষ ঘটে। শৈশবে কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিবার পর জয়কৃষ্ণ পিতার সহিত মীরাটে চলিয়া যান। সেখানে তিনি সৈনিকদিগের পুত্র-কন্যাগণের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই জয়কৃষ্ণ বিলক্ষণ মেধাবী ছিলেন; তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ও স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল। বিনয়, শিষ্টাচার, কার্য্যদক্ষতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণে তিনি সর্ব্বত্র আদরণীয় ছিলেন। সৈনিকগণের ব্যবহারের জন্য মীরাটে যে একটি পুস্তকাগার ছিল, জয়কৃষ্ণ তাহার সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সৈন্য ভরতপুরে অভিযান করে এবং ভরতপুরের অজেয় দুর্গ অবরোধ করে। জেনারেল এ্যাণ্ডারসন এই বাহিনীর পরিচালক ছিলেন। জগমোহন ও জয়কৃষ্ণ এই সৈন্যদলের সহিত কেরাণীরূপে ভরতপুরে গমন করিয়াছিলেন। দুর্গ বিজীত হইলে জয়কৃষ্ণ ও তাঁহার পিতা প্রচুর অর্থলাভ করেন। তৎপরে তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ অর্থে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। ইহাই উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার-বংশের প্রথম সূচনা। ইহার পর জয়কৃষ্ণ কয়েক বৎসর হুগলীর কালেক্টারীতে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহের অবসানে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে জয়কৃষ্ণ হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ও চব্বিশপরগণা জেলায় প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। এইরূপে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরিচালন করিয়া অসাধারণ অধ্যবসার বলে তিনি একজন বড় জমিদার বলিয়া গণ্য হইলেন।

তখনকার কালের লোকে ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া তাহার কিরূপ সদ্ব্যয় করিতেন,—জয়কৃষ্ণের পরবর্ত্তী আচরণে আমরা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

জয়কৃষ্ণ একদিকে যেমন প্রচুর সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তাহার সমুচিত সদ্ব্যয়ও করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জমিদার হইয়া প্রজাসাধারণের প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণসাধনে যত্নবান হইলেন। তাঁহার অদম্য চেষ্টায় প্রচুর অর্থব্যয়ে নগণ্য গ্রাম উত্তরপাড়া প্রায় সহরে পরিণত হইল; রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হইল ও গ্রামখানি কতকগুলি প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যরাজিতে পরিশোভিত হইল। জয়কৃষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা প্রথমে চরিশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে উত্তরপাড়া হাসপাতাল নির্ম্মাণ করাইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে উত্তরপাড়া ইংরেজী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের নিত্য-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক দুই সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইল।

উত্তরপাড়ার সাধারণ পুস্তকাগার বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। একলক্ষ টাকা ব্যয়ে জয়কৃষ্ণ ইহার জন্য গঙ্গাতীরে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; এবং আরও প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ইহার জন্য পুস্তকাদি খরিদ করিয়া দেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও নিত্য-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক তিন সহস্র টাকার আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয়। জয়কৃষ্ণের আমন্ত্রণে লর্ড ডাফরিণ, লর্ড রিপণ প্রভৃতি বহু উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বহু দেশপূজ্য ব্যক্তি এই লাইব্রেরী পরিদর্শন করিতে

আসিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি কেবল স্বয়ং জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তৃপ্ত হন নাই—তাঁহার স্বদেশবাসীর জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পরিণাম—উত্তরপাড়ার কলেজ। কিন্তু দেশবাসীকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য একটিমাত্র কলেজ স্থাপন করিয়া নিরস্ত হইবার তিনি ছিলেন না। তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্রমান্বয়ে মোট ৩১টি উচ্চ ইংরেজী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আর উত্তরপাড়ায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হাসপাতালটি তাঁহার একমাত্র দান নহে—পীড়িত ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণের চিকিৎসার সুবিধার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে ১৮টি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়া গ্রামের সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ তিনি নিজব্যয়ে যে সকল রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত, আরও নানা স্থানে স্বব্যয়ে বহু রাস্তাঘাট, সেতু, ও বাঁধ নির্ম্মাণ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল-সংস্থানের জন্য বহু পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশবাসীর কল্যাণ-সাধনার্থ মহাপ্রাণ জয়কৃষ্ণ অন্যূন দশলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কৃষকগণের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার নূতন চাষের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নীলসমস্যা তখন তখন দেশের একটা বড় সমস্যা ছিল। নীলকরের অত্যাচার দমনেও জয়কৃষ্ণ বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গের কৃষক-জীবন অবলম্বন করিয়া একখানি উপন্যাস রচনার জন্য জয়কৃষ্ণ এক সহস্র টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে "গোবিন্দ সামন্ত" বা "Bengal Peasant Life" গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

তৎকালীন রাজনীতির সহিতও জয়কৃষ্ণের সংশ্রব ছিল। রাজনীতির আলোচনাতে তিনি বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার জাতীয় মহাসমিতির (Indian Natinal Congress) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে জয়কৃষ্ণ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন।

বাঙ্গলার জমিদার সম্প্রদায়কে দেশসেবার কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য জমিদারগণের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তিনি রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি তৎকালীন সমাজপতিগণের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করেন। তাহার ফলে তাঁহাদের চেষ্টায় বাঙ্গালার জমিদার সম্প্রদায়ের মুখপাত্র British Indian Association প্রতিষ্ঠিত হয়।

জয়কৃষ্ণের সমসময়ে যত কিছু দেশ ও জনহিতকর অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশের সহিত তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল জনহিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণের দ্বারা যে সকল অনুষ্ঠান হইত, তাহাতেও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন, এবং মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। ৬৫ বৎসর বয়সে চক্ষুরোগে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তথাপি, সাধারণের হিতকর কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার পুত্র পরলোকগত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সর্ব্বাংশে পিতার পন্থা অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলাদেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন।

সন ১২৯৫ সালের ৫ই শ্রাবণ শয়ান একাদশী তিথিতে (এই তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন) জয়কৃষ্ণ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। জয়কৃষ্ণ একাধারে আদর্শ জমিদার, আদর্শ স্বদেশসেবক এবং কৃষক সম্প্রদায়ের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অমর কবি হেমচন্দ্র "নবজীবন" পত্রে লিখিয়াছিলেন—

তার পর গুড়িগুড়ি এসো বুড়ো শিব।
গঙ্গার ওপারে বাড়ী অদ্ভুত নসিব॥
জমিদারী মিশ্টে ঢালা আদোত মডেল।
বাঙ্গলার কাদা হোড়ে পাথুরে পাটকেল॥
বয়সে অনাদি লিঙ্গ, জরাসন্ধ বলে।
এখনও দাপটে যার হুগলী জেলা টলে॥
মাল আইনে তোডরমল রোখে হায়দর আলি।
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলী॥
গোষ্ঠী বহু বাস্ত বাটী যেন লঙ্কাপুরী।
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌন্সিলে মুহুরী॥
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্র জুড়ে নাম।
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ চরণে প্রণাম॥

ফ্রান্স্

শ্রীভারতকুমার বসু

(৪)

ফ্রান্সের যে-সব লোক সেখানকার "ফ্ল্যাট্" চৌকি দেবার কাজ করে, তাদের গুণের অন্ত নেই, অর্থাৎ তারা মনিবের জিনিষ-পত্তর এবং অর্থ চুরী ক'রে বেমালুম হজম ক'রতে সিদ্ধহস্ত। লণ্ডনে এই রকম চৌকিদারদের পাদুকা-চুরী গেছে, সত্য। কিন্তু আমরা কি ক'রতে পারি? কিছুই না,—স্রেফ্ কিছুই না।

অবশ্য এখানে এ কথাও ব'লে রাখা দরকার যে, সেখানকার "ফ্ল্যাটে"র সমস্ত চৌকিদারই চোর নয়।

'তৌকৃলি'তে সুতো কাটছে

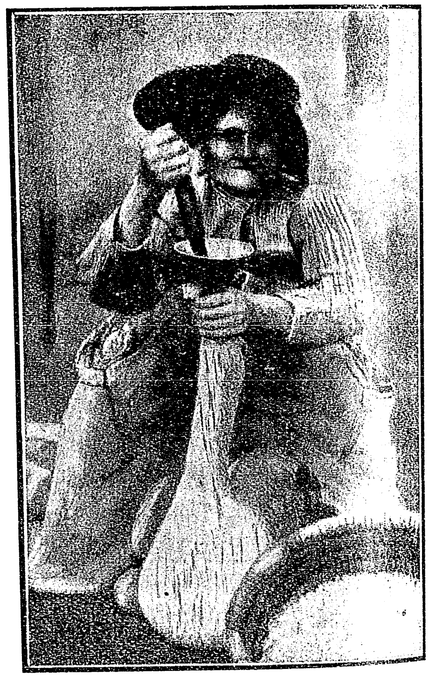

রাজহাঁসকে পরিপুষ্ট করবার জন্য একপ্রকার খাবার জোর ক'রে খাওয়াচ্ছে

প্রহারের দ্বারা তাড়ানো হ'য়ে থাকে। ফ্রান্সে কিন্তু তারা আশ্চর্য্যভাবে রেহাই পায়; কারণ, বন্ধুদের কাছে মনিবদের প্রায়ই এই কথা ব'লতে শোনা যায় যে, হ্যাঁ, আমাদের তাদের মধ্যে ভাল লোকও আছে। তবে তাদের সংখ্যা শতকরা অত্যল্প। বেশীর ভাগ লোকই যে সুবিধা পেলেই নীচ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তার জন্য একমাত্র দায়ী-

মনিবদের প্রথা। মনিব দুপুর বেলায় কি খাবেন, অথবা, খাওয়ার পর মাথা ব্যথা ক'রছে কেন, অথবা, তাঁর সঙ্গে কে দেখা ক'রতে এলেন, অথবা, মনিব কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং ফিরতে কত দেরী হবে,—ইত্যাদি খবর

সদর বাজার

কাঠুরিয়া বৃদ্ধা রমণী

চৌকিদাররা রাখে। এবং মনিবদেরও এ বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকে না। এই সব কারণেই, চৌকিদাররা

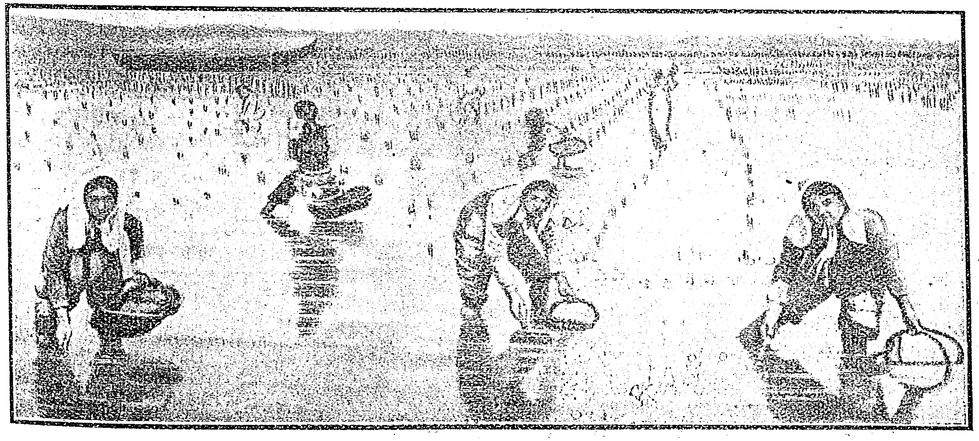

সামুদ্রিক শামুক তুলছে

রক্ষক হ'য়েও ভক্ষক হবার সুবিধা পায় পুরোদস্তর। তাদের চুরীর কার্য্যটীকে হাতে-নাতে ধ'রতে হ'লে মনিব যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরে আসেন, তা হ'লেই কৃতকার্য্য হ'তে পারেন।

প্যারিসের "ফ্ল্যাট"গুলি সাধারণতঃ একটা উঠানের চারি দিক ঘিরে তৈরী হয়। প্রত্যেক "ফ্ল্যাটে"র ফটক রাজপথের দিকে থাকে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত এই

Nice-দেশের আনন্দ উৎসব। অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্ত্তি তৈরী করিয়ে, সেগুলো পথের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেক লোক মুখোস প'রে এই উৎসবে যোগদান করে

সব ফটক বন্ধ থাকে। চৌকিদার ফটকের-সঙ্গে-লাগোয়া একটা দড়ী নিয়ে তার ঘরে শুয়ে থাকে। যখনি বাইরে থেকে কোনো লোক এসে দরজায় ঘণ্টা বাজান, তখনি চৌকিদার দড়িতে টান দিয়ে দরজা খুলে দেয়। চৌকিদার প্রয়োজন বোধ ক'রলে, বাড়ীর ভিতর দিয়ে যাবার সময় নবাগতকে তাঁর নাম চীৎকার ক'রে ব'লতে অনুরোধ করে। নবাগত এই অনুরোধ রাখতে বাধ্য, কারণ এইটীই নিয়ম।

চৌকিদারদের কাজের জন্য যা মাহিনা দেওয়া হয়, তা সামান্য-ই। এই মাহিনা নববর্ষোপলক্ষে এবং অন্যান্য সময়ে বাড়ানো হ'য়ে থাকে।

মনিব যদি কৃপণ হ'য়ে পড়েন, কিম্বা তাঁর যদি বদ্‌নাম হয়, তা হ'লে, চৌকিদারের কাছে তাঁর নিস্তার নেই। চৌকিদার তাঁকে নানা প্রকারে জ্বালাতন ক'রতে সুরু ক'রবে। যথা —কোনো লোক মনিবের সঙ্গে দেখা ক'রতে

ফরাসী উপনিবেশস্থ ল্যাংটিয়ান্ মেয়ে

এলে, মনিব বাড়ীতে থাকলেও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, মনিব বাড়ীতে নেই, এবং মনিব বাইরে বেরিয়ে গেলে, ব'লে দেওয়া হবে যে, তিনি মারা গেছেন।—কোনো পার্শেল্ এলে, সেটীকে হয় ফেরৎ পাঠানো হবে, কিম্বা লুকিয়ে ফেলা হবে। বন্ধুদের রেখে-যাওয়া সাক্ষাৎ-করবার কার্ড্‌ও ছিঁড়ে ফেলা হবে।—উপরকার "ফ্ল্যাটে" যে-সব লোক থাকেন, তাঁদের চিঠি-পত্তর সাধারণতঃ পিয়োন্ নীচে-তলায় চৌকিদারের হাতেই দিয়ে যায়। চৌকি-

দাররা কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে কুঁড়েমীর জন্যই তা আর যথাস্থানে দিয়ে আসবার দরকার বোধ করে না। এইভাবে, পাজী চৌকিদারের জন্যই মনিবের বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যায়, ব্যবসাদাররা সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠে, অনুগ্রহপ্রার্থীরা নিরাশ হয় এবং যাঁদের কাছে উপকার পাবার আশা করা যায়, তাঁরাও শত্রু হ'য়ে যান।···

উপরি-উক্ত চৌকিদারদের ক্ষমতা অসাধারণ। যে-সব মনিব তাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার ক'রবেন, তারা তাঁদের

ফরাসী উপনিবেশ মার্কুইসাসের মেয়ে

ছেড়ে কথা কইবে না। তারা মনিবদের বিরুদ্ধে এমন-সব দুর্নাম এবং বিশ্রী গল্প রটাতে আরম্ভ ক'রবে যে, সামাজিক জীবনে মনিবদের বেঁচে থাকা দায় হ'য়ে উঠবে! খবর পাওয়া গেছে যে, ওই রকম কু-রটনা শুনে কোনো ভাবপ্রবণ মনিব বাস্তবিকই লোক-লজ্জায় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ক'রেছিলেন।

চৌকিদারদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য রীতিমত একটী ক'রে মন্ত্রণাগার থাকে। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যায় সেই ঘরে

ফরাসী পরিবার

প্যারিসে আর্ট স্কুলের ক্লাস। সামনেই বিবসনা "নারী-মডেল্" উঁচু চেয়ারে ব'সে র'য়েছে

চৌকিদার থেকে আরম্ভ ক'রে ঝি-চাকর পর্য্যন্ত সকলেই যে, ভাল ঝি-চাকরকেও মনিবের বিরুদ্ধে বিগ্‌ড়ে দিতে জড়ো হয়। নিয়ম অনুযায়ী, তাদের আলোচনার একমাত্র পারে।

জীবন্ত প্রাণীকে বিক্রীর জন্য খাঁচায় ক'রে এনেছে

বিষয়—কার মনিব কার প্রতি কখন কি রকম দুর্ব্ব্যবহার ক'রেছে। এই মন্ত্রণাগারটীর এমন গুণ

যে-সব পরিচারিকা উক্ত মন্ত্রণা-সভার সভ্যা, তারা বাড়ীর সকল রকমেরই কাজ করে। তারা প্রত্যহ মনিবের জন্য বাজার ক'রতে যায়; এমন কি, দোকানের জিনিষ পত্তরও তারাই কেনে। হয় ত, মনিব-পত্নীর কোনো দিন ইচ্ছে হ'লো, তিনি নিজে দোকানে যাবেন। পরিচারিকা কিন্তু এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে যেতে নিষেধ ক'র্‌লে যে, দোকানদারেরা তাঁকে নিশ্চয়ই "রাম-ঠকান্" ঠকাবে! আসল কথা কিন্তু তা নয়। প্রভু-পত্নী নিজে দোকানে গেলে, পরিচারিকার কিছু আর্থিক লোকসান হ'য়ে যাবে। দোকানদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত মতো, পরিচারিকা প্রত্যেক এক ফ্র্যাঙ্ক জিনিষ কেনার জন্য একটী ক'রে আধ-পেনি কমিশন পায়। সুতরাং মনিব-পত্নী দোকানে গেলে, বেচারী পরিচারিকার অনেকগুলি আধ পেনি যে মাঠে কমিশন আদায় ক'রে থাকে। মনিবরা এজন্য তাদের

ফরাসী উপনিবেশ "ল্যায়ো"-দেশের নৃত্য

কিছুই বাধা দেন না। কিন্তু মনিবদের এই সরল ভাব মোটেই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়; কারণ, তাঁদের সরলতায় সাহস পেয়ে পরিচারিকারা বেশী-কমিশনের লোভে দরকারের চেয়েও অনেক বেশী ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের জিনিষ কিনতে পারে! কিন্তু এইখানে এ কথা ব'লে রাখা দরকার যে, ফরাসী পরিচারিকারা প্রায়ই অতদূর লোভী হয় না। উক্ত কমিশনের ব্যাপারের জন্য কিন্তু দোকানদারদেরও এ স্থলে দোষ দেওয়া উচিত। তারাই ত পরিচারিকাদের ঘুষ

নদীর জলে কাপড় কাচছে

দিয়ে এবং তোষামোদ ক'রে বেশী জিনিষ বিক্রী করবার চেষ্টা করে।

ফরাসী পরিচারিকাদের কমিশন-নেবার ব্যাপারটী ছাড়া, তাদের অন্যান্য গুণের বিষয় বিবেচনা ক'রতে গেলে, তাদের সুখ্যাতিই ক'রতে হয়। তারা হাড়া-ভাঙা খাটুনী খাটতে পারে—কর্ত্তব্যের জ্ঞান নিয়ে। প্রত্যহ ভোরে যখন বাড়ীর অন্যান্য চাকরেরা ঘুমিয়ে থাকে, সেই সময়ে তারা সকলের আগেই শয্যা ছেড়ে ওঠে এবং রান্নাঘরে

বাদ্যকর

গিয়ে উনুনে আগুন দেয়। তারপর বেলা আটটার সময় টেবিলের উপর কফি, কেক এবং মাখন্ সাজিয়ে মনিবের

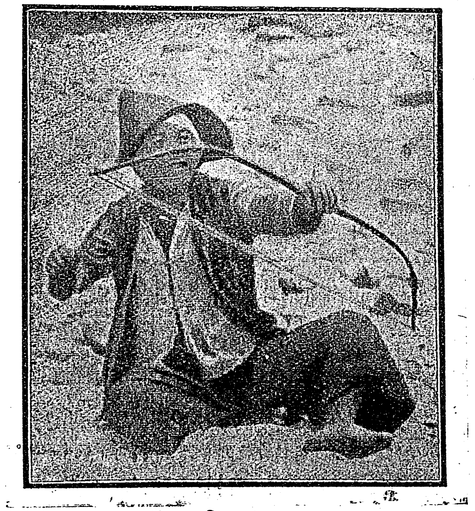

তীরন্দাজ

প্রাতর্ভোজনের জন্য অপেক্ষা করে। মনিবের ভোজন শেষ হ'য়ে গেলেই, তারা শয়ন-ঘরের কাজ আরম্ভ করে। কাজ শেষ হ'লেই, বাজার ক'রতে বেরিয়ে যায়।—বাজারের কাজ শেষ হ'লেই যথাসময়ে তারা মনিবের মধ্যাহ্ন-আহার তৈরী করে। এই খাবার তৈরী হবার পর দিনের মধ্যে প্রথম সে বিশ্রামের ছুটী পায়। এইখানে একটী কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পরিচারিকাদের

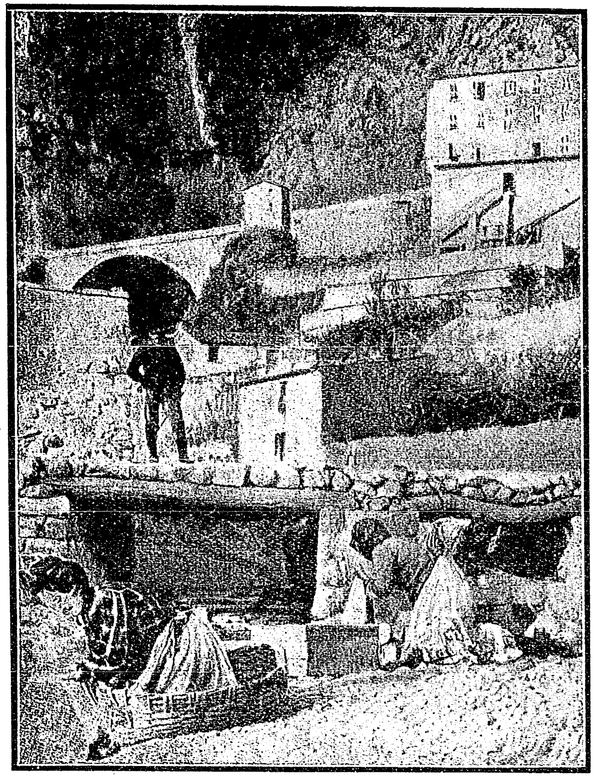

ফ্রান্সের শেষ সীমানায়। এই যায়গাতে ফ্রান্সের সীমা শেষ হ'য়েছে এবং ইটালীর সীমা আরম্ভ হ'য়েছে

আহার মনিবদের আহার থেকে ভিন্ন প্রকারের হয় না। অনেক দেশে এই রকম ব্যবস্থা আছে যে, মনিবদের খাবার হবে এক রকমের এবং ঝি-চাকরের খাবার হবে আর এক প্রকারের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কিন্তু ঝি-চাকরেরা গরীব লোক এবং পেটের দায়ে খেটে খেতে এসেছে ব'লেই যে তাদের খাবারের দিক দিয়ে উপরি-উক্ত নীচতা দেখাতে হবে, এ-রকম ইতর মনোবৃত্তি ফ্রান্সে অপরিজ্ঞাত। সেখানে মনিবের যে-'খানা', ঝি-চাকরেরও সেই 'খানা'। ফরাসী-বিপ্লবের ফলে সাধারণ-তান্ত্রিক ফ্রান্সে যখন সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হ'লো, তখন থেকেই সেখানে মনিব এবং ঝি-চাকরের খাবারের বিষয়ে এই রকম অ-পার্থক্য দেখা দেয়। এই বিশেষত্বটী ফ্রান্সের অন্যতম জাতীয় বিশেষত্ব।

ব্যাপারটীই ফ্রান্সের মনিব ও পরিচারিকার মধ্যে সুন্দর একটী মৈত্রী-ভাব এনে দেয়। পরিচারিকা তার মনিবপত্নীর কাছে নিজের

ফরাসী উপনিবেশস্থ সুডানিস্ মেয়ে

সংসারের সুখ-দুঃখের কথা খুলে বলে। এমন কি, সে তার প্রেম-জীবনের কথাও ব'লতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। পরিচারিকাদের আচার-ব্যবহারও সুন্দর। অতিথি-অভ্যর্থনার দিক দিয়ে, তারা ইংরেজ পরিচারিকা থেকে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের লোক। কোনো ইংরেজের বাড়ীতে অতিথি গেলে, ইংরেজ পরিচারিকা নিতান্ত উদাসীন ভাবে তার অভ্যর্থনার কাজ শেষ ক'রবে। কিন্তু ফরাসীর বাড়ীতে ফরাসী পরিচারিকার

কাছে অতিথি পান—যেন কত পরিচিতের মতো সাদর, আন্তরিক অভ্যর্থনা। অভ্যর্থনার সময়ে ফরাসী পরিচারিকার মুখে স্বাগত-হাসির রেখা লেগেই থাকে। ফরাসী পরিচারিকাদের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান আছে যথেষ্ট। যদি তারা দেখে যে, অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার সময়ে

ফরাসী উপনিবেশ মার্টিনিক্-দেশের মেয়ে

অতিথি তাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা কইছে যা তাদের বিবেচনায় কর্কশ, কিম্বা যদি অতিথি তাদের দেখে' মাথার টুপী ঈষৎ না তোলে, কিম্বা যদি অতিথি তাকে সম্ভ্রমের স্বরে ডাকতে ভুলে যায়, বা ইচ্ছে ক'রেই না ডাকে, তা হ'লে পরিচারিকারা সভ্যতার জন্য তৎক্ষণাৎ অতিথিকে কোনো আপত্তির কথা শোনাবে না; কিন্তু অতিথি এর পর কোনো দিন এলেই, তার কাছে তাদের বক্তব্য শুনিয়ে দেবে। ফ্রান্সে প্রত্যেক পরিচারিকারই যে কতদূর বোধ-শক্তি আছে, সে-সম্বন্ধে ফরাসী-অভিজ্ঞা মিস্ উইনিফ্রেড্ ষ্টিফেন্স্ চমৎকার একটী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

থিয়েটার ফ্রান্সিস্ অর্থাৎ ফ্রান্সের জাতীয় থিয়েটারে অভিনয় দেখবার জন্য একবার তিনি তাঁর এক বান্ধবীকে

ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচারীর "প্যাগোডা"

নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়ায়, যথাসময়ে বান্ধবী থিয়েটারে যেতে না পেরে নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য তাঁর পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিলেন। এই পরিচারিকার সামান্য একটু প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান ছিল। মিস্ ষ্টিফেন্স ভেবেছিলেন, পরিচারিকা হয় ত বুঝতে না পেরে অভিনীত

ফরাসী উপনিবেশ ইণ্ডো-চীন-দেশের লোকদের বুদ্ধ-পূজা

ক্লাসিক ট্র্যাজেডি-খানাকে বরদাস্ত ক'রতে পারবে না। পরিচারিকা কিন্তু অভিনয়ের প্রত্যেকটী গতি, বিষয়, আর্ট এবং আবৃত্তির দিকে তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিলে। শেষে মিস্ ষ্টিফেন্স কে ব'ললে, "Mademoiselle, কি সুন্দর দেখুন! কথাগুলো ক'ত চমৎকার ভাবে উচ্চারণ হচ্ছে!" পরিচারিকা অশিক্ষিতা হ'লে, অভিনয়ের বিশুদ্ধ কথাকে নিশ্চয়ই অনুসরণ ক'রতে পারতো না। এইখানে এ কথাও ব'লে রাখা দরকার যে, বিশুদ্ধ কথা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণের জন্য ফ্রান্সের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতি যে রকম যত্ন নেওয়া হয়, অন্য অনেক দেশে তা নেওয়া হয় না। এই কারণেই, ফ্রান্সের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অশিক্ষিত নটনটীর মধ্যে কথা উচ্চারণের ত্রুটি দেখা যায় কদাচ।

ফরাসী নাটক থেকে ফরাসীরা ভাল শিখতে পায় এবং তাদের বুদ্ধিও খোলে। কিন্তু ফরাসীদের কৌতুক-নাট্যগুলিকে তারিফ করা যায় না একটুও। এই নাটকগুলো দস্তুরমতো সীমা অতিক্রম ক'রে যায় প্রায়ই। ইংরাজী কৌতুক-নাট্যগুলি কিন্তু যেন

কাঠের-পায়ায় চ'লে বেড়াচ্ছে

ইংরেজদের এক-একটী সম্পত্তি। ফরাসীদের উক্ত নাটক এ গৌরব একেবারেই পেতে পারে না। ফরাসীদের গুরু গম্ভীর নাটকগুলোও অসংযত। এই নাটকের মধ্যে ঘটনার আলোচনা-প্রসঙ্গে কদর্য্য জিনিষগুলোকেও অপ্রকাশ্য ক'রে রাখা হয় না।

ফ্রান্সের রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকাগুলোও অসংযত। সেগুলোর অন্তঃসার কর্কশ; এবং তা প্রায়ই নিম্নতর প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। কখনো কখনো তা অত্যন্ত বিরক্তিকর হ'য়ে ওঠে। ঠিক এই

আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশের মেয়ে

কারণেই, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের সময় প্যারিসের পত্রিকা প'ড়ে সেখানকার লোকেরা যার-পর-নাই বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। রঙ্গ-ব্যঙ্গ উপভোগ্য বটে, কিন্তু তার অতি-আধিক্য সব সময়েই কটু হ'য়ে পড়ে।

ফরাসীরা মাতালকে ঘৃণা করে। অভ্যস্ত মাতালকে সেখানে প্রতিবেশিত্বের পবিত্রতা অপহরণকারী ব্যক্তির মতো বিবেচনা করা হয়। উক্ত মাতাল যদি মাত্লামীর জন্য পুলিসের দ্বারা বার্ কতক ধরা পড়ে, এবং যদি তার শাস্তি হয়, তা হ'লে তাকে আর 'জুরী'র কাজে নেওয়া হয় না, এবং তাকে প্রকাশ্য অফিস খুলেও ব'সতে দেওয়া হয় না। ভোটের অধিকার হ'তেও সে হয় ত বঞ্চিত হ'তে পারে।

ফ্রান্সে মাতাল দেখা যায় কদাচ। সেখানকার মেয়েরাও "পান" করে খুব কম। স্থানীয় হোটেল

ঝর্ণা-তলায়

ইত্যাদিতে লোকেরা আমোদ করে এবং সুরা পান করে বটে, কিন্তু সে আমোদ এবং পানের মধ্যে মাত্লামীর গন্ধও থাকে না। সেখানে এ্যাল্কোহলিক্ সুরাসারের চেয়ে কফি এবং অন্যান্য অনুত্তেজক জিনিষের বিক্রী-ই বেশী। বিগত মহাযুদ্ধের আগে ফ্রান্সে এ্যালকোহলের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল মারাত্মকভাবে বেশী। তখন

বছরে ৫৬ লক্ষ পাউণ্ডের এ্যাল্‌কোহল্ বিক্রী হ'তো। মহাযুদ্ধের সময়ে ওই বিক্রী গভর্ণমেণ্ট বন্ধ ক'রে দিলেন।

জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে

তার ফলে, দেশে আপত্তির তার-স্বর উঠলো। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু সেদিকে কাণই দিলেন না; তার একমাত্র কারণ, টিউবার্‌কুলোসিস্-রোগ বাড়াতে এ্যাল্‌কোহল্ সিদ্ধহস্ত, এবং এই এ্যাল্‌কোহল্ই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের দশ লক্ষ লোককে যমালয়ে পাঠিয়েছিল। উক্ত শতাব্দীতে ফ্রান্সে প্রত্যেক বছরে কেবল "পান" রোগেই লোক মারা যেতো এক লক্ষ ক'রে।

ফ্রান্সের লোকেরা বড় সহজে পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হ'তে চায় না। বরাবর-ই ফরাসী-সৈনিকের পা-জামার রং ছিল লাল। অন্যান্য জাতির সৈনিকদের পা-জামার এমন রং যে, তা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে প্রচুর সৈন্যের ক্ষয় হ'তে দেখে, ফরাসীদের ধারণা হ'লো যে, লাল পা জামা ক্ষতিকর। সুতরাং ওটীর পরিবর্ত্তন দরকার। আজকাল ফরাসী সৈনিকের পা-জামার রং তাই অস্পষ্ট নীল।...

ফ্রান্সের প্রাইভেট্-সৈন্যদলে যারা কাজ করে, চুক্তি অনুযায়ী তাদের কাজ করবার সময় দুই বা তিন বছর পর্য্যন্ত। বিগত যুদ্ধের আগে উক্ত সময় আরও বাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। প্রাইভেট্ সৈন্যরা পরে রিসার্ভিষ্ট্ হ'য়ে যায়। এই সময়ে বাধ্যতামূলক ভাবে তাদের ঠিক তত বছর পর্য্যন্ত কতকগুলি শিক্ষার অধীনে থাকতে হয়, যত বছর পর্য্যন্ত না তারা টেরিটোরিয়্যাল্ আর্মিতে যোগদান করবার যোগ্যতা পায়। এই আর্মি-জীবনের একমাত্র অসুবিধে, নেতার অধীনে থেকে সৈন্যরা নিজেদের স্বাধীনতা হারায়। কিন্তু উক্ত জীবনের সুবিধাও আছে প্রচুর। উক্ত জীবনে সৈন্যরা পরস্পরকে চিনতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, সম্প্রদায়ের দিক দিয়ে মানুষের বিচার হয় না,—বিচার হয় ব্যক্তিগত গুণের দিক দিয়ে। উক্ত জীবনে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বা নীচত্ব-বোধ নেই। সৈন্যদলে রাজমিস্ত্রী কিম্বা চাষার ছেলেও ধনীর ছেলেকে পায় বন্ধুরূপে, সঙ্গীরূপে। সেখানকার জীবনের মধ্যে জেগে আছে সাম্যভাব।

'তোক্‌লি'র সদ্ব্যবহার

একুশ বৎসর বয়সে ফরাসী যুবক যখন "ব্যারাকে" সৈনিকের কাজ ক'রতে যায়, তখন তাকে একটী পোষাক দেওয়া হয়। এ পোষাক যে নতুন হ'তেই হবে, তার কোনো মানে নেই। পোষাক যদি পুরানো হয়, তা হ'লে ব'লে দেওয়া হয় যে, নতুন সৈনিক যেন পোষাকটী খুব যত্ন ক'রে পরে, কারণ, পোষাকে দাগ লাগলে, কিম্বা তা ছিঁড়ে গেলে, উক্ত সৈনিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সৈনিকদের প্রতি সাধারণ আইন হচ্ছে এই যে, তারা (জার্ম্মাণ-সৈন্যদের মতো) পরস্পরের সঙ্গে কোনো দিন মারামারি কাটাকাটি ক'রতে পারবে না। যদি করে, তা হ'লে তাদের প্রতি বন্দীত্বের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তির ভয়ে অনেক অপরাধী সৈন্য পালিয়ে যায়। যে-সব পলাতক ধরা পড়ে, তাদের এ্যাল্‌জেরিয়ায় নিয়ম-শিক্ষার সেনা-নিবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যারা ধরা পড়ে না, তারা তাদের ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ফ্রান্সে প্রবেশ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

পৃথিবীর চারি দিকেই ফ্রান্সের উপনিবেশ ছড়িয়ে আছে। যথা—আফ্রিকায়, আমেরিকায়, অষ্ট্রেলেশিয়ায়, ওসানিয়ায়, ইণ্ডো-চীনে এবং ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের পাঁচটী স্থান ফ্রান্সের অধীন; যথা—পণ্ডিচারী, ক্যারিকেল, মাহে, চন্দননগর এবং ইয়ানাও ন (Yanaon)।

১৮৭৫ সালে ফ্রান্সে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ সালে ঔপনিবেশিক সৈন্যবল সমেত ফরাসী সেনার সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ এবং সৈনিকবিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৮ হাজার। সেখানে আঙুর-ক্ষেত আছে ৩৭২৬৬২০-একার্ জমি দখল ক'রে। এই সব আঙুর-ক্ষেত থেকে ১০ বছর আগে মদ তৈরী হ'য়েছিল ১৩০০২০০০০০ গ্যালন্। ৪০ হাজারের বেশী-সংখ্যক খনি সেখানে আছে। সেখানকার রপ্তানীর জিনিষ—তুলো, রেশম, পশম, মদ, গাড়ী, কৃত্রিম ফুল, কাঁচা এবং পেটা-চামড়া, ধাতুর জিনিষ, কল-কব্জা, মাখন, চিনি, মাছ ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৯২১ সালে রপ্তানী-করা জিনিষের মূল্য ছিল ২১৫৫৩০০০০০০ ফ্র্যাঙ্ক। রাজধানী প্যারিস। বছর কতক আগে প্যারিসের লোক-সংখ্যা ছিল ২৯০৬৪৭০। সমস্ত ফ্রান্সের মোট জন-সংখ্যা অল্পাধিক ৩৯২০৯৭৬৬ হবে।

ফরাসী উপনিবেশ Duala-দেশের মুখোস্-বিক্রেতা

"মা"

শ্রীপ্রতিভা সোম

নীরব আমার মনের বাণী
মাগো আমার! দীপ্তিময়ী!
রাঙা চরণ ছোঁবার মত
তাই তো তোমায় সুদূর হতে
কোনোদিন তো দেখি নি মা
গন্ধ তোমার উপ্‌ছে পড়ে
দৃষ্টি মম নত;
প্রণাম লহ শত।
ভাগ্য তো মোর নাই;
আজ নমিতে চাই।
তবুও হয় মনে—
প্রাণের কুঞ্জ-বনে।
শুধু—নয়ন চায় না তো মা
তাই কি নিতুই বেড়াই খুঁজে
হেরব কবে রূপ মা, আমার
তৃপ্তি পাবো ঐ আশীষের
হয় ত সে দিন নয় মা সুদূর?
মাগো আমার দীপ্তিময়ী,
এক পলকের দেখা;
তোমার পদ-রেখা?
মনের কালি ধুয়ে?
ছায়ায় পরাণ থুয়ে?
নাই মা দেরী তত?
প্রণাম শত শত।

ভুল ভাঙ্গা

শ্রী.....রায়

দারজিলিং
৫ই বৈশাখ

কমলা দিদি,

আমরা দারজিলিং এসেছি, মা, বাবা এবং আমি। তুমি এতে বিস্মিত হবে নিশ্চয়ই। আই-এ পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেলে দিনকতক তোমাদের ওখানে গিয়ে থাকবার কথা ছিল, কিন্তু তা হল না। তুমি হয় ত এতে আমার উপর রাগ করবে; কিন্তু কি করবো ভাই, পরীক্ষার জন্য একটু অতিরিক্ত পরিশ্রমই করতে হয়েছিল, তাই বোধ করি শরীরটা খারাপ হয়ে পড়ে। বাবা বল্লেন, পরীক্ষার পর যে তোমাদের ওখানে যাবার কথা ছিল, তা আর হবে না,—দিনকতক দারজিলিং গিয়ে থাকলে শরীরটা সুস্থ হবে। সুতরাং দারজিলিং আসাই স্থির হল।

আমি কখনো দারজিলিং আসিনি। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার বড়ই ভাল লাগছে। সমতল প্রদেশবাসীদের চোখে এখানকার গাছপালা, লতা পাতা, ফল ফুল, চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের বিরাট দৃশ্য একটা সৌন্দর্য্যের মোহ সৃষ্টি করে। প্রকৃতির এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার সামর্থ্য একটু থাকলেও তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার মোটেই নেই।

এখন যে খবরের জন্য তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যগ্র হয়ে রয়েছ, তাই লিখছি। তোমার ঘটকালি সার্থক হয়েছে। হিন্দুর ধর্ম্মে বাবার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে তাঁর মত খুব উদার, তা তুমি জান। তাঁর ইচ্ছে ছিল, বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়ে কোন বিলাত-ফেরতের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। কিন্তু মার অনুরোধ এবং বোধ করি আমার মনেরও কতকটা আভাষ পেয়ে, তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হয়েছেন। আই-এ পরীক্ষার ফল বেরোলেই বিয়ের আয়োজন হবে। যতীশবাবুকে বল, ছুটীর বন্দোবস্ত যেন আগে থাকতে করে রাখেন, তোমাদের সকলকেই কিন্তু আসতে হবে।

রায় সাহেব আগে সপ্তাহে দু একদিন এখানে আসতেন, কথা পাকা হয়ে যাবার পর প্রায় প্রত্যহই আফিসের পর এখানে এসে চা খান এবং গল্পগুজবে আটনটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে যান। বিয়ের কথা পাকা হবার আগে আমি তাঁর সামনে না বেরোতাম তা নয়, কিন্তু একা তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ তিনি চাইলেও আমি দিতাম না। বিয়ে স্থির হয়ে গেলে সে বিষয়ে বাবার অনুমতি পেলাম, চিঠিপত্র লেখার অনুমতিও দিয়েছিলেন।

এখন যত দেখছি, ততই অন্তরের সঙ্গে তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। ঠিক আমার মনের মানুষটী তুমি মিলিয়ে দিয়েছ। রায় সাহেব সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবাসেন,—আমার কাছেও যে তিনি তা প্রত্যাশা করবেন সেটা স্বাভাবিক এবং আমিও যে তাঁকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তা তোমাকে লেখা বোধ করি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিতে একটা দুর্ব্বলতা আমি লক্ষ্য করছি, যা হয় ত তোমার লক্ষ্য করবার সুযোগ হয়নি। আমার স্নেহমমতা ভালবাসা কেবলমাত্র তাঁরই প্রাপ্য, আর কেহ যে তার অংশী হবে, এটা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারেন না, সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক। আমি যদি কারো সঙ্গে একটু মেলা-মেশা করি, একটু হাসি-গল্প করি, অমনি তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তাঁর প্রকৃতির এই দুর্ব্বলতা দেখে আমার মনটা এক এক সময়ে বড় দমে যায়,—এমন শঙ্কাও এক এক সময়ে হয় যে, হয় ত আমাদের দাম্পত্য-জীবন সুখের হবে না।

সেদিন আমার মামাত ভাই দেখা করতে এসেছিলেন। কথা বলতে বলতে তাঁর সঙ্গে ফটক পর্য্যন্ত গিয়েছি, এমন সময় রায় সাহেব এলেন। মামাত ভাইএর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হচ্ছিল। তিনি বলতেন, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কেবল স্বার্থের সম্বন্ধ,—তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকবেন, এই তাঁর সংকল্প। এতদিনে সে সংকল্প ভেঙ্গে গেল, তাই কৌতুক করে হেসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। তাই

দেখে রায় সাহেবের প্রফুল্লমুখে যেন একটা ছায়া পড়ল। আমার মামাত ভাইএর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, মনে করেছিলাম, পরিচয় করে দেব, কিন্তু তিনি সেখানে অপেক্ষমাত্র না করে, গম্ভীর মুখে পাশ কাটিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। মামাত ভাই কি মনে করলেন জানি না, কিন্তু আমি বড়ই অপ্রতিভ হলাম। বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখি রায় সাহেব গম্ভীরমুখে একটা মাসিকের পাতা ওল্টাচ্ছেন। বাবা আমায় দেখে বল্লেন, উনি এসে যে অনেকক্ষণ বসে আছেন, কৈ চা দেবে না? রায় সাহেব বল্লেন, থাক আর চায়ের দরকার নেই, আমি এখনি যাব। কিন্তু সে যে শুধু অভিমানের কথা, তা বুঝতে আমার বাকী রইল না। চা নিয়ে এলাম, তিনিও খেলেন কিন্তু আমার সঙ্গে সেদিন আর বড় কথাবার্ত্তা হল না। বাবার সঙ্গে দুচার কথা বলে এবং মাসিকের পাতা উল্টিয়ে সেদিন কাটিয়ে দিলেন। তাঁর প্রকৃতির এই যে দুর্ব্বলতা, একে ঈর্ষা বলব, কি, কি বলব জানি না, কিন্তু এতে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার সত্যিই আশঙ্কা হচ্ছে। এই ঈর্ষা,—স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর এই যে সন্দেহ, এতে কত জীবন তিক্ত হয়ে গেছে, কত সুখের সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে। এ রোগের ঔষধ কি বলতে পার?

খোকা খুখীকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও, তোমরা আমার ভালবাসা নিয়ো। রায় সাহেবের ঠিকানা চেয়েছ, নীচে লিখে দিলাম।

তোমার
নির্ম্মলা।

রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার
নর্থ ক্যালকাটা ডিভিশন।

* * * *

দারজিলিং
৭ই বৈশাখ।

প্রিয়তম,

তোমার চিঠি পেলাম। সন্ধ্যেবেলা তুমি প্রত্যহ আমাদের ওখানে আসতে, সেই সময়টা তোমারি অভাবটা বড় বেশী অনুভব করি। এখানে এসে বোধ হয় বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছি লিখেছ,—বোধ হয় কেন, সত্যিই বেশ স্ফূর্ত্তিতে কাটান যাচ্ছে। তোমাকে এখানে পাচ্ছি না, সেই কষ্ট, নতুবা আমোদ প্রমোদ স্ফূর্ত্তির এখানে অভাব নেই এবং তা যে উপভোগ না কচ্ছি তাও নয়। তবে তোমার অভাবে আমার পক্ষে তা সম্পূর্ণ সার্থক হচ্ছে না।

স্যানিটেরিয়ামে এখন আর কারা আছেন জানতে চেয়েছ। সে লিখতে গেলে লম্বা ফর্দ্দ হবে, আর তার আবশ্যকতাও বড় দেখছি না। যাঁদের সঙ্গে আমার একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তাঁদের কথাই লিখছি। রাজসাহী অঞ্চলের এক ডেপুটী বাবুর দুই মেয়ে এবং তাদের বড় ভাই নির্ম্মলবাবু আমাদের আগেই এখানে এসেছিলেন, আর বর্দ্ধমান অঞ্চলের এক জমিদার, অবনীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং তাঁর মা আমরা যেদিন আসি, তার দুদিন আগে এসেছিলেন। নির্ম্মলবাবুর পড়াশোনা শেষ হয়েছে, এখন কায-কর্ম্মের চেষ্টায় আছেন। একটু স্বদেশীর ঝোঁক আছে, সরকারী চাকরীতে ঢোকবার ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে থাকলে তা হতে পারত,—নিজে কৃতবিদ্য, বাবা সিনিয়ার ডেপুটী,—কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরেও আছেন। সুশ্রী চেহারা, সুগঠিত সুপুষ্ট দেহ, উৎসাহ উদ্যমের অন্ত নেই। মেয়ে দুটি পাশ-টাশ না করলেও বেশ সুশিক্ষিতা, দেখতেও সুশ্রী। কিন্তু আমি সব চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি এদের তিন ভাই বোনের স্বভাব প্রকৃতিতে। এমন অমায়িক, স্নেহশীল, সরল, শান্ত-শিষ্ট মানুষ আমি খুব বেশী দেখি নি।

কিন্তু আমার সব চেয়ে ভাল লাগে চৌধুরীকে। কথায় বলে 'যেন রাজপুত্র'; এও তাই। এমন নিখুঁত সৌন্দর্য্য আমি খুব অল্পই দেখেছি। দেখিতে যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও তেমনি মধুর, প্রকৃতিটা একটু গম্ভীর। অল্প বয়সে চৌধুরী পিতৃহীন হন। বিস্তীর্ণ জমিদারী, অগাধ সম্পত্তি,—এখন তিনিই অধিকারী। নির্ম্মলবাবুদের তিন ভাই বোন এবং আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই কম। কিন্তু বোধ করি আমার উপরই টান তাঁর সব চেয়ে বেশী। অনেক সময়ই আমার কাছে থাকেন, আমার সঙ্গে গল্প করেন, আমার গান শুনতে খুব ভালবাসেন। কথাবার্ত্তা, আচরণ, ব্যবহার, ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হয়, আমাকে খুব

ভালবাসেন। তাঁর মা সেদিন বলছিলেন, তাঁর ছেলেকে আমি যাদুমন্ত্রে ভুলিয়েছি।

আমরা প্রত্যহ দুবেলা বেড়াতে বেরোই। নির্ম্মলবাবুরা আমাদের আগে এসেছিলেন,—তাঁদের সব জানাশোনা আছে,—তিনিই পথপ্রদর্শক হয়ে আমাদের নিয়ে বেরোন।

বাবা মা ভাল আছেন, আমিও বেশ আছি। তুমি কেমন আছ লিখো।

তোমার
নির্ম্মলা।

* * * *

দারজিলিং,
১২ই বৈশাখ।

প্রিয়তম,

চৌধুরীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সংবাদে তুমি এত উত্তেজিত হবে, বুঝতে পারলে তোমাকে সে কথা লিখতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু তুমি ত জান, আমি তোমার কাছে কখনো কিছু গোপন করি নি এবং কখনো করবও না। চৌধুরী আমাকে ভালবাসেন এবং আমিও তাঁকে ভালবাসি, এ কথা তোমাকে লিখতে আমার কোনই দ্বিধা হয় নি এবং তাতে কোন লজ্জার কারণও আমি দেখছি না। তাঁকে দেখলে তাঁর রূপগুণে তোমাকেও মুগ্ধ হতে হবে, তোমাকেও ভালবাস্‌তে হবে, এ কথা আমি জোর করেই বলতে পারি।

কাল বিকেলে বেড়াতে যেতে পারি নি, আমার বড় মাথা ধরেছিল। নির্ম্মলবাবুর বড় বোন এসে ডাকলেন, কিন্তু আমার মাথা ধরেছে, যেতে পারবো না শুনে চৌধুরীরও বেড়াবার উৎসাহ চলে গেল। নির্ম্মলবাবুরা তিন ভাইবোনে চলে গেলেন। আমি ফুল ভালবাসি, চৌধুরী শুনেছিলেন, গোটাকতক সুগন্ধ ফুল এনে আমার বালিশের পাশে রেখে, সারা বিকেলটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিয়রে বসে আমার মাথা টিপে দিতে লাগলেন। তাঁর কোমল হাতের স্নেহ-স্পর্শে বড়ই শান্তি পেলাম। একটু মাথাধরা, কিন্তু তাতেই যেন মহা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন,—কেমন আছি, কিসে সোয়াস্তি বোধ করব, বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। চৌধুরী যে আমাকে খুব ভালবাসেন, এই সব ছোটখাট ব্যাপারে তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি এবং আমিও দিন দিন তাঁর মায়ায় জড়িয়ে পড়ছি।

তোমার সঙ্গে যে বিয়ে স্থির হয়ে গেছে, এ কথা চৌধুরীর কাছে আমি নিশ্চয় গোপন করেছি, তুমি লিখেছ। তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একদিন চৌধুরী আমার লকেটটা দেখ্‌তে চাইলেন। হাতে নিয়ে লকেটটা খুলে তোমার ফটোটা দেখে, কার ফটো জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লাম তোমার ফটো এবং তোমার সঙ্গেই বিয়ে স্থির হয়েছে তাও বল্লাম। চৌধুরীর তাতে কোন ভাবান্তর বা আমার সঙ্গে আচরণ ব্যবহারের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করলাম না। বরঞ্চ একটা ঘটনায় তিনি যে আমাকে খুবই ভালবাসেন, তার প্রমাণ পেলাম। সে কথা শুনে তুমি যে খুব চটে যাবে তা বুঝতে পাচ্ছি; কিন্তু আমি ত কখনো তোমার কাছে কোন কথা গোপন করি নি, এ কথাও গোপন করবো না।

আমরা দুজনে বসে গল্প করছিলাম। চৌধুরী হঠাৎ দাঁড়িয়ে, দু'হাতে আমার মুখখানা তুলে ধরে বল্লেন, আমাকে তাঁর বড় ভাল লাগে, বড় ভালবাসতে ইচ্ছে করে। তার পর—তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করব না—দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার গালে একটা চুমো দিলেন! তিনি যে আমাকে ভালবাসেন, তাঁর কথাবার্ত্তায়, আচরণ ব্যবহারে কতকটা বুঝলেও, তাঁর ভালবাসার কথা আজ প্রথম তাঁর মুখে শুনলাম এবং তার প্রমাণ পেলাম। রাগ কর না, আমার কথায় বিশ্বাস কর, এ নিঃস্বার্থ নিরাবিল ভালবাসা, তিলমাত্র মলিনতা পঙ্কিলতা এতে নেই।

তোমার
নির্ম্মলা

* * * *

দারজিলিং,
১৬ই বৈশাখ।

প্রিয়তম,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার কাছে কোন কথা গোপন না করে সত্য ঘটনা সরল ভাবে তোমাকে লিখেছিলাম, লিখতে আমি এতটুকু দ্বিধা বোধ করি নি। আশা করেছিলাম, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমার

ভালবাসার উপর তোমার বিশ্বাস যে কত ক্ষীণ তা বুঝলাম। আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসি, সে যদি তুমি বিশ্বাস করতে, তা হলে কখনো এত বিচলিত হতে না, রাগে এমন আত্মহারা হতে না। শঠ, কপট, লঘুচিত্ত, নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত, কত কি বলে তিরস্কার করেছ, আমার শিক্ষা-দীক্ষায় সহস্র ধিক্কার দিয়েছ এবং এখনো আমাকে সাম্‌লে নেবার জন্য সতর্ক করেছ। নির্লজ্জ বেহায়ার মত কেমন করে চৌধুরীর ঘৃণিত আচরণের কথা তোমাকে লিখেছি, তা ভেবে বিস্মিত হয়েছ এবং আমারও যে কতদূর অধঃপতন হয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েছ!

তোমার ভ্রান্তি। নীতি-বিগর্হিত কোন কাযই আমি করি নি। শঠতা কপটতাও তোমার সঙ্গে করি নি, তা হলে চৌধুরী-সংসৃষ্ট কোন কথাই তোমাকে লিখতাম না। আমি অধঃপাতে যাই নি, তুমি সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও আপনাকে সামলাবার কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার সম্বন্ধে আমি এতটুকু অবিশ্বাসিনী হই নি। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা নিবাত নিষ্কম্প শিখার মত আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে; সৃষ্টিতে এমন কিছু নাই, যা নিমেষের জন্যও তাতে ছায়াপাত করতে পারে।

তুমি অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে লিখেছ, কিন্তু সে ত হয় না। এখানে এসে আমার শরীর বেশ ভাল হয়েছে, আর, তোমাকে পাই না সেই কষ্ট, নতুবা সকল রকমেই বেশ সুখে ও স্ফূর্ত্তিতে কাটছে। চৌধুরীরা এখানে আর একমাস থাকবেন, আমাদেরও আর মাসখানেক থাকতে হবে, বাবার কাছে চৌধুরী সেই আবদার করেছেন।

অবিলম্বে এখান থেকে চলে না গেলে, তুমি নিজে এখানে এসে বাবা মার কাছে সব কথা বলে দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে এবং চৌধুরীকেও একটু শিক্ষা দিয়ে যাবে বলে শাসিয়েছ। তাই এস, তবু ত তোমাকে দু'দিনের জন্য পাব। আর চৌধুরীকে যে শিক্ষা দেবে বলে শাসিয়েছ, আশা করি তাঁর সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করবে না এবং আমার বিশ্বাস তা পারবেও না। কিন্তু সে যা হয় হবে, তুমি কিন্তু নিশ্চয় এসো, তোমার আসাপথ চেয়ে রইলাম।

তোমার
নির্ম্মলা

দারজিলিং
২০ শে বৈশাখ।

কমলা দিদি,

তুমিও যে আমাকে ভুল বুঝবে, সে আমি মনে করি নি। রায় সাহেব ঈর্ষার অন্ধ উত্তেজনাবশে আমাকে যে কঠিন নিষ্ঠুর চিঠি লিখেছেন, তাতে আমি ক্ষুব্ধ দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু তুমি যে আমাকে হৃদয়হীন, উচ্ছৃঙ্খল, অপদার্থ এবং রায় সাহেবের ভালবাসার অযোগ্য বলে মনে করেছ, তাতে আমি বেশী ব্যথা পেয়েছি। শেষ পর্য্যন্ত জেনে-শুনে তোমার বিচার করা উচিত ছিল।

চৌধুরীর সংশ্রব ত্যাগ করে দূরে চলে গেলে আমার মোহ কেটে যাবে, এই মনে করে আমাকে অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে লিখেছিলেন। যদি না যাই তা হলে তিনি নিজে এখানে এসে, বাবা ও মাকে সব কথা জানাবেন, এবং যাতে এখানে আর থাকা না হয় তার চেষ্টা করবেন এবং চৌধুরীকেও একটু শিক্ষা দিয়ে যাবেন, এই বলে শাসিয়ে লিখেছিলেন। আমাদের এখন যাওয়া হবে না, তাঁকেই এখানে আসবার জন্য আমি লিখেছিলাম এবং তিনিও এসেছিলেন।

যখন তিনি এসে পৌঁছলেন, তখন আমি বাসায় ছিলাম না, আমরা অবজারভেটরী হিলে বেড়াতে গিয়েছিলাম—আমি আর চৌধুরী। বাবা মার সঙ্গে দেখা করে, আমরা অবজারভেটরী হিলে বেড়াতে গিয়েছি শুনে, অমনি ছুটলেন সেই দিকে। বাবা তাঁকে বিশ্রাম করতে বলে, লোক পাঠিয়ে খবর দেবেন বল্লেন, তা শুনলেন না। আমাকে এবং চৌধুরীকে শিক্ষা দেবার এমন সুযোগ এসেই পেলেন! অন্তরের জ্বালায় আত্মহারা হয়ে, আমাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে যখন তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, আমি প্রথম দেখতে পাইনি। এসেছিলেন আমার পেছন দিক দিয়ে।

চৌধুরী তাঁর অগ্নিমূর্ত্তি দেখে ভীতি-বিহ্বল মুখে একটু সরে যেতেই পেছন ফিরে দেখি রায় সাহেব! মুহূর্ত্তকালের জন্য আমি একটু বিচলিত হয়েছিলাম, কিন্তু তখনি আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লাম, ট্রেণ থেকে নেমেই এখানে দৌড়ে না এসে একটু খবর পাঠিয়ে দিলেই হত। সে যাক,

এসেছ ভালই হয়েছে, এখানেই চৌধুরীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দি—ইনিই চৌধুরী!

মুহূর্ত্তে রায় সাহেবের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। তাঁর আরক্ত চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল, ক্রোধ-কম্পিত দেহ শুদ্ধ এবং বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে গেল। আবিষ্টের মত বিস্ময়ে চৌধুরীর দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর দু-পা এগিয়ে এলেন—বজ্রমুষ্টিতে চৌধুরীর অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করে দেবার জন্য?—না, দুহাতে সেই সুশ্রী আটবছরের ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চেপে ধরলেন। চৌধুরীর বয়স আট বছর!

চৌধুরীকে দেখ্‌লে তাঁকেও ভালবাসতেই হবে, রায় সাহেবকে লিখেছিলাম, সে কথাটা তখন তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম। একান্ত লজ্জিত হয়ে ঈষৎ হেসে বল্লেন, আজ তাঁর যে শিক্ষা হল, জীবনে তা ভুলবেন না।

চৌধুরীর বয়েসটা গোপন করেছিলাম, এ ছাড়া আর কোন অপরাধ বোধ করি তোমরা এখন আর আমার খুঁজে পাবে না। কিন্তু রায় সাহেবের রোগের প্রতিকার কল্পে এ কৌশলটুকু আমাকে অবলম্বন করতে হয়েছিল। ফলও আশাতীত পেয়েছি। তাঁর যে শুধু ভুল ভেঙ্গেছে তা নয়, তাঁর প্রকৃতির এই দুর্ব্বলতা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন। এখন আমার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

তোমার

নির্ম্মলা।

বর্ষা এল'

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাদল আজি পাগল হ'য়ে
আসছে ব'লে,
শুক্‌নো তরু উঠল' জেগে
কানন-কোলে।

কানন-রাণীর গোপন ব্যথা,
ঝুম্‌কো লতার অসাড়তা,
মেঘের ডাকে বাদল-বায়ে
যায় যে চ'লে।
বর্ষা আবার বিপুল বেগে
আসছে ব'লে॥

উদাস চাষীর ফুটল' হাসি
ভরসা হ'ল,
কে আর কঠোর রৌদ্র-শাসন
মানবে বল'?

মেঘ-মাদলের সজল খেলা,
বনাঞ্চলের হাসির মেলা
সুপ্তি ভাঙ্গায়, চিত্ত জাগায়
বাদল দোলে।
বাদল আজি নাম্‌ল' ধরায়
অট্টরোলে॥

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

কলিকাতা যোড়াসাঁকো-নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। মহাভারতের অনুবাদ তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি। অন্যান্য কীর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, মহাভারতের এই অনুবাদ প্রকাশ এবং হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা রচনার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

১৮৪১ (?) খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র চার-পাঁচ বৎসর সেই সময় তাঁহার পিতা নন্দলাল সিংহ (ছাতু সিংহ)-এর মৃত্যু হয় (১৮৪৬, ৬ এপ্রিল)।* স্বনামধন্য হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের অভিভাবক এবং পিতৃসম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।† বলা বাহুল্য, কালীপ্রসন্ন শৈশবে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে, বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসু-বংশের বেণীমাধব বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত ত্রয়োদশ-বর্ষ বয়স্ক কালীপ্রসন্নের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। কন্যাকর্ত্তা ছিলেন—রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন:—

(২৫ জুলাই ১৮৫৪। ১২ শ্রাবণ ১২৬১)

শুভ বিবাহ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্র।—বাগবাজার নিবাসি প্রসিদ্ধ বসু বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু বেণীনাথ বসু যিনি রঙ্গপুরের মুন্সেফি কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহার কন্যা এবং যোড়াশাঁকো নিবাসি অতি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য সিংহ বংশোদ্ভব ৺প্রাপ্ত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, এই উভয়ের শুভ বিবাহ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধপত্র অবধারিত হইয়াছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যার পরে শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রশস্ত নৃত্যাগারে এই শুভ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্র লিখনোপলক্ষিত মহা সভা হইয়াছিল, বরকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়, সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ ও সর্ব্ব দেশ বিখ্যাত বিচারক শ্রীযুক্ত রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর কলিকাতা পোলিস মাজিস্ট্রেট অধুনা কলিকাতা নগরীয় কনিষ্ঠ বিচারালয়ের কনিষ্ঠ জজ মহাশয় কর্ম্মাধ্যক্ষ, কন্যাকর্ত্তা অতি ধীর নম্র স্বভাব শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ বসু এবং তদনুজ সুখ্যাত সদর আমীন আলা শ্রীযুক্ত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরও বটেন, কন্যাটী অতি সুন্দরী, বর সর্ব্ব সুন্দর মনোহর যুবা, শুভ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধনের এই এক প্রধান কারণ, ইহাতেই ভবিতব্য নির্ব্বন্ধ সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত সভায় গোষ্ঠীপতি দলপতি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ন্যূনাধিক পাঁচ শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঘটক কায়স্থ কুলীনাদি মধ্যে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন,..।"

(৮ আগষ্ট ১৮৫৪। ২৫ শ্রাবণ ১২৬১)

"গত শনৈশ্চর বাসরীয় [৫ আগষ্ট] যামিনীযোগে আমার দিগের প্রিয় বন্ধু পরলোকগত বাবু নন্দলাল সিংহ

---

* "সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।—ডনকেন ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাদী। ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী হরচন্দ্র ঘোষ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিবাদি।

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে উল্লেখিত মোকদ্দমা বিষয়ে ইংরাজী ১৮৫৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে যে অনুমতি প্রদত্ত হয় তাহার ক্ষমতা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত ছাতু সিংহ যিনি নন্দলাল সিংহ নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং যিনি মহানগর কলিকাতায় বাস করিতেন এক জন হিন্দু প্রজা ছিলেন ও যিনি ১৮৪৬ সালের ৬ আপ্রিল তারিখে অথবা তৎসময়কালে পরলোক গমন করেন.....। W. Morgan, Master."—সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মার্চ্চ ১৮৫৪ (১ চৈত্র ১২৬০)।

† ১৮৫৪, ৯ই ডিসেম্বর তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত "মাষ্টর আফিসের বিজ্ঞাপন" হইতে জানা যায়:—"...সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারাগার হইতে ১৮৫৩ সালের ৬ সেপ্তেম্বর তারিখে যে ডিক্রী প্রদত্ত হয় এবং যাহাতে মৃত নন্দলাল সিংহের শেষ ইচ্ছা পত্র ও দান পত্রের একজিকিউটর ও একজিকিউট্রিকস রায় হরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণী দাসী...।"

মহাশয়ের বংশধর পুত্র শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুর উদ্বাহ কার্য্য রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে তদ্বিষয় রক্ষক সুধীবর শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এতৎ শুভ ব্যাপারে সময়ানুযায়িক সমারোহের ত্রুটি করেন নাই, নগরীয় যাবতীয় ধনি মহাশয়গণের বাটীর উত্তম ও মূল্যবান সমাজিক প্রেরণ হয়। তৈল পূর্ণ পিত্তল কলসী, থাল ভরা সন্দেশ, পরিধেয়োপযুক্ত বস্ত্র ও রৌপ্য লৌহ এবং মাঙ্গলিক সামগ্রী সকল শোভাবাজারীয় রাজদলস্থ প্রধান ব্যক্তিগণকে এবং সিংহ বাবু দিগের যাবতীয় সামাজিক ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের আলয়ে দেওয়া যায় এবং বিদ্যাব্যবসায়ি পণ্ডিত মহাশয়েরাও বাবুর দানে তুষ্ট হইয়াছেন তদ্ভিন্ন গা- বাদ্য নৃত্য শ্রবণা-বলোকনে এবং রোসনাই আদি সন্দর্শনে দর্শক মাত্রে পরিতৃপ্ত হয়েন এবঞ্চ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত মহামহিম কৌন্সলাধ্যক্ষ সুপ্রিম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালতের মান্যবর বিচারপতি গণ ও সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারিরা নৃত্য গান দর্শন ও শ্রবণে আমোদিত হইয়া যান, সর্ব্বোপরি রতি ও রতিপতিসমদম্পতীর শোভাবলোকনে তাবল্লোকে আনন্দিত হইয়াছেন, হরচন্দ্র ঘোষ বাবুর এতদ্ব্যাপারে যশঃকীর্ত্তন কালে নববিবাহিত দম্পতীর সুখ সম্বর্দ্ধনা অগ্রে প্রার্থনা করি।"

'সংবাদ প্রভাকরে' (৪ আগষ্ট ১৮৫৪) "রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার সহিত" কালীপ্রসন্নের বিবাহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত সকলেই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে লোকনাথ বাবুর কন্যার সহিতই কালীপ্রসন্নের বিবাহ হইয়াছিল। এখন জানা গেল তাহা ভুল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কালীপ্রসন্নের ঘটনাবহুল জীবনের অংশবিশেষ মাত্র—বিদ্যোৎসাহিনী সভার কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া ১৮৫৬, ১ ফেব্রুয়ারি (১২৬২, ২০ মাঘ) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন,—

"৭ মাঘ শনিবার যামিনী ৭ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভা নির্ব্বাহিত হইয়াছে, এই সভা দ্বারা দেশের যে কত হিতসাধন হইবেক তাহা বলা যায় না। এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল ইহার মধ্যে দেশের অনেক কুপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ইতিপূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা অনেক ভদ্রসন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেহবা সাপক্ষে কেহবা বিপক্ষে ও কেহবা এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে যদ্যপি তাঁহারা ঈর্ষ্যবৃত্তির বশীভূত হইয়া এই মঙ্গলকর পথের পথিক হয়েন তাহা হইলেও তাঁহারদিগকে নিন্দা করা যায় না, কারণ এবিষয়ে জিগীষা প্রবৃত্তি না হইলে কখন উৎসাহ চিরস্থায়ী হয় না। আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন, তাহা হইলে বোধ করি অত্যল্পকাল মধ্যে দেশস্থ তাবতেই সভ্যতাসোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেক।"

দেখা যাইতেছে ১৮৫৬, ১৯এ জানুয়ারি তারিখে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। ইহা হইতে সকলেই বলিয়া আসিয়াছেন যে ১৮৫৫ সালে এই সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু সমসাময়িক একখানি সংবাদপত্রের বিবরণ হইতে মনে হয় ইহার অনেক আগেই বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৫৭, ১৩ জানুয়ারি (১ মাঘ ১২৬৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি :—

"বিজ্ঞাপন।—২ মাঘ বুধবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবে, দর্শক মহাশয়গণ সভারোহণ করত বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।"

বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা ১৮৫৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত হইলে, ১৮৫৫ সালে ঐ সভার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। তবে

কি 'সংবাদ প্রভাকরে'র এই বিজ্ঞাপনে কোনো ভুল আছে? আমাদের তাহা মনে হয় না, কারণ মাঘ, ১৭৭৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৪৪ পৃষ্ঠাতেও ঠিক ঐ ভাষায় বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ১৮৫৫ সালের পূর্ব্বেই বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভাগুলি যথাসময়ে না হইয়া বিলম্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে বর্ষকাল মধ্যেই তিনটি সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। পক্ষান্তরে বিদ্যোৎসাহিনী সভার ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরোক্ষ একটি প্রমাণ আছে। ১৮৫৩, ১৪ই জুন (১২৬০, ১ আষাঢ়) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি,—

"জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ।···৺ নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।"

এই সভাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাহা সন্দেহ করিবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

বহু গণ্যমান্য কৃতবিদ্য লোক বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সভার প্রথমাবস্থায় কালীপ্রসন্ন কিছুদিনের জন্য সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন সংবাদপত্র—'সমাচার সুধাবর্ষণে' বিদ্যোৎসাহিনী সভার একটি অধিবেশন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমরা গত শনিবাসরীয় যামিনী যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভায়' গমন করিয়াছিলাম তাহাতে প্রথমতঃ সভাগারে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত পরিতাপিত হইলাম গুণসিন্ধু প্রিয় বন্ধু ৺বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয় ঐ সভাগারে উপবেশন, সভামন্দির প্রবেশ মাত্র ঐ প্রিয় পাত্র মহাশয় আমার দিগের হৃদয়মন্দিরে উদয় হইলেন অথচ দৃষ্টিপথে আসিলেন না ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু শোক আমার দিগের ক্লেশকর হইল তৎপরে সভা শোভনতা এবং তাঁহার প্রিয় পাত্র সৎপুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সচ্চরিত্রতাদি বিবিধগুণে আবদ্ধ হইয়া শোক সিন্ধু হইতে উদ্ধার পাইলাম, ন্যূনাধিক দুই শত ভদ্র সন্তান ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার দিগকে সম্বোধন করিয়া অকুণ্ঠ সুকণ্ঠ স্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয় দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন, কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেশ্বরাদি নানা স্থানীয় গণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কিং উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তৎপরে সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ শর্ম্ম মল্লিখিত বিস্তারিত রূপে ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত করেন অনন্তর কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈষদ্‌হাস্য প্রসন্ন বদনে বলিলেন, সভ্য ও দর্শক মহাশয় দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা করুন, তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়া সভার কার্য্য এবং উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অনুভব করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

এতদ্দেশীয় ধনি সন্তানেরা বাল্যাবস্থায় বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করেন কিন্তু পরে সে বিদ্যা বিদ্যাসুন্দরীয় বিদ্যার ন্যায় হয়, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কার্ত্তিকের ন্যায় সুন্দর পুরুষ বটেন এবং বহু পরিশ্রমে বিদ্যালভ্যও করিয়াছেন তথাচ বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া ইন্দ্রিয় গণকে বিদ্যাসুন্দরীয় কার্য্যে প্রযোজন করেন নাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ধনী বালক যে সর্ব্বলোক হিতার্থি বিদ্যোৎসাহিনী সভা করিয়া স্বদেশীয় যুব বান্ধবগণকে জ্ঞান পথে সুরত করিতেছেন ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রকারে বাধিত হইয়াছি এবং আমার দিগের গ্রাহক মহাশয়গণকে অনুরোধ করি বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণ করিয়া বিদ্যোৎসাহিনী সভার উন্নতি করুন।" *

সাধারণতঃ শনিবার সন্ধ্যাকালেই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন হইত, নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতেও তাহা বুঝা যায় :—

"বিজ্ঞাপন।—অদ্য রজনী ৭ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত মণ্টেগু সাহেব লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান করিবেন সভ্য ও দর্শক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।" †

* সমাচার সুধাবর্ষণ—১২ ভাদ্র ১২৬২ (১৬।১৭ আগষ্ট ১৮৫৫)
† সংবাদ প্রভাকর, শনিবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ (১২ ফাল্গুন ১২৬২)

১৮৫৬ সালের ১৫ মার্চ পর্য্যন্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

"বিজ্ঞাপন।—অদ্য শনিবার সন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রকাশ্য সভা হইবেক, দর্শক ও সভ্যগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশের কুরীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

শ্রীউমাচরণ নন্দী।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।" *

কালীপ্রসন্নের পর বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক হন রাধানাথ বিদ্যারত্ন। ১৭৮০ শক ফাল্গুন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কর্ত্তৃক গদ্যে অনুবাদিত বাঙ্গালা মহাভারত" বিতরণের যে "বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হয় তাহাতে আমরা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক রূপে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম দেখিতেছি।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল তাহা বলা দুরূহ। তবে ১৮৬২ সালেও যে এই সভা জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্য সভার আয়োজন করেন। সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই সভায় কালীপ্রসন্ন কবিবরকে একখানি অভিনন্দন-পত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য রজত পান-পাত্র উপহার দিয়াছিলেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার অভিনন্দন প্রসঙ্গে মাইকেল তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—"You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!" *

১৮৬২ সালে পাদরী লঙ যখন এদেশ ত্যাগ করেন, সেই সময়ে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ১৮৬২, ৩ মার্চ তারিখে *Hindoo Patriot* লিখিয়াছিলেন :—

"The Biddotshahinee Sabha headed by Babu Kali Prossunno Sing presented an excellent valedictory Address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honour to those from whom it emanated."

বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মাতৃভাষার প্রতি কালীপ্রসন্নের আন্তরিক টান ছিল। তিনি বাংলায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র কথা ছাড়িয়া দিলে, বাকীগুলি বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত হয়। কালানুসারে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিতেছি :—

১৮৫৩ (?)—বাবু নাটক। †

১৮৫৫, ১৪ই ডিসেম্বর (১২৬২, ২৯ অগ্রহায়ণ) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত "বিজ্ঞাপন" হইতে এই নাটকখানির কথা জানা যায় :—

"পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক্ নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি, কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারিমুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ॥০, বিনা স্বাক্ষরকারী ৸০ মাত্র।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।"

* মধু-স্মৃতি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, পৃ. ১৫৪-৫৬, ৭৪৪ দ্রষ্টব্য।

† এই নাটকখানির অস্তিত্ব জানা না থাকায় ডাঃ শ্রীযুত সুশীলকুমার দে, গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "কালীপ্রসন্ন সিংহের নাট্য-গ্রন্থাবলী" প্রবন্ধে, ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক'কে কালীপ্রসন্নের "প্রথম উদ্যম" "প্রথম সাহিত্যিক রচনা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† সংবাদ প্রভাকর, ১৫ মার্চ ১৮৫৬ (৩ চৈত্র ১২৬২)

১৮৫৭ (সেপ্টেম্বর)—বিক্রমোর্ব্বশী নাটক

ইহা মহাকবি কালিদাস-রচিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাংলায় অনূদিত। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (১৭৭৯ শক, আশ্বিন, পৃ. ১২৭) লিখিয়াছিলেন :—"প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ

পূর্ণচন্দ্রোদয়-পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল ;···রচনাচাতুর্য্য-দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের ন্যায় প্রশংশিত সিংহ মহাশয় ভট্টাচার্য্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই ; যেহেতু ইহাতে নস্যের গন্ধমাত্র বোধ হয় না।”

১৮৫৮—সাবিত্রী সত্যবান নাটক

‘বাবু নাটক’-এর ন্যায় এখানিও কালীপ্রসন্নের নিজস্ব রচনা।

১৮৫৯—মালতী মাধব নাটক

মহাকবি ভবভূতি বিরচিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত।

১৮৬২—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

১৮৬২ সালে প্রথম ভাগ এবং তাহার অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালা মহাভারত

১৭৮০ শকে ইহার অনুবাদ-কার্য্য আরব্ধ হয়। শেষ হইতে ৮ বৎসর লাগিয়াছিল।

বঙ্গেশবিজয়।—কালীপ্রসন্ন এই নামে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। ১৮৬৮ সালে ইহার দুই ফর্ম্মা ছাপাও হইয়াছিল, * কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত নিম্নলিখিত “বিজ্ঞাপন”গুলি হইতে তাহাদের নাম পাওয়া যাইবে :—

(১৬ আগষ্ট ১৮৫৫। ১ ভাদ্র ১২৬২)

“বিজ্ঞাপন।—‘বিধবোদ্বাহ নাটক’ যাহা আমরা সাতিশয় পরিশ্রমে প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি, তাহা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় অথবা ঐ সভার সহকারি সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের নিকটে পত্র লিখিলে তাঁহাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা যাইবেক, ঐ নাটকের মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র।

যোড়াসাঁকো নম্বর ৯৩ শ্রীউমেশচন্দ্র মল্লিক।
বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক

(২০ নভেম্বর ১৮৫৫। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৬২)

“বিজ্ঞাপন।—‘বিধবোদ্বাহ নাটক’ যাহা আমরা সাতিশয় পরিশ্রমে প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি, তাহা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় অথবা ঐ সভার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট পত্র লিখিলে তাঁহাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা যাইবেক, ঐ নাটকের মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র।

শ্রীপ্রিয়মাধব বসু।
বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহকারি সম্পাদক।”

‘বিধবোদ্বাহ নাটক’ কাহার রচিত এখনও জানিতে পারি নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপন দুইটির ধরণ হইতে কালী-প্রসন্নের রচনা বলিয়াই মনে হয়।

১৮৫৬, ২৫ ফেব্রুয়ারি (১২৬২, ১৪ ফাল্গুন) তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকর’ হইতে বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত আরও দুইখানি পুস্তকের কথা জানা যায় :—

“বিজ্ঞাপন।—নিম্ন লিখিত পুস্তক বিক্রয়ার্থ তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রস্তুত আছে।

মনুষ্যের মহত্ত্ব কি	···	মূল্য ৵০
বালক রঞ্জন দুইখণ্ডে বিভক্ত	···	” ।৵০

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।”

কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিতকার শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ শেষোক্ত পুস্তকখানি—বালকরঞ্জন, দুই খণ্ড—কালীপ্রসন্নের রচনা বলিয়া মনে করেন।* কিন্তু মন্মথবাবুর এই অনুমান ঠিক নহে। তাহার প্রমাণ ‘সংবাদ প্রভাকরের’ নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে :—

* শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার ‘বঙ্গাধিপ-পরাজয়’ গ্রন্থখানি বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্নের নামে উৎসর্গ করেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ সালে লিখিত) প্রকাশ :—“···গ্রন্থের নাম ‘বঙ্গেশবিজয়’ দিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে, উক্তাভিধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য্য যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে, একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে ‘বঙ্গেশবিজয়’ নামের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থের নাম ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ দিলাম।...(২ আশ্বিন ১২৭৫)”

* “Kali Prossunno also appears to have written a work in two volumes entitled *Balak Ranjan* in the beginning of 1856.”—*Memoirs of Kali Prossunno Singh*, p. 20.

“সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।—মাঘ :—···হালিশহর নিবাসি বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ‘বালক রঞ্জন’ নামে দুই খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করেন।” *

বিদ্যোৎসাহিনী সভার পুস্তকগুলির অধিকাংশই তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৮৫৭ সালে (১৭৭৮ শক, ফাল্গুন) কালীপ্রসন্ন সিংহ এই যন্ত্রের অন্যতম “যন্ত্রাধ্যক্ষ” নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। †

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র

১৮৫৭ সালে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার সম্পাদিত ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ’ নামক সচিত্র মাসিকপত্রে, কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনূদিত ‘বিক্রমোর্ব্বশী নাটক’-এর (১৯৪১ সং.) সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—

“বেণীসংহার-নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন, তাহাতে উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং সেই উদ্যমের ফলস্বরূপ আমরা বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গৌড়িয়ানুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রশংসিত বাবুর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবেক না। ঐ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে ; গ্রন্থ রচনায় কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না ; কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কালমধ্যে নানা গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন।” ‡

উপরের অংশ হইতে জানা যাইতেছে ১৮৫৭ সালের পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ কোন “সাময়িক পত্র” প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সাময়িক পত্রখানি কি, তাহা ইতি-পূর্ব্বে জানা ছিল না। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট,’ ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ’, § ‘পরিদর্শক’ প্রভৃতি যে-সকল সাময়িকপত্রের সহিত সিংহ-মহাশয়ের নাম বিজড়িত তাহার কোনখানিই ১৮৫৭ সালের পূর্ব্বে তাঁহার তত্ত্বাবধানে আসে নাই। এই কারণে মন্মথবাবু ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে’ রাজেন্দ্রলালের উক্তি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—

“ডেবিড্ হেয়ার সাম্বৎসরিক সভা ও বিদ্যোৎসাহিনী সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, এইরূপ শুনা যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন্ সাময়িক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহা জানিতে পারি নাই।” (“মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ”, পৃ. ২২ পাদটীকা)

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তিতে কোনো ভুল নাই। ১৮৫৭ সালের পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ সত্যসত্যই একখানি সাময়িক পত্র বাহির করিয়াছিলেন ; তাহার নাম ‘বিদ্যোৎ-সাহিনী পত্রিকা’। ইহা বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল কিংবা মে মাসে এই

* সংবাদ প্রভাকর—১২ এপ্রিল ১৮৫৬ (১ বৈশাখ ১২৬৩)

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৭৮ শক ফাল্গুন, পৃ. ১৬০।

‡ বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ, শকাব্দা ১৭৭৯, আশ্বিন, পৃ. ১২৭-২৮।

§ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ’ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম দুই সংখ্যায় ভুলক্রমে “১৭৮২ শক” মুদ্রিত হইয়াছে, এবং শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮৬১, ২৭ মে (১২৬৮, ১৫ জ্যৈষ্ঠ) তারিখের “সোমপ্রকাশে” দেখিতেছি :—

“বিজ্ঞাপন।—ইংলণ্ডীয় বিচিত্র চিত্রযুক্ত পুরাবৃত্ত ইতিহাস শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্র এতাবৎকাল গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে অনুবাদক সমাজের অধীনে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বর্ত্তমান সন ১২৬৮ শাল হইতে অনুবাদক সমাজ তৎপত্রের সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে অর্পণ করিয়াছেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা বিবিধার্থ বিষয়ক পত্রাদি ও নিজ নিজ পূর্ব্ব দেয় ও বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের শিরোনামায় যোড়াসাঁকস্থ ভবনে প্রেরণ করিবেন।···শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

বিবিধার্থ সংগ্রহের সহকারী সম্পাদক।”

সিংহ-মহাশয় অন্যান্য সাময়িক পত্রেরও উৎসাহ-দাতা ছিলেন। ১৮৬১ সালের জুন মাসে ‘ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র’ নামক পাক্ষিক সমাচারপত্র প্রকাশিত হয়। রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইত। কাগজখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইত। সম্পাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণি কয়েকজন প্রধান ও ধনবান লোকের নিকট যে অর্থ-সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার দ্বারাই কাগজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এই সাহায্যকারীদের মধ্যে কালীপ্রসন্নের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—তিনি পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছিলেন। (সোমপ্রকাশ, ১ জুলাই ১৮৬১) ১২৬৯, ২৮ আশ্বিন তারিখের (পৃ. ৫৫০) “সোমপ্রকাশে” দেখিতেছি,—“আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ দাতা স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।”

মাসিকপত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়; তাৎকালিক সংবাদ-পত্র—'সমাচার সুধাবর্ষণ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

"বিদ্যোৎসাহিনী সভা।—বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে এদেশের বাল্য বিবাহ কৌলীন্য মর্য্যাদা, চঞ্চল স্বভাব এবং বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা এই কয়েকটি বিষয় অতি সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে, বিদ্যোৎ-সাহিনী সভার অধীনে প্রতিমাসে ঐ পত্রিকা প্রকাশ হয় যুগলসেতু নিবাসি সর্গবাসি ৺ নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের সুশীল পুত্র শ্রীমান বাবু কালিপ্রসন্ন সিংহের বিশেষ উৎসাহ ঐ সভা স্থাপিত হইয়াছে, সভ্যেরা বিনামূল্যে ঐ পত্রিকা সকলকে বিতরণ করেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ নবিন বয়েসে জাবতীয় ভাষানুশীলনে এরূপ অনুরাগী হওয়াতে আমরা অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম।" *

পাদরী লঙও তাঁহার *Descriptive Catalogue of Bengali Works* (1855) পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠায় এই কাগজখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"296. *Vidutsahini Patrika*, monthly, pp. 9, 1 an., Ser. P., 1855, Essays."

মন্মথবাবু পুস্তকরচনাকালে সম্ভবতঃ লঙের এই ক্যাটালগখানি দেখিবার সুবিধা পান নাই, নতুবা তিনি অনুমান করিতেন না যে "১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্ বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নিকটে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'সর্ব্বশুভকরী' নামে একটী পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন।" (পৃ. ৯৫) সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্ত্তন করেন—কালীপ্রসন্ন নহেন, এবং ১৮৫৪ সালেও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

১৮৫৬ সালে কালীপ্রসন্ন তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত করেন। † এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৭, ৯ই এপ্রিল রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক অনূদিত বেণীসংহার নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকখানির সমালোচনায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (১৭৭৯ শক ভাদ্র, পৃ. ১০৮) লিখিয়া-ছিলেন :—

"কয়েক মাস হইল শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ * মহাশয়ের সদনে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের সাতিসয়প্রযত্নে প্রস্তাবিত অনুবাদ-গ্রন্থের অভিনয় হইয়াছিল; তদ্দর্শনে স্বহৃদয় মহাশয়েরা যে প্রকার পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল যে পণ্ডিতবরের অনুবাদ ও নটদিগের নাট্যক্রিয়া কোন মতে দূষণীয় হয় নাই; সকলেই আপন২ প্রযত্ন পূর্ণরূপে সফল করত দর্শক ও পাঠক উভয়েরই প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।"

'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়, ঠিক এই সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভা রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' নাটক অভিনয় করিবার আয়োজন করিতেছিলেন :—

"১২৬৩, ফাল্গুন। · কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অনুরূপ প্রদর্শনের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা আয়োজন করিতেছেন।" †

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই নাটক বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

বেণীসংহার নাটকে কালীপ্রসন্ন প্রশংসার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। অতঃপর কালীপ্রসন্ন স্বয়ং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

"বেণীসংহার-নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়া-ছিলেন, তাহাতে উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং সেই উদ্যমের ফলস্বরূপ আমরা বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গৌড়ি'য়ানুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বিক্রমোর্ব্বশী' পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হয়। ইহার 'বিজ্ঞাপন'-পাঠে আমরা বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমির কথা ও নাটক-রচনার উদ্দেশ্য জানিতে পারি :—

* সমাচার সুধাবর্ষণ—২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ (৫ জুন ১৮৫৫), পৃ. ৩-৪

† "The *Bidyotshahinee Theatre* is in the second year of its existence."—*Hindoo Patriot*, 3 Decr. 1857.

* দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের দুই পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র—রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের এক পুত্র—নন্দলাল। এই নন্দলাল সিংহের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন।

† সংবাদ প্রভাকর—১ চৈত্র ১২৬৩ (১৩ মার্চ ১৮৫৭)।

"বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসি গণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্ব্বকালে মহাকবি কালি-দাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায় দুই তিনশত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এককালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্‌সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গ ভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবায় কারণ অনেকের মনো-রঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গ ভূমিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গ ভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গ ভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতি ভাজন ও শত শত ধন্য বাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতি-শয়ে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎ-সাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গ ভূমিতে অনুরূপ কারণই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎ-সাহী মহোদয় গণের পাঠ যোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গ ভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।"

১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বিক্রমোর্ব্বশী নাটক অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' (৩ ডিসেম্বর ১৮৫৭, পৃ. ৩৮৮-৮৯) 'বিক্রমোর্ব্বশী' অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। *

১৮৫৮ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' প্রকাশিত হয়। এই বৎসরের ৪ঠা জুন (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫) তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে নাটকখানির মহলা দেওয়া হইয়াছিল। † বোধ হয় ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া খৃষ্টানদের 'অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্র ১৫ই জুন তারিখে লিখিয়াছিল :—

"পাক্ষিক সংবাদ।···কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কালী-প্রসন্ন সিংহের বাটীর রঙ্গভূমিতে এবং জনাঞ্জি গ্রামে নানা রঙ্গ হইতেছে। স্বদেশীয় বাবু ভাইয়েরা দয়া ধর্ম্ম এবং দেশোন্নতি ছাড়িয়া নাট্যশালায় রঙ্গ করিতেছেন!"

পর বৎসর (১৮৫৯) কালীপ্রসন্নের 'মালতী মাধব নাটক' প্রকাশিত হয়। এখানিও 'বিক্রমোর্ব্বশী'র ন্যায় মূল সংস্কৃত হইতে অনূদিত। ‡

* শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষের *Memoirs of Kali Prossunno Singh* পুস্তকের ৩৩-৪১ পৃষ্ঠায় ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

† "We glean from the old files of the *Sambad Prabhakar* that the play [Sabitri Satyaban] was rehearsed at the *Bidyotshahinee Theatre* on the 23rd Jaistha, 1265 Bengali Era (June, 1858)."—*Memoirs of Kali Prossunno Singh*, p. 42.

‡ রবিবাসরের ২য় বর্ষ ত্রয়োদশ অধিবেশনে পঠিত।

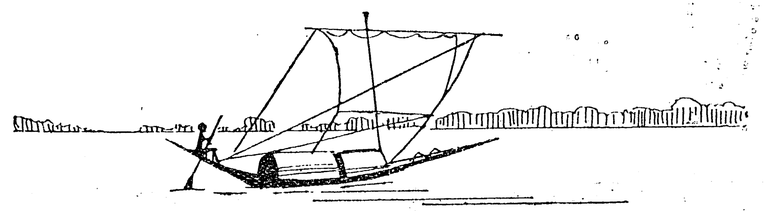

সাহিত্যের আবহাওয়া *

শ্রীসরলা দেবী-চৌধুরাণী বি-এ

অনেক সাহিত্য-সমাজ বা সম্মিলনীর অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু আজকের মত এমন মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যে কখন অভিভূত হইনি। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় জলধর সেন মহাশয় ৭২ বৎসর বয়সে, শরীরের একাংশে বাতের ক্লেশ ও পঙ্গুতা, ও অপরাংশের একটি আঙ্গুলে বিষফোড়া—কার্বঙ্কেলের যন্ত্রণা বহন করেও যে এই সভায় আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করতে না এসে থাকতে পারেন নি, সেই সাগ্নিক ব্রাহ্মণোপম সাহিত্যিকের একদিন নিজ-হাতে প্রজ্বালিত এই সমাজটির সাহিত্যাগ্নি যাতে স্তিমিত না হয় তার জন্য তাঁর এই প্রাণপাত আগ্রহ দেখে বিগলিত হয়েছি। কিন্তু মহিলাশ্রোতৃবৃন্দের দিক থেকে যে কোলাহল উত্থিত হয়ে এই তপস্বী বৃদ্ধের আজকের তপস্যা পণ্ডপ্রায় করেছে, কোন প্রবন্ধ পাঠকেরই প্রবন্ধ কারো শ্রুতিগোচর হতে পারে নি, প্রত্যেককেই একটুখানি পড়েই রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে, তাতে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করেছি। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ আর না হতে পারে তার জন্য কর্ম্মকর্ত্তাদের ভাল বন্দোবস্ত রাখা আবশ্যক।

আপনাদের সম্পাদক মহাশয় জানালেন—এবার সভানেত্রীর অভিভাষণ হবে। আপনাদের আমি আশ্বস্ত করছি, এত রাত্রে এই কোলাহলের মধ্যে কোন দীর্ঘ অভিভাষণে আপনাদের ব্যতিব্যস্ত করব না। আমার শুধু একটি কথা বলার আছে, সেটি বলেই শেষ করব।

চারিদিকে পলিটিক্সের খরশান অস্ত্রপাত, ঘাতপ্রতিঘাত, গালিবিগর্হন, পরদোষাসহন, আক্ষেপ প্রতিক্ষেপের ঝাঁঝে দেশটা যখন ক্ষেপে উঠে তখন কোথায় সাহিত্য? সাহিত্য কোথায়? কোথায় তার মলয় উত্তরীয়, কোথায় চন্দনচর্চ্চিত ভাল? কোথায় তার শুভ্রস্মিতানন, কোথায় পুণ্য দরশন?

পরস্পর-স্পর্দ্ধায় নেতাদের "বাণী"র যখন বাচ খেলা চলে, তখন বাণী বীণাপাণি অন্তর্দ্ধান হন, তাঁর নিভৃত নিকুঞ্জের কমলদ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, আপামর সাধারণ সেখানে প্রবেশের অধিকার হারায়, একমাত্র মহাকবির করস্পর্শে তা উন্মুক্ত হয়, তাঁরই তথায় নিত্য অবারিত গতিবিধি থাকে।

কিন্তু কবি একা সেই কমলবন থেকে যে মধু আহরণ করে আনেন, তা কি বিশ্ববাসীর জন্যে পর্য্যাপ্ত! মানুষ যদি নিজে প্রতিদিন একবারটি অবগাহন স্নান না করে, শুধু কুম্ভে ভরা গঙ্গাজলটুকু কি তার ধৌতি ও শান্তি বিধান করতে পারে? প্রত্যেকেরই আবশ্যক নিজের জীবনের খানিকটা অংশ ঘিরে সাহিত্যের আবহাওয়া রচনা করা—যে আবহাওয়া মনের শতদল বিকাশের উপযোগী, যে আবহাওয়ায় শতদলবাসিনী স্বয়ং ধরা দেন।

প্রতি সন্ধ্যায় সিনেমায় নাই বা গেলে, বাদবিতণ্ডার আড্ডায় হাজরি নাই দিলে, কে কাকে গাল দিয়েছে তার খোঁজে খবরের কাগজের পাত নাই বা উল্টালে, কে তোমায় হীন করে নিজে বেড়ে উঠবার চেষ্টা করছে তার পরোয়া নাই করলে, তাতে অভিভূত নাই বা হলে! ঘরের ও মনের সব দুয়োর বন্ধ করে একটি গবাক্ষ খালি খুলে রেখে দু-দণ্ড বসে থাক দিকিন? কোথা হতে আকাশপথে কে ভেসে আসবে,—কোন্ সব-চেয়ে পরিচিত, কোন্ চির-অপরিচিত, —তোমারই প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা!

বিনা মৌমাছির আনাগোনায় বুকের গহ্বরে একটুখানি মধু কোথা হতে সঞ্জাত হবে। সে মধু শুধু মধুর নয়, সে বিরহে বিধুর—কত ব্যর্থ জীবনের, কত বঞ্চনাকৃত মনুষ্যত্বের। সেই মধুটুকুতে, সেই অশ্রুগর্ভ আনন্দের কণায় যখন প্লাবিত হবে, তখনই সম্যক্ সাহিত্যের আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। আরও কিছু হবে। সেই অপূর্ব্ব রসের, সেই জ্ঞান বুদ্ধি ও শক্তির কুম্ভে স্নাত হয়ে যখন উঠবে—বিশ্বে এখন যে ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ, আর সে ভাবে নিজেকে ফেলাছড়া করতে প্রবৃত্তি হবে না। তখন সব দ্বারগুলি খুলে আবার যে মানুষ বেরিয়ে আসবে, সে একটি নূতন মানুষ। তখন তার অনাবিল দৃষ্টি, অপঙ্কিল মন সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই

* গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য-সমাজের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

হোক্—বা আত্মাভিব্যক্তির অন্য কোন পথেই হোক্—একটি নূতন কল্পের সৃষ্টিপ্রয়াসী হবে। শুধু ভারতবাসীর কেন, জগৎবাসীর মুক্তি এই পথে ছাড়া অন্য পথে হবার নয়—দেশের মুক্তি যে পথেই আসুক।

দুর্জ্জয় অহমিকা, অদম্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নির্লজ্জ আত্মাস্ফালনের সংক্রামক জ্বরে দেশবাসীর দেহমন জর্জ্জরিত। বসুন্ধরা তপ্ত হয়ে উঠেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস শুধু ঝলসান আলো, শুধু শুষ্ক প্রখর উত্তাপ, শুধু স্বেদক্লিষ্ট আপাদমস্তক—তারই মধ্যে ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি।

কখন্ জন্ম নেবে ছোট ছোট কোঁকড়াচুল ভাবের মেঘগুলি? কখন দেখা দেবে এলায়িতকুন্তল ঔদার্য্যের বাদলরাণী! দেশে নামবে মহত্ত্বের বর্ষা? আসবে শোভনতার শীতল শান্তি?

যতগুলি সাহিত্য-সমাজ আজ সকলে মিলে এই পর্জ্জনের জন্যে যজ্ঞরত হবে না কি?

শোক-সংবাদ

৺হরিহর শাস্ত্রী

আজ আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে আমাদের আর একজন অকৃত্রিম সুহৃদের লোকান্তর-গমন সংবাদ প্রদান করিতে আন্তরিক বেদনা অনুভব করিতেছি। হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় "ভারতবর্ষে"র বিশিষ্ট লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই সে দিনও তিনি "ভারতবর্ষ" কার্য্যালয়ে আসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আমাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার দেহে পীড়ার কোন লক্ষণ দেখিতে পাই নাই। তখন আমরা ভাবিতে পারি নাই যে তাঁহার শেষ দিন এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সেই জন্য যখন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আসিল তখন তাহা অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বলিয়াই আমাদের বোধ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়স বেশী হয় নাই—মাত্র ৪২ বৎসর বয়সেই তিনি ইহজগতের দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া গেলেন। কিন্তু এত অল্প বয়সেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শোকের আরও গুরুতর কারণ এই যে, তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়স্কা জননী এখনও বর্ত্তমান।

শাস্ত্রী মহাশয় 'ভারতবর্ষে' যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষে'র পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সেই সকল রচনা যেমন মৌলিক তথ্যপূর্ণ, তদ্রূপ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ও যুক্তিমূলক। তদ্ব্যতীত তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনা একাধারে সরল, ভাব-মধুর ও ওজস্বিনী। সংস্কৃত ভাষায় তিনি "তর্ক-সংগ্রহ" ও তাহার টীকা "দীপিকার" টিপ্পনী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু বিধাতা তাঁহার সে সাধ পূর্ণ করিলেন না—অকালেই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। কাশী সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষার পাঠ্য "ন্যায়-সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী"র শব্দখণ্ডেরও তিনি এক টীকা প্রকাশ করিয়াছেন। ন্যায়-শাস্ত্রের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ "ন্যায় লীলাবতী" তাঁহার টিকা-টিপ্পনী সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছিল; কিন্তু গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয়তম অন্তিম ছাত্র। মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট তিনি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুর ষ্টেট, কলিকাতা সংস্কৃত এ্যাসোসিয়েসন প্রভৃতি শিক্ষা-কেন্দ্রে নানা বিষয়ে সংস্কৃত পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষায় তিনি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত "প্রবন্ধ পঞ্চক" হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ বিভাগের অন্যতম পাঠ্য-গ্রন্থ। প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথির পাঠোদ্ধারে তাঁহার

বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যাইত। বৃহত্তর বঙ্গের প্রবাসী বাঙ্গালীর অতীত গৌরবময় কীর্ত্তি-কাহিনীর উদ্ধারে তিনি বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, এবং এ সম্বন্ধে গবেষণা মূলক কয়েকটি প্রবন্ধও তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়স্কা জননী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব, জানি না। তাঁহাদের এই শোক সান্ত্বনাতীত। আমরাও তাঁহাদের অশ্রুজলের সহিত আমাদের অশ্রু মিশাইয়া শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ভগবান তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ-সাধন করুন।

৺সতীশচন্দ্র রায়

'পদকল্পতরু'র সম্পাদক, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে নিজ বাটীতে অবস্থিতি কালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। সন ১২৭৩ সালের ১লা কার্ত্তিক ধামগড়ের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে কিছুদিন সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। পরে তিনি অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আজীবন সাহিত্য সেবাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অতি বিরল। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য বিশেষ করিয়া তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় ছিল। তাহার ফল অমর গ্রন্থ—'পদকল্প-তরু'। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদন ব্যতীত তিনি কালিদাসের মেঘদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও কালুদত্ত প্রণীত রসমঞ্জরীর সুললিত পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানি প্রামাণ্য সংগ্রহ পুস্তক। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। সংস্কৃতে যেমন তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, হিন্দী সাহিত্যেও তদ্রূপ গভীর জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তিনি ভবানন্দ বিরচিত "হরিবংশ" নামক প্রাচীন কাব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ সত্ত্বেও একমাত্র "পদকল্প-তরু"ই বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে চির-অমর করিয়া রাখিবে। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

কুমারী পুষ্পরাণী

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে কুমারী পুষ্পরাণীর অকালে পরলোক গমনের জন্য শোক-প্রকাশ করিতেছি। পুষ্পরাণীর বয়স সবে ষোল বৎসর হইয়াছিল; তাহার পিতা শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মাতামহ

কুমারী পুষ্পরাণী

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বিগত ৪ঠা জুন এই নবীন বয়সেই পুষ্পরাণী চলিয়া গিয়াছে। পুষ্পরাণী এই অল্প বয়সেই অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিল। সে রেডিয়োতে প্রায়ই গান গাহিত, সকলেই তাহার গানের প্রশংসা করিতেন। প্রায়ই সে কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে যাইয়া রোগীদিগের মধ্যে মিষ্টান্ন ও ফল বিতরণ করিত এবং গান গাহিয়া তাহাদের পরিতৃপ্ত করিত। আমরা তাহার বিয়োগ-সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনগণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

সাময়িকী

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী—

৭ই জুলাই; তখনও রাত্রির শেষ তারা অদৃশ্য হয় নাই, তখনও প্রভাতের প্রথম রবি-রশ্মিরেখা দেখা দেয় নাই, কারাগারের লৌহদ্বারে করাঘাত হইল। ফাঁসীর আয়োজন প্রস্তুত। বন্দীকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

বন্দী প্রস্তুত হইয়াই ছিল। প্রতিদিনের মত আজও সে প্রভাতের স্নান সমাপন করিল। তারপর প্রফুল্ল-চিত্তে ফাঁসীর মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল। রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষ-গুলির মধ্য হইতে প্রভাত-বিহঙ্গমের নান্দী-পাঠের মত ধ্বনি জাগিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্।

মঞ্চে আরোহণ করিয়া বন্দী স্বহস্তে ফাঁসীর রজ্জু আপনার গলায় পরিল। শুধু একবার জননীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। শেষ-বাণী হৃদয় হইতে বাহির হইল, মাগো ক্ষমা করো, যদি তোমাকে কোনও কষ্ট দিয়ে থাকি।

পূর্ব্ব দিক-চক্রবালে যখন সেদিনকার সূর্য্য সমুদিত হইল, তখন দীনেশগুপ্তের প্রাণ-হীন দেহ ফাঁসীর রজ্জুতে ঝুলিতেছিল।

দীনেশ গুপ্তের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়া তাহার মাতা অবশেষে সম্রাটের দয়ার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সে আবেদন সম্রাটের নিকট পৌঁছাইতে দেওয়া হয় নাই।

কিন্তু যে হাসিয়া মরিতে পারিল, তাহার জন্য শোক-প্রকাশ করা আমাদের কি প্রয়োজন?

'আজ তবে যাই'—

মৃত্যুর অপেক্ষায় আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে দীনেশগুপ্ত দুইখানি চিঠি লেখেন, একখানি তাঁহার দিদিকে, আর একখানি তাঁহার জননীকে। বিংশ-শতাব্দীর বাঙ্গালী যুবকের চিত্ত-ধর্ম্মের পরিচায়ক-স্বরূপ এই দুইখানি চিঠি হয়ত এই জাতির অনাগত ঐতিহাসিকের নিকট একদিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইতে পারে। এখানে সেই দুইখানি চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল,—

(১)

মা, যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবুও তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমি হয়ত ভাবিতেছ ভগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থনা করিলাম তবুও তিনি শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুক ভাঙ্গা আর্ত্তনাদ তাঁহার কাণে পৌঁছায় না। ভগবান কি, আমি জানি না, তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও এ কথাটা বুঝি, তাঁহার সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। তাঁর বিচার-ঘরের দ্বার চিরকাল খোলা, নিত্যই তাঁর বিচার চলিতেছে। তাঁর বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া?

মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজু বুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দুদিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য? যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল, মৃত্যু মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে।

আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

তোমার 'নসু' (দীনেশ গুপ্ত)

(২)

মণিদি,

আজ পত্র পেলাম।

ভগবানের আশীষ যারা পায়, অশেষ দুঃখ জোটে

তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কত জনের হয় জানি না, কিন্তু যার হয় তার জীবন পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভগবান যাকে আপন কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ সম্পদ সব কিছু দেন ধূলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখিরী, রিক্ত কাঙাল। তিনি যাকে বরণ করেন, মরণ-মালা তারই গলায় পরিয়ে দেন।

সে মালা কি সহজ ?

"এতো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।"

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হ'তে পারে, কিন্তু দুঃখ পাওয়া তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা বইতে পারে ক'জন ? শক্তির উৎস তিনি।

যাকে তিনি তাঁর কাজের ভার দেন, সে ভার বহন করবার শক্তিও তাকে অযাচিত ভাবেই দান করেন। নইলে সাধ্য কি তার যে সে সে-গুরুভার এক মুহূর্ত্তও সহ্য করে ?

যার প্রাণ আছে, শ্রেয়ঃকে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা, সে কি কখনও তাঁর মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে ? কী শক্তি আছে সংসারের এ মিথ্যা মোহের যে তাকে আটকে রাখবে ?

তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না।

"শুধু জানি—যে,
শুনেছে কাণে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

আজ তবে যাই দিদি! হয় ত এই-ই আমার শেষ প্রণাম জানাচ্ছি—

স্নেহের দীনেশ

নূতন বড়লাটের সদিচ্ছা—

গত ২৭শে জুন সিমলার সিসিল হোটেলে ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। লর্ড উইলিংডন বহু দিনের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ; এবং একজন অভিজ্ঞ বৃটীশ রাজনৈতিকের কথার বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্য যতখানি থাকিতে পারে, লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতায় তাহা বিশেষ ভাবেই বিদ্যমান। তাঁহার বক্তৃতা-পাঠে ভারত সরকারের শান্তি-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ করা কাহারও উচিত নয়। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "অনেকে বলেন যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি শুধু সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি মাত্র, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে ইহা শুধু সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি নয়, ইহাই শান্তি-স্থাপনা।" সুখের বিষয় যে লর্ড উইলিংডন বিশ্বাস করেন যে "মহাত্মা গান্ধী সন্ধির সর্ত্ত-পালনে একান্ত নিষ্ঠাশীল।" তবে বড়লাটের বক্তৃতার একটী কথাতে আমাদের কাহারও কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন সন্ধির সর্ত্ত পালনে মিঃ গান্ধী "তাঁহারই ন্যায় সমান" "equally" নিষ্ঠাশীল। মহাত্মা গান্ধীকে 'তাঁহার ন্যায় সমান' নিষ্ঠাশীল দেখার অপেক্ষা, আমাদের অনেকে হয়ত তাঁহাকে অথবা তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে মহাত্মা 'গান্ধীর ন্যায় সমান' নিষ্ঠাশীল দেখিতে চাহিবেন।

শ্রীযুত প্যাটেলের অভিমত—

সকলের দৃষ্টি এখন সম্মুখের গোলটেবিল বৈঠকের দিকে রহিয়াছে। কিন্তু চার্চ্চিল-প্রমুখ বিলাতী রক্ষণশীল নেতাদের সাময়িক ও অসাময়িক চীৎকার-ধ্বনির মধ্য হইতে বৃটিশ-সরকারের এক শ্রেণীর লোকের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়া উঠে ; তাহাতে মনে হয় গোলটেবিল বৈঠক শেষকালে হয়ত ভাঙ্গিয়াই যাইবে। লণ্ডনে ভারত জাতীয় কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে শ্রীযুত প্যাটেল স্পষ্টাক্ষরে যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, জাতীয়তাবাদী প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহাই অন্তরের কথা। তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের করদাতা জনসাধারণের হাত হইতে ভারতীয় করদাতা জনসাধারণের হাতে ভারতবর্ষ-শাসনের ক্ষমতা

না দিলে, এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যদি মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে যোগদান করেন এবং এমন কি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পূর্ণ অধিকার লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলেও দেশবাসীকে তাহা গ্রহণ করাইতে, তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। ভারতের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে না চাহিয়া বিলাতের কয়েকজন রক্ষণশীলদলের নেতা চাহিতেছেন যে, কংগ্রেস পূর্ব্বাহ্নেই বৃটিশ-স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য চুক্তি-বদ্ধ হউক। ইহাই যদি সরকারের মনোভাব হয়, তাহা হইলে গান্ধী-আরউইন চুক্তি-পত্র শুধু এক টুকরো শাদা কাগজে পরিণত হইবে এবং তাহার সমস্ত দায়িত্ব পড়িবে ইংলণ্ডের উপর।"

গোলটেবিল বৈঠকের কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সেপ্টেম্বর মাসের কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া যাওয়া মানে ভারতবর্ষে বৃটিশ-বাণিজ্যের চিরকালের মত উচ্ছেদ এবং আর কোনও দিন ইহার পর আশা করা যাইতে পারে না যে ভারতবর্ষ কোনও দিন ইংলণ্ডের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতে চাহিবে।"

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সভ্যরা এ কথা হয় ত এখন স্বীকার করিতে না পারেন, কিন্তু যে-সমস্ত ব্যবসায়ীর অর্থ-শক্তিতে ইংলণ্ড আজও জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তির মর্য্যাদা ভোগ করিতেছে, তাঁহারা হয় ত শ্রীযুত প্যাটেলের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন এবং আশা করা যায় সামনের গোলটেবিল বৈঠকে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে এই বিলাতী ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভাব সব চেয়ে বেশী কাজ করিবে।

রেল-শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা

রেল-বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচের জন্য রেল-বোর্ড সনাতন সরকারী নীতি গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী প্রকাশ যে সত্তর হাজার রেলওয়ে শ্রমিকের চাকরী যাইবে। এই সংবাদে ভারতময় রেল-শ্রমিক মহলে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে এবং ইহা যে স্বাভাবিক তাহা বলাই বাহুল্য। রেল-বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের কথা অবগত হইয়া রেল কর্ম্মচারী সমিতি সারা ভারতময় রেল ধর্ম্মঘটের সঙ্কল্প করে। কিন্তু কিছু আশার বিষয় যে রেল কর্ম্মচারীর এই সঙ্কল্পে রেল-বোর্ড জানাইয়াছেন যে, বিষয়টী তাঁহারা পুনর্ব্বিচার করিবেন। শ্রমিকদের পক্ষ হইতে দেওয়ান চমনলাল এই ভয়াবহ ঘটনা নিবারণকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সমেত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যয়-সঙ্কোচের নামে ৩৫ হাজার রেল কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহাতে সমস্ত রেল-বিভাগে ১ কোটী ৩৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বাঁচান হইয়াছে। এখন আরও ৩৫ হাজার লোককে বরখাস্ত করা হইবে। কিন্তু শ্রমিকদের বেতন না কমাইয়া অথবা তাহাদের বরখাস্ত না করিয়া একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলপথের অপ্রয়োজনীয় মোটা মাহিনাভোগী অট্টালিকাবাসী কর্ম্মচারীদের বরখাস্ত করিলে, অন্ততঃ দশলক্ষ টাকা বাঁচিবে। অন্যান্য বিভাগে অন্ততঃ দুইশত উচ্চবেতনভোগী কর্ম্মচারীর মাহিনা অর্দ্ধেক কমাইয়া দিলে, সেখানে আরও দশ লক্ষ টাকা বাঁচিবে। * * * *"

৭০ হাজার বেকার শ্রমিকের সৃষ্টি করিয়া রেল-ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনাকে আগাইয়া আনিবার পূর্ব্বে, আশা করা যায়, রেল-বোর্ড এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, রেলের ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি আপাততঃ, বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য, কার্য্য বন্ধ রাখিতেছেন।

কংগ্রেসের দলাদলি—

বাঙ্গলার নেতৃ নামধেয় ব্যক্তিরা দলাদলির মোহে এতটাই আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবাসী এবং ভারতপ্রবাসী বিদেশীয়দিগের চক্ষে বাঙ্গলা দেশকে হেয়, অশ্রদ্ধেয় ও অপদস্থ হইতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাধান্য-লাভের জন্য বিবাদের ঘরাঘরি কোনরূপ মীমাংসা সম্ভবপর হইল না। সেইজন্য বাঙ্গলাদেশের বাহির হইতে মধ্যস্থ আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ এম, এস, এ্যনে মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৪ই জুলাই প্রাতঃকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন এবং সেই দিনই বেলা দুই ঘটিকার সময় বিচার আরম্ভ করিবেন।

বিচারে যাহাতে অযথা বিলম্ব না হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি বিবদমান উভয় পক্ষের উদ্দেশে কতকগুলি উপদেশের প্রচার করিয়াছেন। কোন্ স্থানে বিচার হইবে তাহা পরে নির্দ্দেশিত হইবে। তৎপূর্ব্বে উভয় পক্ষকেই সাক্ষী-সাবুদ, প্রমাণ এবং নিজ নিজ পক্ষীয় অভিযোগের সমর্থনসূচক দলিলপত্রাদি লইয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে; এবং ১৪ই জুলাই তারিখে বা তৎপূর্ব্বে সেই সমস্ত অভিযোগ, আবেদন, দলিল প্রভৃতি সালিস আদালতে ফাইল করিতে হইবে। ১৪ই জুলাই তারিখের অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর কোন অভিযোগ গৃহীত হইবে না; এবং এক পক্ষের অভিযোগের উত্তরে অপর পক্ষের যাহা বক্তব্য থাকিবে, ১৫ই জুলাই তারিখের বেলা বারোটার মধ্যে তাহা লিখিয়া সালিস-আদালতে দাখিল করিতে হইবে; তৎপরে আর কোন বক্তব্য গৃহীত হইবে না। বাঙ্গলার ঘরোয়া বিবাদের মীমাংসার জন্য ভিন্ন প্রদেশ হইতে মধ্যস্থ আনিয়া সালিস আদালতের ব্যবস্থা হইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি আমরা সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। উভয় পক্ষেই জেদ যেরূপ প্রবল তাহাতে মনে হয়, সালিস আদালতের বিচারে যে পক্ষের পরাজয় ঘটিবে, সেই পক্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে সম্মত হইবেন কি না সে পক্ষে সন্দেহ আছে। যদি সালিস আদালতের সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়, তাহা হইলে আপীল চলিবে কি না তাহাও বলা যায় না; কারণ, কংগ্রেস এখনও সুপ্রীম কোর্ট বা প্রিভি-কাউন্সিল গঠন করেন নাই ত! সে যাহা হউক, আদালতের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, এই দলাদলির ব্যাপারটা অধুনা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তুচ্ছ প্রাধান্য-লাভের লোভে ছোরা, লাঠি অবাধে চলিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া সমগ্র ব্যাপারটার উপর জনসাধারণের ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছে। এখন যে কোন রকমেই হউক এই অপ্রীতিকর বিষয়ের একটা যবনিকাপাত হইলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা যায়।

বাঙ্গলাদেশের আর্থিক দুর্গতি—

বাঙ্গলাদেশের আর্থিক দুর্গতি সনাতন ও চিরন্তন সত্য হইলেও বঙ্গদেশ এবার বোধ হয় দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকে হাহাকার। এই কয় মাসের মধ্যে কত আত্মহত্যা, কত আত্মহত্যার চেষ্টা, কত স্ত্রী-পুত্রাদি বিক্রয় ও তাহার চেষ্টার সংবাদ প্রকাশিত হইল, এবং এখনও হইতেছে। এই সেদিন এক বেকার ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কৃতবিদ্য যুবক পুত্রহত্যা, এবং স্ত্রী-হত্যার চেষ্টার অভিযোগ আদালতে রুজু হইয়াছে। ভূমিলক্ষ্মীর শস্য বিতরণে কৃপণতা নাই; বঙ্গলক্ষ্মীর অন্ন-ভাণ্ডারে ধান্য মজুত; তথাপি লোকে অন্ন সংস্থান করিতে না পারিয়া ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করিতেছে—সভ্য-জগতের এ এক অদ্ভুত জটিল রহস্য। যাহারা ধান্যের চাষ করে, তাহাদের গোলাভরা ধান; কিন্তু বাজারে ধান-চাউলের ক্রেতা নাই। ধানের বাজার-দর নাই; কেহ ধান বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলে মণপ্রতি এক টাকা হইতে দুই টাকার অধিক মূল্য পাওয়া যায় না। তাহার উপর দেশে টাকা নাই। চাউল ও পাট রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে যে টাকা পাওয়া যাইত, তাহাতে বাঙ্গলা দেশের ঘর-খরচ চলিত। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, বিদেশীরা আর চাউল ও পাট কিনিতেছে না। গোধুম বাঙ্গলা-দেশের প্রধান উৎপন্ন শস্য না হইলেও উত্তর ভারতের নানা স্থানে উৎপন্ন গোধুমের কিয়দংশ বাঙ্গলাদেশের বন্দর দিয়া বিদেশে চালান হইত। মধ্যে মধ্যে শুনা যায়, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, রাশিয়ায়, ইটালীতে এবং অন্যান্য দেশে ধান ও গম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় over-production হইয়া গিয়াছে; মূল্যও কমিয়া গিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর বাজারে বাঙ্গলার ধান ও উত্তর ভারতের গোধুমের চাহিদা নাই। কাজেই, অর্থের আমদানী নাই বলিয়া ঘরে ধান মজুত থাকিতেও লোকে অনাহারে মরিতেছে, আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে, প্রিয়জনের বুকে ছুরিকাঘাত করিতেছে। সমাজ, রাষ্ট্র, অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি পরস্পর আপেক্ষিক বিষয়ের সমবায়ে এই জটিল অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, চট্টগ্রামের কয়েকটি চাউল ও কাঠের আড়তে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া পাঁচ লক্ষ টাকার চাউল ও কাষ্ঠ পুড়িয়া গিয়াছে। পাঁচলাখ টাকার চাউল পুড়িয়া গেলে চাউলের বাজারের অবস্থার কোন বিপর্য্যয় ঘটিবে কি না তাহাও চিন্তার কথা।

অর্থ-সঙ্কটের প্রতিকার-চেষ্টা—

দেশব্যাপী এই আর্থিক সঙ্কটের প্রতিকারের চেষ্টা যে না হইতেছে তাহা নহে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের এই দুর্দ্দিনে বিলাতী গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টকে অর্থ-সাহায্য করিবেন। এই ঘোষণার ফলে ভারতে ও বিলাতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিলাতের রাজনীতিকরা এই ঘোষণা-বাণী কি ভাবে গ্রহণ করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; সেইজন্য সেখানে এই ব্যাপার লইয়া বিলক্ষণ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ভারতের অনেক স্থলেও প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ের ঘোষণা লইয়া আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। বোম্বাইয়ের দেশীয় বণিক সমিতির কর্ম্মনির্ব্বাহক কমিটি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, Any steps they may have taken for remedying the present extremely unsatisfactory condition of India's finances based on sound principles and in the interests of India and for increasing the resources of purchasing power of the people would be welcome. অর্থাৎ ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা অতীব মন্দ। এরূপ অবস্থার প্রতিকারের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হইবে, তাহা যদি সুবিবেচিত পদ্ধতির ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তাহা যদি ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য হয় এবং তাহাতে যদি ভারতবাসীর ক্রয়-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, তবে সেই উপায় সাদরে গৃহীত হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, মহামন্ত্রী মহাশয় অর্থ-সাহায্য করিবেন বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও দেশবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হইতে পারিতেছেন না—এমন লোভনীয় প্রস্তাবও তাঁহারা সতর্ক ভাবে বিচার পূর্ব্বক তবে গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারেন। বোম্বাই বণিক সমিতির বিশ্বাস, বিলাত ও ভারতের মধ্যে বিনিময়ের যে হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে উহা অস্বাভাবিক, এবং ইহাই ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার কারণ। মূল কারণটি প্রথমে দূর না করিলে কেবল অর্থ-সাহায্যে ভারতের দুঃখ দূর হইবে না। আসল কথা, পৃথিবীর বাজারে ভারতের আর্থিক 'ক্রেডিট' (প্রতিপত্তি) হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তাহা বর্ত্তমান বিনিময়-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল। কমিটির মতে, সরকার কেবল বাহ্য লক্ষণের চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন—রোগের মূল কারণটিকে স্পর্শও করিতেছেন না; সুতরাং প্রতিকার যাহা হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। ফল কথা, প্রধান মন্ত্রীর অর্থ সাহায্যের প্রস্তাবে ভারতবর্ষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছে না।

সম্মিলিত রাষ্ট্র-গঠন—

ভারতে যে সম্মিলিত রাষ্ট্র-গঠনের কল্পনা (federation plan) হইয়াছে, যাহা আগামী গোলটেবিল বৈঠকের প্রধান আলোচনার বিষয়। বিগত গোল টেবিল বৈঠকে স্থির হইয়াছিল যে, ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ ভারতের এই সম্মিলিত রাষ্ট্রে যোগদান করিবেন। তখন বিলাতে যে সকল দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া আসেন। গোল টেবিলের প্রতিনিধিরা ভারতে ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পরে পাতিয়ালার মহারাজা কিছু উল্টা সুর ধরেন। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির তরফ হইতে স্বয়ং স্বতন্ত্র একটি স্কীম খাড়া করেন। সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে মনে করিয়া পাতিয়ালার প্রস্তাবে অনেকে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। পাতিয়ালার হঠাৎ এরূপ বেসুরা উক্তির কারণ কি, ইহা লইয়া অনেকে জল্পনা করিতে থাকেন। অনেকে সন্দেহ করেন যে, পাতিয়ালার উল্টা স্কীমটি পাতিয়ালার নিজ মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে—পাতিয়ালাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সিমলার কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী গোলটেবিল পণ্ড করিবার জন্য এই চাল চালিতেছেন। এই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষটি কে, তাহা স্থির হয় নাই। এদিকে পাতিয়ালার প্রস্তাব লইয়া দেশীয় রাজ্যসমূহে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সম্প্রতি বোম্বাই নগরে রাজন্য-বৃন্দের একটি পরামর্শ-বৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতে, ভারতের সম্মিলিত রাষ্ট্রে দেশীয় রাজন্যবর্গের যোগদান সম্বন্ধে মূল প্রস্তাবটির (Sankey Scheme) আলোচনা হয়। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজ্যের মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সুদীর্ঘ প্রশ্নাবলীর একটি তালিকা রচনা করিয়া গত মে মাসে ষাটটি রাজ্যে প্রেরিত

হইয়াছিল। তন্মধ্যে পঞ্চাশটি রাজ্য স্যাঙ্কি স্কীমের অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বোম্বায়ের পরামর্শ-সভায় এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর এবং পাতিয়ালার প্রস্তাবের আলোচনা হয়। এই সভায় পাতিয়ালার মহারাজা বলেন, তিনি ভারতে সম্মিলিত রাষ্ট্র-গঠনের বিরোধী নহেন; কিন্তু তিনি স্যাঙ্কি স্কীমের অনুমোদন করেন না। বাহাওয়ালপুরের মিঃ নবী বক্স পাতিয়ালার স্কীমের অনুমোদন করেন। ঢোলপুরের মহারাজা বলেন, ভারতীয় সম্মিলিত রাষ্ট্র-গঠনের পূর্ব্ববর্ত্তী পন্থা হিসাবে দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টনী ঢোলপুরের প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। অপর সকলে স্যাঙ্কি স্কীমের সমর্থন করেন। স্যাঙ্কি স্কীমের প্রতি অধিকাংশ রাজ্য অনুরাগ প্রকাশ করায় পাতিয়ালা তাঁহার প্রস্তাব লইয়া আর বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন নাই,—বলিয়াছেন, he would keep an open mind.

কলেজষ্ট্রীটের হত্যাকাণ্ড—

গত ৭ই মে তারিখে বেলা সওয়া এগারটার সময় ১৫নং কলেজস্কোয়ারে সেন ব্রাদার্সের পুস্তকের দোকানের স্বত্বাধিকারী ভোলানাথ সেন এবং তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারী হরিদাস সরকার ও সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এ শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ পাঠকবর্গ হয় ত অবগত আছেন। সংবাদ-পত্র ও পুস্তক-প্রকাশক হিসাবে এ দুঃখ আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত। বিংশশতাব্দীতে জ্ঞান-প্রচার ও বাণী-সাধনায় সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যে এইরূপ ভয়াবহ ভবিতব্যতা লেখা থাকিতে পারে—তাহা বোধহয় শুধু অধুনা ভারতবর্ষেই দেখা যায়। এই হত্যাকাণ্ডের সংশ্রবে আবদুল্লা খাঁ ও আমীর আমাদ নামক দুইটি যুবক অভিযুক্ত হইয়াছে। হাইকোর্টের সেসনে তাহাদের বিচার চলিতেছে। গত ৬ই জুলাই সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি লর্ট উইলিয়াম্‌সের এজলাসে মোকদ্দমা উত্থাপিত হইলে আসামীদ্বয় নিজেদের নিরপরাধ বলিয়া প্রকাশ করে। আসামীরা নিতান্ত তরুণ যুবক; আবদুল্লার বয়স ২২ ও আমীর আমাদের বয়স ২৬ বৎসর মাত্র। আবদুল্লা পঞ্জাবের অধিবাসী—লাহোর হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গারিস গ্রামে তাহার বাড়ী। মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে সরকার পক্ষের কাউন্সেল মিঃ এ, কে, বসু ঘটনার বর্ণনা করেন। মিঃ বসু বলেন, ঘটনার দিন ৭ই মে বেলা সওয়া এগারটার সময়—দোকান তখন মাত্র পনেরো মিনিট হইল খোলা হইয়াছে—ভোলানাথবাবু দরজার নিকটে একখানি চেয়ারে এবং কর্ম্মচারীদ্বয় একটু তফাতে অপর দুইখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আসামীরা দোকানে প্রবেশ করে। তাহাদিগকে খরিদদার মনে করিয়া দোকানের লোকরা যথারীতি তাহাদের অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু দোকানে প্রবেশ করিবামাত্র প্রথম আসামী "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিয়া ভোলানাথ বাবুকে ছুরিকাঘাত করে। আর দ্বিতীয় আসামী কর্ম্মচারী-দ্বয়কে আক্রমণ করে। ঠিক এই সময়ে পতিত বাবু নামক দোকানের অপর একজন কর্ম্মচারী দোকানে প্রবেশ করিয়া আসামীদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কাণ্ড দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলে আসামীরা দৌড়িয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া ছুটিতে থাকে, এবং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট দিয়া কলেজ ষ্ট্রীট পার হইয়া মার্কেটে প্রবেশ করে। একজন পুলিস সবইন্সপেক্টর এই সময়ে একখানি বাস হইতে আসামীদের দৌড়াইতে দেখিয়া নামিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, এবং দ্বিতীয় আসামী বাজার হইতে বাহির হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। অপর আসামীকে ১০৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোডের মুসাফিরখানায় তাহাদের বাসায় গ্রেপ্তার করা হয়। এই বাসায় খানাতল্লাস করিয়া ট্রাঙ্ক বা বাক্সের মধ্যে "প্রাচীন কাহিনী" নামক একখানি ইতিহাস গ্রন্থের কিয়দংশ এবং একখানি ছবি পাওয়া যায়। ছবিখানি নাকি মহম্মদের। আহত তিন ব্যক্তিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। হাসপাতালে প্রবেশের দশ মিনিটের মধ্যে হরিদাসের এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভোলানাথের মৃত্যু হয়। আর সতীশ অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১১ই মে তারিখে কলিকাতার পুলিশ গারিস গ্রামে গিয়া আবদুল্লার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া "সর্দ্দা বিলের"

অগ্নি-সৎকার নামক একখানি কাগজ, ইলমুদ্দিনের ফাঁসীর একখানি চিত্র ("রঙ্গিলা রসুল" নামক গ্রন্থের রচয়িতা রায় পালকে হত্যা করার অপরাধে এই ইলমুদ্দিনের ফাঁসী হইয়াছিল। ইলমুদ্দিনের ছবিতে পরীরা তাহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল), রাজগুরু, ভগৎ সিং ও শুকদেবের ফাঁসীর চিত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়; এবং আবদুল্লার বাসা হইতে একখানি পুস্তিকায় রাজগুরু, ভগৎ সিং ও শুকদেবের ফটো,—পুস্তিকাখানির নাম "ফাঁসীদের পূজারী" —ইলমুদ্দিনের একখানি ছবি, এবং ভগৎ সিং প্রভৃতির যেখানে অগ্নি-সৎকার হইয়াছিল, সেই স্থানের ফটো প্রভৃতি পাওয়া যায়। মিঃ বসুর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, এই হত্যা-কাণ্ডের ধ্বনিকান্তরালে অনেক জটিল রহস্য নিহিত আছে। মিঃ বসুর বর্ণনা এমন স্পষ্ট ও নিখুঁত-সুন্দর যে, মনে হয়, বায়োস্কোপের চিত্রের ন্যায় সমগ্র ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটিয়া যাইতেছে। সেসন আদালতে এখনও বিচার চলিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সঙ্কট—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সঙ্কট আর কিছুতেই ঘুচিল না! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সেসনের আয়-ব্যয়ের খসড়া তালিকায় দেখা যাইতেছে বেশ মোটা রকম টাকা ঘাট্‌তি পড়িবে! সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, দার্জিলিঙ্গে সম্প্রতি সরকারের প্রতিনিধিগণের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের যে পরামর্শ হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে স্থির হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে যে টাকা ঘাট্‌তি পড়িবে, সরকার তাহা পূরণ করিয়া দিবেন কিম্বা একটা মোটা টাকা সাহায্য করিবেন। সেনেট সভায় এই সুসংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য ডাক্তার বি, সি, রায় শিক্ষা-মন্ত্রীর নিকট হইতে একটা স্পষ্ট ও নিশ্চিত নির্দ্দেশ চাহেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী সেরূপ কোন নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সরকারকে এখন ব্যয়-সঙ্কোচে মনোনিবেশ করিতে হইতেছে। এবং বরাবর দেখিয়া আসা যাইতেছে যে, সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচের প্রয়োজন হইলেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি-বিভাগের ব্যয়-সঙ্কোচের কথা সর্ব্বাগ্রে সরকারের মনে পড়ে। এরূপ অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন কি না সে সম্বন্ধে যদি কোন নিশ্চিত নির্দ্দেশ দিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে দোষ দিই কেমন করিয়া? আমাদের মনে হয় আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেরই কর্ত্তব্য। এ দেশে যে ভাবে শিক্ষা বিস্তার করা হইতেছে, তাহাতে বলিতে হয়, বিদ্যাদান ব্যাপারটা আগাগোড়া নিছক ব্যবসাদারী। কোন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হইলে তবে তাহাতে লাভ হয়; আর পরিচালনের দোষেই ব্যবসায়ে লোকসান হইয়া থাকে। "ফেল কড়ি মাখ তেল" ইহাই, কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—সকলেরই একমাত্র মূলমন্ত্র। শিক্ষা যখন ক্রয় বিক্রয়-বাণিজ্যের ব্যাপার, তখন তাহা যে লাভ-লোকসানেরও ব্যাপার তাহাতেও সন্দেহ নাই। বোম্বাইবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে সবিশেষ দক্ষ; তাই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়-বাণিজ্যে দেড় লক্ষ টাকা লাভ (উদ্বৃত্ত) হইয়াছে। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়-বুদ্ধি তেমন প্রখর নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ বৎসরের পর বৎসর ঘাট্‌তি চলিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত একজন অর্থনীতিবিদ বিশ্বপণ্ডিতকে বোম্বাইয়ে পাঠাইয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের trade secretটুকু আয়ত্ত করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হস্তে retrenchment কুঠারের অবাধ ব্যবহার করা। কিন্তু, তাহার জন্য পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের মর্য্যাদা ও কার্য্য-কারিতা ক্ষুণ্ণ করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হইবে না। তবেই যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সঙ্কট কোন দিন ঘুচিতে পারে; নচেৎ নহে।

অধ্যাপক রমণ—

সম্প্রতি কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন অধ্যাপক রমণকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছেন। কাজটি কলিকাতা কর্পোরেশনের উপযুক্তই হইয়াছে। এই অভিনন্দনের

উত্তরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণও কলিকাতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কলিকাতা কেবল ভারত নহে, সমগ্র এশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। এই কলিকাতা সহরের স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর দি কাল্‌টিভেসন অব্ সায়েন্সের বিজ্ঞানাগারে গবেষণা করিয়া ডাক্তার সি, ভি, রমণ বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। এই জন্য ডাক্তার রমণ ডাক্তার সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক রমণ কলিকাতাকে যে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন, তাহা তাঁহার উদারতার পরিচায়ক। তাঁহার এই প্রশংসায় কলিকাতাবাসী আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের এই প্রশংসা একটু অতিরঞ্জন হয় নাই কি? কলিকাতায় নোবেল প্রাইজ হোল্ডার আছেন, লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো আছেন, কলিকাতাবাসী বৈজ্ঞানিকের নামে বৈজ্ঞানিক 'ল' প্রচলিত হইয়াছে—এ সকলই সত্য কথা, এবং এজন্য কলিকাতাবাসীরা গর্ব্বও করিতে পারে; তথাপি আমাদের মনে হয়, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে একমাত্র কলিকাতাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বলিলে অন্যান্য দেশের প্রতি কিছু অবিচারই করা হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

গত আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে' শ্রীমান শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দুঃস্বপ্ন' নামে যে-গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একটি বিদেশী গল্পের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। গতবারে সে কথা ভ্রমক্রমে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের জানানো হয় নাই।

নবপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মীরাবাই' (শিশুপাঠ্য) শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া প্রণীত, দাম চার আনা।

'জঙ্গলে' (শিশুপাঠ্য) শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত বি-এ; দাম দশ আনা।

'আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ' (শিশুপাঠ্য) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী; দাম ছয় আনা।

'তীর্থভ্রমণে—কাশী'; শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ; দাম আট আনা।

'দেশবিদেশের গল্প' (শিশুপাঠ্য); শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতা; মূল্য প্রতিখানা দশ আনা।

'সাম্যবাদ' (Marxian Socialism); সোমনাথ লাহিড়ী প্রণীত; দাম বারো আনা।

সাবিত্রী' (পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক); মন্মথ রায় এম-এ প্রণীত; পাঁচসিকা।

'পত্রবিতান' (কাব্য); শ্রীভাগবতচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

'ভারত-মহিলা' (জীবন-কাহিনী); শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত; মূল্য দুই টাকা।

'শ্রীপদামৃত মাধুরী' রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত—৩৲

গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক নাটকাকারে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' (নূতন সংস্করণ)—৸৹

'মৃচ্ছ-কটিক নাটক' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা প্রণীত—১৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA,
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষের
রোবাইয়াৎ-ই
ওমর খৈয়াম
—মূল্য ৩৷৷০ টাকা—
প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদিগের অঙ্কিত, পাতায় পাতায় একবর্ণ ও বহু বর্ণ চিত্র শোভিত, প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য সুচিত্রিত ও মনোরম বাঁধা।

নূতন উপন্যাস ঃ—
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
নারী ২৷০
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
ব্রতী ২৷০

নূতন উপন্যাস ঃ—
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
পথের স্মৃতি ২৷০
শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষ জায়ার
জন্ম অপরাধী
১৷৷০ স্থলে ১৲

নূতন গল্প ঃ—
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের
বন্ধু ২৲
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
গিরিকা ১৷৷০

শ্রীশরৎ ঘোষ প্রণীত
আধুনিক সমস্যামূলক অতুলনীয় নাটক
"আভিজাত" ১৷০
সগৌরবে মিনার্ভায় অভিনীত হইতেছে

শ্রীবিধুভূষণ দে প্রণীত
শিল্পী ৷৷০
সূচী শিল্পের উৎকৃষ্ট পুস্তক, ইহাতে ফ্রক পেনি, ব্লাউজ ইত্যাদির সুন্দর ডিজাইন আছে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস এম-এপ্রণীত
বাংলার বীর
১ম ভাগ—১৲
ঐ ২য় ভাগ ১৲

শ্রীমোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর
বেদ পরিচয় ২৷৷০
বেদ কি জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পড়িতে হইবে

শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রীর
বঙ্কিম চিত্র ১৲
৺বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক সমূহের চরিত্র সমালোচনা

৺দীনবন্ধু মিত্রের
নীলদর্পণ ১৷৷০ স্থলে ৸০
সধবার একাদশী
১৷০ স্থলে ৷৷৵০

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোর
বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ২৷৷০
মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত সত্য ও চমকপ্রদ ঘটনা

শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ, প্রণীত
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ২৲
বহু চিত্র সম্বলিত

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

এইচ. বসুর সুগন্ধি দ্রব্য তৈলাদি প্রসাদন সামগ্রী সম্বন্ধে

প্রসিদ্ধ ভারতীয় জননায়কগণের অভিমত ঃ—

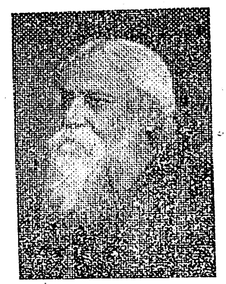

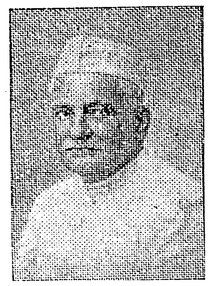

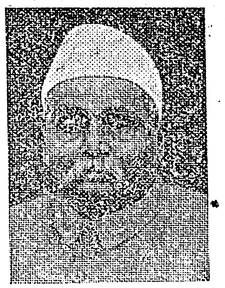

"আমার এক আত্মীয়ের বহুকাল হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যেই তাঁর মাথায় নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে..."
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মিঃ এইচ. বসুর প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্যজাত ভারতে প্রস্তুত সুগন্ধ দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ সুগন্ধির সমকক্ষ..."
—মতিলাল নেহেরু

"আমি ব্যবহার করিয়াছি মিঃ এইচ. বসুর 'কুন্তলীন' ও 'দেলখোস' বাস্তবিকই ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধি অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"
—লালা লাজপত রায়

"আমি এইচ. বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি। জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত..."
—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইচ বসুর কয়েকটী বিখ্যাত সুগন্ধি ঃ

দেলখোস, অপরাজিতা, বেলা, যুঁই, ইরাণী, বকুল, রোজ, রজনীগন্ধা, চন্দন, মিশোর, হোয়াইট রোজ, ললিতা, শেফালিকা, গন্ধরাজ

—পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ ও মূল্যতালিকা পাঠাই—

—গভর্ণমেণ্ট জ্যোতির্ব্বিদ—

ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের কোষ্ঠী প্রস্তুতকারক

পণ্ডিতবর—**শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের**

গণনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এবং গণনায় সন্তুষ্ট না হইলে পারিশ্রমিক লওয়া হয় না। কোষ্ঠী, ঠিকুজী বিচার ও প্রস্তুত হাত দেখা ও প্রশ্ন গণনা ইত্যাদি সূক্ষ্মরূপে ও সুলভে করিয়া থাকেন পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচ। শাস্ত্রে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করুন।

—অত্যাশ্চর্য্য কবচ সমূহ—

উপকার না হইলে কবচের মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। প্রত্যেক কবচের সহিত গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়

বশীকরণ কবচ—ইহা ধারণ করিলে অতি সহজে স্বকার্য্য সাধিত হয় ও অভীষ্ট জন বশীভূত হয়। পরন্তু বশীভূতজন এতই অনুগত হয় যে তাহার দ্বারা অন্যান্য কার্য্যও সাধন করা যায়—মূল্য ৮৵৹।

ধনদা কবচ—মূল্য ৮॥৹ টাকা।

বগলামুখী কবচ—মূল্য ৮৸৵৹।

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ—মূল্য ৭৸৵৹।

ভাগ্যগণনা কার্য্যালয়—১৯, গ্রে ষ্ট্রীট, শোভাবাজার। **ব্রাঞ্চ অফিস**—১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার জংসন, কলিকাতা।

মুখার্জ্জি ব্রাদার্স

ঢাকার অন্তর্গত জয়দেবপুরের (ভাওয়াল) রাজকুমারদিগের শিক্ষক
স্বর্গীয় পিতৃদেব দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত

হিষ্টিরিয়ার দৈব-কবচ

(হিষ্টিরিয়া, মৃগী, মূর্চ্ছা, মোহ, উন্মাদ রোগে অব্যর্থ) ও আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত চিত্তবিনোদ তৈল ২ আঃ ১৵৹। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে পঁচিশ লক্ষাধিক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমাদের এই দৈবকবচ ভারতের বাহিরেও প্রেরিত হইতেছে।

সত্বাধিকারী—পি, এন্, মুখার্জ্জি, বি-এ, এল্-টি
(ভা) পোষ্ট বক্স নং ২১ (ঢাকা)

গাছ ও বীজ

(আবার নূতন বীজ আসিল)

প্রতি তোলা মূল্য—ফুলকপি পাটনাই ৷৹, বেষ্ট অব্ অল ১৲ আর্লি প্যারিস ১৷৹, ইম্পিরীয়াল ২৲; বাঁধাকপি মার্কেট গার্ডনার প্রকাণ্ড ৷৹, নারিকেলি সওয়া মনে চ্যাপ্টা মাথা ৸৹, ড্রামহেড ১৲, ফ্লোরিডা হেডার ১৷৹, ওলকপি শাদা ৸৹, সবুজ ও বেগুনে ৷৹, বিলাতি পেঁয়াজ, মিষ্ট লঙ্কা টম্যাটো, ছালাদ, লিক ৷৹, চিনের শাক, টক পালং, শালগম, বীট, গাজোর, বিলাতি মূলা ।৹, কাঁথির মূলা ৵৹, প্রতি সের ৫৲; বিলাতি সিম ও মিঠা পালং ৴৹, বিলাতি মটর প্রতি সের ৪৲ টাকা। ফুলের বীজ ৫ রকম ১৲, ৮ রকম ১৷৹। আজই আমাদের বাগানে আসিয়া আবশ্যকীয় গাছ ও বীজ পছন্দ করিয়া লউন।

দি নুরজাহান নার্শারি, ২নং কাঁকুড়গাছি ফাষ্ট লেন, কলিঃ।

সৌন্দর্য্য ও সাবান

সুন্দর সুখের লাবণ্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে, মুখ ও ত্বক কোমল, শুভ্র ও মসৃন করিতে আপনাদিগকে আমাদের

'কোকোলীন' সাবান

ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। বিশুদ্ধ, অত্যুৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত। সমান ও কাছাকাছি মূল্যের বিদেশী সাবান অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

হোয়াইট রোজ (বাক্সে ৩টী) ১৲, চন্দন (বাক্সে ৩টী) ৸৵৹, বকুল (বাক্সে ৩টী) ৸৵৹
ল্যাভেণ্ডার (বাক্সে ৩টী) ৸৵৹, খস্ (বাক্সে ৩টী) ৸৵৹, যুঁই (বাক্সে ৩টী) ৸৵৹
মাস্ক (বাক্সে ৩টী) ৸৵৹, রজনীগন্ধা (বাক্সে ৩টী) ৸৵৹, গ্লিসারিণ (বাক্সে ৩টী) ॥৴৹

এইচ্ বসু, পারফিউমার—

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ও ৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(স্থাপিত—১৮৮৮)

শতকরা ১০০ জনই উপকৃত হইবেন—কেহই ব্যর্থ মনোরথ হইবেন না—শুধু কথায় নহে—কার্য্যে দেখুন—

৮১ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে—গর্ভ নিয়মিত করিবার

ইচ্ছামতি পিল

"Wife's friend"—The safe and sure way to Birth Control—গর্ভ ইচ্ছাধীন করিতে এরূপ নিশ্চিত ঔষধ আর নাই। ইহা ঋতুর সময়ে একদিন মাত্র খাইতে হয়। যে ঋতুতে খাইবেন সে মাসে গর্ভ কিছুতেই হইবে না—ইহা আমরা জোর গলায় ঢাক বাজাইয়া স্পর্দ্ধার সহিত ঘোষণা করিতেছি। ইহা প্রতি মাসে ঋতুকালীন খাইলে কোন ক্রমেই গর্ভ হইবে না। আবার শরীর বুঝিয়া ঔষধ বন্ধ করিলেই পূর্ব্ববৎ সন্তানাদি হইতে থাকিবে। ইহাতে কোনরূপ স্বাস্থ্যহানি হয় না। লক্ষ লক্ষ স্থানে পরীক্ষিত অব্যর্থ ফলপ্রদ দেবদুর্ল্লভ মহৌষধ। এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ২॥৹ আড়াই টাকা—ছয় মাসের ১৸৹ সাতসিকা।

টাইট্ ব্রেষ্ট

যুবতীর অহঙ্কার—অনমিত স্তনভার। দৃঢ় ও উন্নত বক্ষই রমণীর সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্য যাঁহাদের নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা ঋতুকালীন এই ঔষধ সাত দিন মাত্র ব্যবহার করিলে শিথিল ও পতিত বক্ষোজ ঘট-সদৃশ উন্নত স্থূল ও সুশ্রী হইয়া চির-শোভা পাইবে ইহা স্থির নিশ্চয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা মালিশ করিতে হয় না। কেবলমাত্র অঙ্গুলি দ্বারা অল্প পরিমাণে পাতলা করিয়া মাখাইয়া দিতে হয়। ইহাতে কাপড় জামা বা সেমিজে দাগ লাগে না—ঔষধ লাগাইবা মাত্রই শুকাইয়া যায়। ইহা আমাদের বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র উচ্চরবে প্রশংসিত। রমণী-বক্ষ চির-উন্নত রাখিবার মহা তেজস্কর অব্যর্থ ফলপ্রদ মহাসুগন্ধযুক্ত মহৌষধ। মাসে সাত দিনের অধিক ব্যবহার করিতে হয় না। মূল্য শিশি আড়াই টাকা। সন্তানের স্তন পান নিষিদ্ধ নহে।

রিসার্চ্চ হারবল হোম (ডি)—১২৭ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন—৮৫৩ বড় রাজার **টেলিগ্রাম**—মেক্যানিষ্টস্

ষষ্ঠ নয়—জ্ঞানবৃক্ষ

চিত্রে ও রচনায়

যৌবন পথে

বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চরবে প্রশংসিত—প্রেমিক-প্রেমিকার সেই চির আদরের গ্রন্থ—বাংলা ভাষায় প্রথম অনুপমেয়

১৩৮ খানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত হাফটোন ও ফটো চিত্র শোভিত

৩২ খানি রঙ্গীন হাফটোন চিত্রের এলবাম্ উপহার সহ

বিবাহ, ঋতু, সহবাস, গর্ভ, প্রসব ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত ও ১৩৮ খানি [illegible] চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে রমণীরা যে উপায়ে ইচ্ছামত ৫।৬ বৎসর অথবা তদোর্দ্ধ সময় অন্তর সন্তান উৎপাদন করেন—তাহা চিত্র সহ বুঝান আছে—কি উপায়ে ও কিরূপ নিয়মে গর্ভ হয়—সুস্ত্রী [illegible] হিজরা বিকলাঙ্গ সন্তান কেন হয়—গর্ভ নিয়মিত করিবার ইউরোপীয় সমাজ-গ্রাহ্য পরীক্ষিত বিজ্ঞান সম্মত সমুদয় [illegible] উপায় ও তাহার ঔষধ—স্বামী স্ত্রীর প্রিয়তম হওয়া—ইন্দ্রিয় চিকিৎসা প্রভৃতি ও ইচ্ছামত গর্ভ—ইচ্ছানুসারে পুত্র [illegible] উৎপাদন—গর্ভ নিয়মিত করিবার উপায়—গর্ভস্রাব ও মৃত-বৎসা দোষ নিবারণ—চিরবন্ধ্যা নারীর পুত্র-মুখ দর্শন [illegible] নিয়মিত করিবার যত প্রকার প্রাচীন ও আধুনিক, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম যন্ত্র, মত, পথ্য ও ঔষধ আছে তৎ সমুদয় [illegible] বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ছাপা—চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্র সহ উনত্রিশটী পরিচ্ছেদে দুই খণ্ডে ৩০০ [illegible] সমাপ্ত স্বর্ণাক্ষরে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ১৮০ সাত সিকা। যুবক-যুবতীর সেই আকাঙ্ক্ষিত যুগান্তরকারী চির আদরের [illegible]।

সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স (ডি)—১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন—৮৫৩ বড় বাজার টেলিগ্রাম—মেকানিষ্টস্

নূতন বাহির হইল ! নূতন বাহির হইল !!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত

—আগাছা—

রূপের মোহ ! প্রেমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পুরুষের চিত্ত রূপের বন্যায় ভাসিতে চায়, পুরুষের এ দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইবেন। অবনীর চরিত্রে পত্নীর প্রেম ! স্বামীর প্রেমে পত্নীর কি অখণ্ড বিশ্বাস, নিশ্চিন্ত নির্ভর ! স্বামীর তৃপ্তির জন্য নারী তার সর্ব্বস্ব দিতে পারে, পরিচয়—বীণা

—আগাছা—

আর যে অভাগিনী বুক-ভরা প্রীতি [illegible] মন-ভরা আবেগ 'দিতে চায় [illegible] কেহ নাই' তার নিরুপায়তার অসহ্য [illegible], সমাজ-বিধি বাঁচাইতে তার [illegible] করুণ ছবি—শান্তা !!!

গৃহ-সংসারে যা নিত্য ঘটিতেছে, তারি জীবন্ত জলন্ত ছবি আশ্চর্য্য [illegible] প্রতিফলিত। মূল্য—১৲ টাকা মাত্র

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত **রূপছায়া** ২৲	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত **প্রতিষ্ঠা** ২৲ মুক্তির আলো ৸০	শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত **লঘু-গুরু** ১।০
শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **মধু-মঙ্গল** ২৲	শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত অগ্নি-পরীক্ষা ১।০	শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত **বাংলার রাণী** ১৲

নাথ ব্রাদার্স—২৩-সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীচিত্র শিক্ষা

প্রথম ভাগ—মহিলা ও ছেলে মেয়েদের পোষাকে সূচী কার্য্যের জন্য আদর্শ চিত্র।

দ্বিতীয় ভাগ—উপরোক্ত পোষাকের জন্য ফ্রেঞ্চ প্যাটার্ণ চিত্র ও বাঙ্গালা 'মটো'।

তৃতীয় ভাগ—টেবিল ক্লথ, কুশন কভার, বড় কভার, সর্ব্বপ্রকার ঢাকনী (cover), শাল, শাড়ী, আলোয়ান, ওড়না, চট্ (canvas), খদ্দর ও ভেলভেটের [illegible] এবং ইংরেজী মটো ও বর্ণমালা।

চতুর্থ ভাগ—ভারতের সকল শ্রেণীর নেতা।

পঞ্চম ভাগ—দেব দেবীর চিত্র।

উপহারের উপযোগী বাঁধাই প্রতিখণ্ড ৷৵০ আনা।

একত্রে ৫ খণ্ড বাঁধাই ২৷০ আনা।

বৃহৎ আকারে শ্রীকৃষ্ণ, ফুল লতা বেষ্টিত [illegible] প্রত্যেকটী চারি আনা, সূর্য্যমুখী ফুল ও গাছ—তিন আনা।

গীতা—[illegible] চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, ত্রিবর্ণে ও [illegible] ১৭ খানি ছবি, সরল অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহ [illegible] সংস্করণ—১।০

মহিলাদের [illegible] জীবনী—৷৵০

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী

৩৫।এ [illegible] বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিক্ষিতা পতিতার আত্ম-চরিত

মানদা দেবী প্রণীত নিজ জীবনী

পঞ্চম সংস্করণ—বাংলা—১।।০, হিন্দি—১।।০, ইংরাজী—২৲।

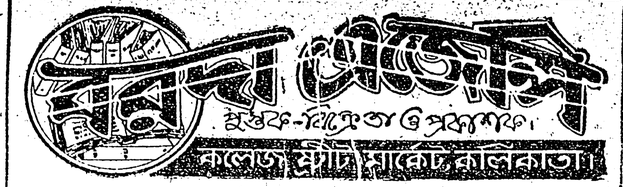

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—১৲ সুরেন চাঁদ দরবেশ প্রণীত

বিনামূল্যে জীবনের ফল

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত জ্যোতি বাচস্পতির বিচার

আমি আমার সহায়ক ও ছাত্রদের লইয়া জ্যোতিষের গবেষণা আজ বার বৎসরের উপর করিয়া আসিতেছি, এবং আমাদের গবেষণার ফল ক্রমান্বয়ে পুস্তক ও প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করিতেছি ইহা সকলেই জানেন।

গবেষণার জন্য অনেক কোষ্ঠী আমরা সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু আরও অনেক দরকার।

যাঁহাদের নিজের বা পরিবারস্থ অপর কাহারও জন্ম সময় সঠিক জানা আছে, তাঁহারা যদি সেই জন্ম সময় ও তারিখগুলি পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে বাধিত হইব। যদি কোন কোষ্ঠীর ভাল বা মন্দ কোন বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই তাহা হইলে **সেই ফল প্রেরককে বিনা পারিশ্রমিকে জানানো হইবে।**

যাঁহারা জন্মসময় পাঠাইবেন তাঁহারা ঐ সঙ্গে জন্ম স্থানের উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না। এবং সমষ্টি স্থানীয় সময় কি ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় তাহাও জানাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় এ সম্বন্ধে সকল চিঠিপত্র দিবেন।

জ্যোতি বাচস্পতি

জ্যোতিষ গবেষণা মন্দির

৫৬নং হালদার পাড়া রোড কালীঘাট, কলিকাতা।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

—বাংলা উপন্যাসে নবসৃষ্টি—

—সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়— চিত্রবহ্না ২৷০	—নিরুপমা দেবী— দেবত্র ৩৲

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—

বাংলার মেয়ে ২৲ ; মাটির ঘর ২৲ ; অতসী ১৷০
কয়লাকুটি ১।০ ; জোয়ার-ভাটা ২।।০ ; নীহারিকা ১।০
ষোল-আনা ১৷০ ; মহাযুদ্ধের ইতিহাস ২।।০
হাসি ১।০ ; লক্ষ্মী ৷০

—হেমেন্দ্র রায়ের— ঝড়ের দোলা ১৷০	—প্রেমেন্দ্র মিত্রের— পাঁক ১৷০

—মণীন্দ্রলাল বসুর—

মায়াপুরী ১।।০ ; রক্তকমল ১।৷৵০ ; সোনার হরিণ ১।৵০

স্বর্গীয় ডাক্তার চুণীলাল বসু সি-আই ই প্রণীত

পল্লী-স্বাস্থ্য ও সরল স্বাস্থ্য-বিধান

নূতন (৩য়) সংস্করণ

পরিবর্দ্ধিত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত এবং ৫২ খানি চিত্রে সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী সাইজ ৩০৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় এমন বিশদ ও সম্পূর্ণ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। মূল্য ১।০ টাকা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী :—

১। খাদ্য (৫ম সংস্করণ)—মূল্য ১৲ টাকা। ২। শারীর স্বাস্থ্য-বিধান (২য় সংস্করণ)—মূল্য ১।০ টাকা। ৩। রসায়ন-সূত্র (ষষ্ঠ সংস্করণ)—মূল্য ২৲ টাকা। ৪। [illegible]—মূল্য ১৲ টাকা। (৫ আঃ)

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বুক কোম্পানি ৪।৪A কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

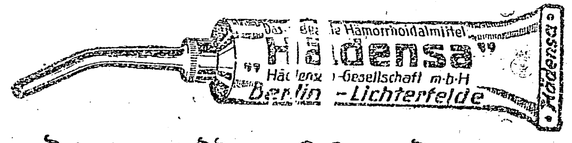

অর্শ রোগে

আশু ফলপ্রদ অব্যর্থ মহৌষধ

"হেডেন্সা"

উপরোক্তরূপ টিউবে পৃথিবীর ৯৮টী দেশের সর্ব্বত্র সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

সুদৃশ্যতায় ও স্থায়িত্বে

আমাদের গিনি সোণার গহনা ও রূপার সামগ্রী অননুকরণীয়

খাঁটী জিনিষ ও সত্য ব্যবহার আসল চুণী, পান্না, কমল

হীরা প্রভৃতি সুলভে পাইবার একমাত্র স্থান

সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী জহুরী

শ্রীযুক্ত জে. দত্তের পরিচালিত

জে, দত্ত এণ্ড কোং

১৩২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্যামবাজার কলিকাতা

মিরা টুথ ব্রুস

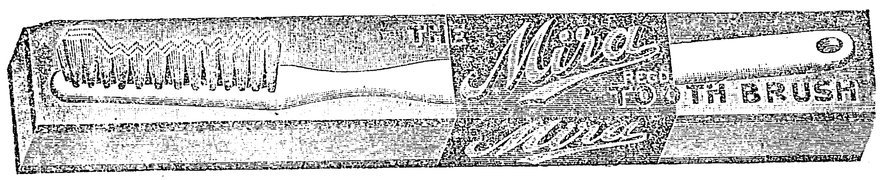

দৃঢ় ❋ ❋ ❋ মাঝারো ❋ ❋ ❋ কোমল

মিরা টুথ ব্রুস বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে এরূপভাবে প্রস্তুত যে ইহাতে প্রত্যেকটি দাঁত শুভ্র ও নির্ম্মল হয়। ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যকণা কিম্বা অন্যান্য অপরিচ্ছন্নতা ইহা এরূপ নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করে যে দন্ত ক্ষয়ের কোনই কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। এই ব্রুস ব্যবহার করিলে দাঁতগুলি নিরাপদ, দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং মাড়ি ইত্যাদি দৃঢ়তর হয়। ইহা অতীব আরামপ্রদ।

মিরা টুথ ব্রুসের সহিত

মিরা ডেণ্টাল ক্রিম ব্যবহার করুন অচিরেই

আপনার দন্তপক্তি শুভ্র সুস্থসুন্দর ও সবল হইবে।

সোল এজেণ্টস্ :—**টি, এম্, উকোর এণ্ড কোং**

রেডিমানি ম্যানসন. চার্চ্চ গেট ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই।

ব্রাঞ্চ ঃ—মাদ্রাজ,	লাহোর,	করাচি,	কলিকাতা,	রেঙ্গুন
পোঃ বক্স নং—২৪৯	১৩৪	১১৪	২১১১	৬৫৪

AURORA

মহীশূর চন্দন সাবান

—পূত, স্নিগ্ধ, সৌরভ-মণ্ডিত—

আবালবৃদ্ধ-বনিতার চিরবাঞ্ছিত

❋ শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ ❋

স্বদেশী

খ
খদ্দর
র

ধুতি, শাড়ী, তসর, গরদ, মটকা বেনারসি, মান্দ্রাজী, ঢাকাই

হাল্ ফ্যাসানের সর্ব্বরকম পোষাক প্রভৃতির

=বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান=

তারা ষ্টোরস

PHONE 2178 B. B.

৮৭।২ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যাবতীয় মেহ স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য পুরুষত্ব হানীর সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

মূল্য কৌটা ১।০ টাকা

মাশুলাদি ।০ আনা

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টারী কৃত

যৌবন সুধা

ঠিকানা—ডাক্তার কে, ভৌমিক, উর্দ্দুরোড, ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ

২৭সি, অপার সার্কুলার রোড, (শিয়ালদহ ষ্টেসনের উত্তর)

১৩০বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার ট্রামডিপুর দক্ষিণ),

৪৫।২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

জনপ্রিয় ছন্দে মহাকবি কালিদাসের

মেঘদূত

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন অনূদিত

নানা রঙের কালিতে ছাপা—তিন রঙের ছবিতে ভরা—
সিল্কের বাঁধা—দাম ২৲ দুই টাকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

আপনার বইখানি পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। আপনার "মেঘদূতের" অনুবাদ আমার ভালো লাগিল।

আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের অভিমত—

কবির লেখার যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। মেঘদূতের রস-প্রস্রবণ কলনিনাদে কবিতার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়ের অভিমত—

মন্দাক্রান্তা কালিদাসের পয়ার কবিরত্নের, এইমাত্র পার্থক্য—বেদনা, ঝঙ্কার একই!

প্রকাশক—বসাক এণ্ড সন্স
৯৮।৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

মশারি! মশারি!!

ভারতের বৃহত্তম কারখানায় আপনার মশারির অর্ডার দিন। আমাদের মশারি শক্ত শুভ্র অত্যুৎকৃষ্ট নেটের প্রস্তুত এবং উহা ভারত, ব্রহ্ম, সিংহলে বিখ্যাত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত।

নিম্নলিখিত মাপের মশারি সর্ব্বদাই মজুত থাকে

লম্বা		চওড়া		খাড়াই	সাধারণ রকম		বিশেষ রকম
৬ ফুট	×	৩ ফুট	×	৪½ ফুট	প্রতিটি ৩।৵০	...	৬।৶০
৬½ „	×	৪ „	×	৪½ „	„ ৫।০	...	৭॥০
৭ „	×	৩½ „	×	৫ „	„ ৫॥৵০	...	৮।৶০
৭ „	×	৫ „	×	৫ „	„ ৬।৶০	...	৯॥০
৭ „	×	৫ „	×	৬ „	„ ৭৶০	...	১০॥০
৭ „	×	৬ „	×	৬ „	„ ৭॥৵০	...	১১।৶০

প্যাকিং খরচা লাগিবে না, মাশুল স্বতন্ত্র।

অন্যান্য যে কোন মাপের মশারি অর্ডার মত সরবরাহ করা হয়।
আমাদের জিনিষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ মূল্য অত্যন্ত সুলভ।

ইউনিয়ন ট্রেডিং কোং
মশারি বিশেষজ্ঞ
১৭৭ হ্যারিসন রোড (T) কলিকাতা

হস্তরেখা দৃষ্টে জন্মদিন

জন্ম সময়াদি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নির্দ্ধারণ করিতে অদ্বিতীয়
—বঙ্গের একমাত্র নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারকারক—

পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী
১৬ নং কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, (বি) কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৩৮৭৪।

প্রশ্ন গণনা—৫টী প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৪৲, বর্ষফল এক বৎসরের ২৲, জীবন ফল ৫৲, আদেশপত্রের সহিত হাতের ছাপ, জন্ম-সময়াদির বা পত্র লিখিবার সময় উল্লেখ করিবেন।

শনি কবচ—রুষ্ট শনি তুষ্ট হইয়া প্রভূত কল্যাণ করিবেন। দক্ষিণা ২॥৵০। ৴০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে 'ভাগ্যবিচার' নামক পুস্তক বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

প্রকাশিত হইল—

প্রায় ২০০ দুই শত পৃষ্ঠা ১৫০ দেড় শত চিত্রে সুশোভিত অভিনব গ্রন্থ—
পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী প্রণীত—

হস্তরেখা ভাষ্য

নিজের বা আত্মীয়গণের করেরেখা দেখিয়া স্বয়ং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান গণনা করিবার একমাত্র পুস্তক। এই পুস্তক পাঠে যে কেহ অনায়াসে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সামুদ্রিক বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইতে পারিবেন। শিক্ষার্থী ও ভাগ্যান্বেষীগণের পক্ষে অমূল্য, মূল্য মাত্র ১॥০ দেড় টাকা।

ডাঃ শ্রীউমেশচন্দ্র রায় এল, এম, [illegible]
মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুরারোগ্য পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য হইয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

দশহাজার টাকা পু[illegible]

[illegible]

কবিরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার [illegible]

[illegible]

আবার

সন্দেশ

বাহির

হইতেছে।

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

COLOURED ILLUSTRATION

স

ন্দে

শ

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ মাসিক

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ও ৺সুকুমার রায়চৌধুরী পরিচালিত

সন্দেশ

আবার বাহি... হইবে।

"সন্দেশ"এর ... পরিচয় অনাবশ্যক। লেখায়, ছবিতে, ছাপায়, "সন্দেশ" ছেলেমেয়েদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কাগজ ছিল। যাহাতে এখন তাহার পূর্ব্ব গৌরব ও বিশেষত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারে তাহার বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে।

১লা আশ্বিন ১৩৩৮ হইতে বাহির হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৵০।

যাঁহারা এক মাসের মধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা ২৲ টাকায় পাইবেন।

"সন্দেশ"এর পুরাতন গ্রাহকগণ শেষ বর্ষের কাগজ কয়েক সংখ্যা পান নাই। পুরাতন গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অবিলম্বে পূর্ব্বের গ্রাহক নম্বর অথবা নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে, ১৷৵০ আনায় পাইবেন।

ভি-পি খরচ সকল ক্ষেত্রেই আলাদা। টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়াই সুবিধা।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,

১১৭।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

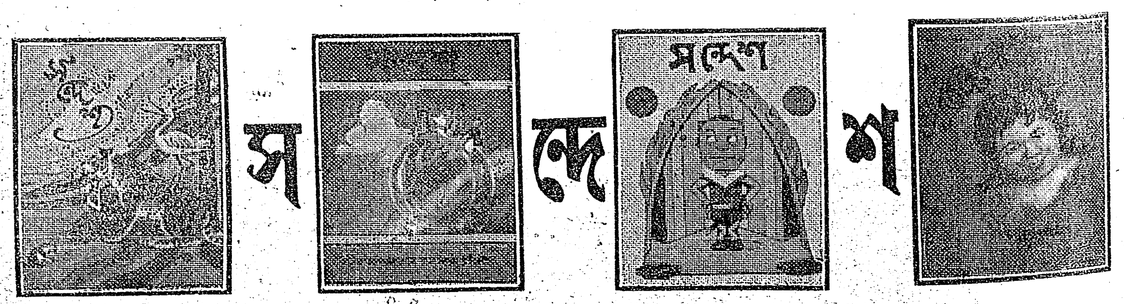

স

ন্দে

শ

বাংলা—কথাসাহিত্যে—কয়েকখানি—নবপ্রকাশিত—উৎকৃষ্ট পুস্তক

"পথের পাঁচালী" প্রণেতা শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
"মেঘমল্লার" ২৲
"ব্যথার-পূজা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
জবাব" (ভারতবর্ষে ধারাবাহিক প্রকাশিত) ১৷০
কিরণ...কথা" ... ১৲
পাঁকা লেখক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ,
ভৌতিক কাহিনী" (সত্যঘটনা অবলম্বনে) ১৲
ফিরে পাওয়া" (গার্হস্থ্য নিখুঁত চিত্র) ১৷০
নষ্টচন্দ্র ... খ্যাতনামা লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৷০
শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কালো ও আলো" (উপহারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) ১৷০
মধুযা...ী" ১৷০
"সি... মন্দির" প্রণেতা সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
স্বর্ণকু..." ১৷০
...মতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী
হৃদয়ের ... চাঁদ" (সুখ দুঃখের একটী করুণ চিত্র) ২৲

—রাখালদাস কাব্যানন্দ—

মহাপুরুষ আশুতোষ" (জীবনের বিভিন্ন সময়ের ১২ খানি চিত্রসহ সম্পূর্ণ জীবনী) ৩৲
শঙ্করাচার্য্য" (জীবনী ও তত্ত্বোপদেশ) ২৷০
গুরু না...ক" (শিখগুরুর জীবন-বৃত্তান্ত) ১৷০

—যতীন্দ্রনাথ পাল—

...র্ম্মপত্নী ৩৲ — সতীরাণী ১৲
সতীর স্বর্গ ১।০ — সঙ্গিনী ১৲
মুস্কিল আসান ১৷০ — মিলন ১৲

—শ্রীপতিমোহন ঘোষ—

...স্বস্বপ্ন ১৷০ — বাজপাখী ১৲
...রঙ্গিনী ১৲ — সহচরী ৷৵০
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত "প্রীতি" ১৷০
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল "ভাগ্যবতী" ১৷০
শ্রীচারুশীলা মিত্র "সোনার কমল" ১৷০
শ্রীচরণ দাস ঘোষ "সুহাস" ১৷০
...রেন্দ্রনাথ পাল "ফুলের হাওয়া" ১৷০
শ্রীললিতমোহন সিংহ "নগেন্দ্রনন্দিনী" ৸০
শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র "অগুরু" ১৲

—হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—

...রাধীনা ১৷০ বিসর্জ্জন ১৷০ অনাদৃতা ১।০
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু "খেলার দেনা" ১৲
...রিণয় পাবে ১।০ — বিকাশ ও ব্যথা ১৷০
সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী কমলা ১৲ — কুলদেবী ১৷০

কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় "মাটীর স্বর্গ" ২৲
সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়
"বাঁশী" (ভারতবর্ষে ধারাবাহিক প্রকাশিত) ২৲
সুলেখিকা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী সরস্বতী
"হিন্দুর মেয়ে" (মানসীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত) ২৲
কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
"স্বেচ্ছাসেবিকা" (নূতন ধরণের উপন্যাস) ২৷০
"চোখের কাজল" ২৲ — কায়া ও ছায়া ২৲
"পথিক বঁধু" ১৷০ — পথের কথা ১৷০
দানের বোঝা ১৷০ — বাদলধারা ১৷০
বিশ্বনাথের দরবারে ২৲ — বিয়ের রাত ১৷০
দুনিয়ার দান ২৲ — মুক্তপথের যাত্রী ১৷০
তরুণী ১৲ — সুন্দরী ১৲
জীবনের সাধ ১৷০ — সোহাগী ১৸০
শিথিল কবরী ১।০ — সোনালী ১৷০
স্বর্ণমন্দির ১।০ — লক্ষ্মীপ্রতিমা ১।০
প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার
স্নেহাশীষ ২৲ — হাতের নোয়া ২৲
প্রীতির নিদর্শন ২৲ — দিশেহারা ২৲
হীরার কণ্ঠী ১৷০ — আলোকে আঁধারে ১৷০
স্বপ্নপরিণীতা ১৷০ — বঁধু ১৲
ধনুর্ভঙ্গ (বালকদের অভিনয়োপযোগী নাটক) ।০
প্রবীণ লেখক শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ
স্নেহের দান ২৲ — আশার আলো ১৷০
মনের দাগ ২৲ — কেরাণীর মাসকাবার ১৷০
একালের মেয়ে ১৷০ — ভোরের আলো ১৷০
শান্তি (প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ পুস্তক) ১।০
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত "সাতপাক" ৸০
শ্রীসুরুচিবালা রায় "আহুতি" ১৲
শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "সন্ধ্যামণি" ১।০
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী "কালের হাওয়া" ১৷০
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী "চিত্রলেখা" ১।০
বিপিনবিহারী ঘোষ "জগবন্ধু" (জীবনী) ১।০
শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু "বিচিত্রভুবন" (বর্ম্মার ইতিহাস) ২৲

—শ্রীবঙ্কিমবিহারী সেনগুপ্ত—

দুঃখের পাহাড় ১৲ — উপহার ১৷০

—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—

সতীলক্ষ্মী ২৲ — কমলার অদৃষ্ট ১৷০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু "শকুন্তলায় নাট্যকলা" ১৲

বরেন্দ্র লাইব্রেরী—২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিখিল ভারতের শিশুমহলে আনন্দ-সংবাদ

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ উপহার

ষষ্ঠ বার্ষিক সংখ্যা ১৩৩৮

বার্ষিক শিশুসাথী

ষষ্ঠ বার্ষিক সংখ্যা ১৩৩৮

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ উপহার

অন্যান্য বছরের মতো এবারও পূজার আগেই বাহির হইবে!
যে সব কথাশিল্পী ও চিত্রশিল্পীর লেখা ও ছবি শিশুরা ভালবাসে তাঁদের সকলেই শিশুদের জন্য লেখা ও ছবি দিয়াছেন।
ষষ্ঠ বার্ষিক সংখ্যা বার্ষিক শিশুসাথীর সম্পাদন ভার লইয়াছেন
শিশুসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক

❋ পণ্ডিত শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী ❋

বার্ষিক শিশুসাথী

রঙিন কাগজে—রঙিন কালিতে—ঝকঝকে ছাপা
মনোরম প্রচ্ছদশোভিত!!
মূল্য ১৷৷০ টাকা

বার্ষিক শিশুসাথী

প্রত্যেকখানা ৷৷০—পূজার উপহারে শিশুদের মনোরঞ্জন—প্রত্যেকখানা ৷৷০

১ পুরস্কার — অভিনব উপন্যাস
২ মায়ের বুকে — প্রাণমাতান উপন্যাস
৩ রাক্ষসের দেশ — রোমাঞ্চকর উপন্যাস
৪ মণ্টু — রংদার উপন্যাস
৫ [illegible]মুক্তা — হা[illegible] গল্প-কবিতা
৬ জলপরী — সাগর পরীদের কথা
৭ দেশের ছেলে — গৌরবময় উপন্যাস
৮ পৌরাণিক গল্প (১ম ভাগ)
৯ পৌরাণিক গল্প (২য় ভাগ)
১০ [illegible]কথা — সরস [illegible]কথার খনি!

"রসাল কথার হীরক-খনি!"
১১ পরীরাণী
১২ কল্পকথা
১৩ গল্পের লহর
১৪ বুলবুল্
[illegible]-শিল্পের [illegible]-মণি!!"

ভক্তির অপার মহিমা!

ধ্রুব	।৵০
কৃষ্ণসখা	।৵০
প্রহ্লাদ	৷৷০
যিশুখৃষ্ট	৷৷০
সোনার চাঁদ	৷৷০
ভগবানের লীলাখেলা	৷৷০
ভক্তির ডোর (নাটক)	।/০

সতীকথার পুণ্যধারা!

(প্রত্যেকখানা ৷৷০ আনা)
সতী সীতা চিন্তা উমা
সাবিত্রী সংযুক্তা পদ্মিনী
বেহুলা উত্তরা দময়ন্তী
(প্রত্যেকখানা ।৵০ আনা)
গান্ধারী শৈব্যা বনলতা
বাসবদত্তা তারাবাই
[শকুন্তলা ৷৷৵০]

পুণ্যকথার [illegible]স্রবণ!!!

ভীষ্ম ৷৷০	[illegible]মন্ত ৷৷০
ভীমসেন	৷৷০
কালকেতু	৷৷০
চন্দ্রহাস	।৵০
স্বামী বিবেকানন্দ	।৵০
হনুমান	৷৷৵০

(শীঘ্রই আরও বাহির হইবে)

সতীকথা-সিরিজের চা'রখানি উৎকৃষ্ট রাজসংস্করণের উপহার

(১) উষা—বাণরাজদুহিতা উষার প্রণয় কাহিনী—সচিত্র ১৲
(২) দ্রৌপদী—পাণ্ডবগৃহিণী সতী দ্রৌপদীর জীবন-কাহিনী ১৲
(৩) সতীরাণী—আদর্শ সতী বেহুলার মনোরম জীবনকথা ১৲
(৪) বাঙ্গালার [illegible]—নবাবী আমলের গৌরবগাথা ৸০

আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
পাটুয়াটুলী, ঢাকা

—মহাপূজায়—
শ্রেষ্ঠ [illegible] উপহার!

কাশীদাসী সচিত্র মহাভারত

যে মহাভারতের কথা হিন্দুর কাছে 'অমৃত সমান' তাহার নূতন পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই। বাজারে ইহার আরও সংস্করণ আছে আমরাও একখানা সংখ্যাবৃদ্ধি করিলাম। অন্যান্য সংস্করণের তুলনায় ধর্ম্মপ্রাণ পাঠক-পাঠিকা ইহাকেই শ্রেষ্ঠাসন দিবেন—

—কারণ—

প্রথম—আমাদের সংস্করণ সম্পূর্ণ নূতন বড় বড় অক্ষরে ছাপা।
দ্বিতীয়—ইহার ছবিগুলি বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা—সুদৃশ্য—নয়নরঞ্জক।
তৃতীয়—আমাদের বাঁধাই খুব চমৎকার—বহুকাল স্থায়ী।

এসব বিশেষত্ব সত্ত্বেও এই মহাকাব্যের মূল্য খুবই সুলভ।

সাধারণ সংস্করণ—৩৷৷০ টাকা ❋ রাজসংস্করণ—৫৲ টাকা

উপহারের কোহিনূর! =চিত্র-শিল্প= শাস্ত্রগ্রন্থের কৌস্তভমণি!!

চিত্রে দেবশিশু	১৲
সতীরাণী-চিত্রে	১।০
সতীলক্ষ্মী-চিত্রে	১।০
সতী-চিত্রে	২।০
রামায়ণ-চিত্রে	২৷৷০
ভারতনারী-চিত্রে	২৷৷০
শ্রীকৃষ্ণ-চিত্রে	৩৲
চন্দ্রশেখর-চিত্রে	৩৲

ও ❋ সা ❋ হি ❋ ত্য ❋

(১) সচিত্র কৃত্তিবাসী
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ মূল্য—৩৲

❋ ❋ ❋

(২) সপ্তগোস্বামী—	২৲
(৩) হরিদাস ঠাকুর—	১৲
(৪) শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ	১৲

❋ ❋ ❋ সুসাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এ. প্রণীত ❋ ❋ ❋
প্রাণি-বিজ্ঞান দুইখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান

জীবজগৎ
২৲
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে অতি বিরাটকায়—পৃথিবীর জলচর—স্থলচর—খেচর প্রাণীর বর্ণনা-কৌশলে ও চিত্রবাহুল্যে শিশুদের হৃদয়গ্রাহী!

উপহার

গাছপালার গল্প
১৷৷০
শিশুশিক্ষার উপযোগী উদ্ভিদ্‌জাতি বিষয়ক এমন সুন্দর ও সরস বই অতি অল্পই আছে। ছবিতে ভরপুর—মজবুত বাঁধাই!!

আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা
Phone :—2812 Burra Bazar. Telegram :—"Politeness," Calcutta.

জুয়েলারী স্বর্ণালঙ্কার

রূপার বাসন এবং অতি আধুনিক মীনা করা জড়োয়া গহনা

বোম্বায়ের জহুরী

কে, মণিলাল এণ্ড কোং

১৭৩ হারিসন রোড, কলিকাতা

ডাকমাশুলের জন্য দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া সম্পূর্ণ মূল্য তালিকা গ্রহণ করুন।

আপনার স্ত্রী

রোগ যাতনায়, অনিয়মিত ঋতু ও বেদনায় কাতর কঙ্কালসার হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে জিনেটোন্ সেবন করিতে দিন। সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগ, প্রদর, বাধক ইত্যাদির ইহা নিরাপদ অব্যর্থ মহৌষধ।

পত্র লিখিলেই বিশেষ পুস্তিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হইবে।

ভারতের এজেন্টস্ঃ—

এস্, কুশলচাঁদ এণ্ড কোং

৫৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

The Homœo Syndicate
109, College St. Calcutta

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ

পুস্তক ও সরঞ্জাম ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় হয়। ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন। "ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথি" নামক একখানি পুস্তক বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হয়।

বার্থ-কনট্রোল

বিফলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত

এই ঔষধের গুণে সংসারের নানা বিষয়ের মত গর্ভও আয়ত্ত হইয়া গেল। এই ঔষধ ঋতুবতী হইয়া খাইতে হয়। যে মাসে খাওয়া হইবে সে মাসে গর্ভ কিছুতেই হইবে না। যতদিন ব্যবহার হইবে ততদিন গর্ভসঞ্চার স্থগিত থাকিবে। আবার ঔষধ বন্ধ করিলে গর্ভ হইবে। ঔষধের বিশেষ গুণ, স্বামীসহবাস নিষিদ্ধ নহে অথচ কোনো হানি হয় না। ৬ মাসের ঔষধ ১৫০ সিকা, একবৎসরের ঔষধ ২॥০ টাকা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

দি এ্যাংলো আয়ুর্ব্বেদিক হোম

১৭০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাগমডারের রেজিষ্টার্ড

সুবাসিত ক্যাষ্টর ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল

বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ইহার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহা কেবল বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল ও ক্যান্থারাইডিন সংযোগে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। নিয়মিত ব্যবহারে কেশের গোড়া শক্ত হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও কেশ বৃদ্ধি করে; অকালপক্কতা, চুলউঠা, টাকপড়া, কেশের বিবর্ণতা, মাথাধরা ও মাথাঘোরা খুস্কি প্রভৃতি যাবতীয় কেশ রোগ ক্রমশঃ আরোগ্য করে। বড় বড় মনোহারি দোকানে ও ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি ৪ আউন্স শিশি ৸০; একমাত্র প্রস্তুতকারক বাগমডার এণ্ড কোং (স্বদেশী প্রতিষ্ঠান) ৪নং সিঙ্গি দত্ত লেন, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

ঘোষ ব্রাদার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
একমাত্র আদত গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা।

"জুয়েলারি ম্যানসন"

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের অগ্নি পরীক্ষা

ঘোষ ব্রাদার্সের অলঙ্কার-না আদত গিনি? না নগদ টাকা?

আমাদের প্রস্তুত ব্যবহৃত অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে সমওজনের আদত থান গিনি অথবা পুরা গিনি সোনার মূল্যে নগদ টাকা পাইবেন। পান মরা বাদ নাই

এইই কি আমাদের সততার অগ্নিপরীক্ষা নহে?

৵০ দুই আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

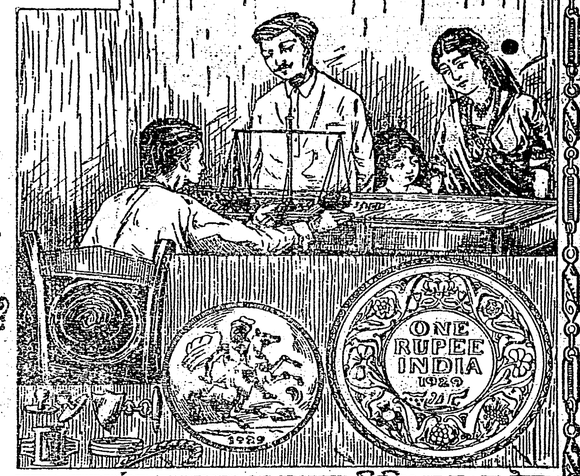

সঙ্গীতাধ্যাপক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত ও সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

কণ্ঠ-কৌমুদী

(প্রথম খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ

গ্রন্থখানি সঙ্গীত শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বহুমূল্য রত্নের ন্যায়। সঙ্গীতানুরাগিগণের ইহা অমূল্য গ্রন্থ! যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার জন্য সমগ্র সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই উদ্‌গ্রীব হইয়া হতাশ হইয়াছিলেন, বহুকষ্টে সেই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহাতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি প্রাচীন গীতসমূহের স্বরলিপি সন্নিবেশিত আছে। মূল্য—৩৲ টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন বই! নূতন বই!

শ্রীপদামৃত মাধুরী

(বিস্তৃত ভূমিকা, টীকা ও আস্বাদনসহ সচিত্র মহাজন পদাবলী ১ম খণ্ড)

অতুলনীয় বৈষ্ণব কবিতা যাহাতে সাধারণ পাঠক ও গায়ক তুল্যভাবে উপভোগ করিতে পারেন, সেইরূপ ভাবে সরল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বর্ণাক্ষরে, সুশোভন ভাবে গ্রথিত। মূল্য ৩৲ মাত্র

পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও
অধ্যাপক রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্-এ,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যদি শিল্প বিজ্ঞানের চরম উৎকৃষ্ট সাধন ও বাদ্যযন্ত্র জগতে নবযুগের প্রবর্ত্তন দেখিতে চান তবে একমাত্র যতীন এণ্ড কোংর হারমোনিয়মেই দেখিতে পাইবেন। দাম বিশেষ সুলভ করা হইয়াছে।

হারমনিয়ম প্রস্তুত কারক যতীন এণ্ড কোং

৭৬ পাটুয়াটুলী, ঢাকা

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

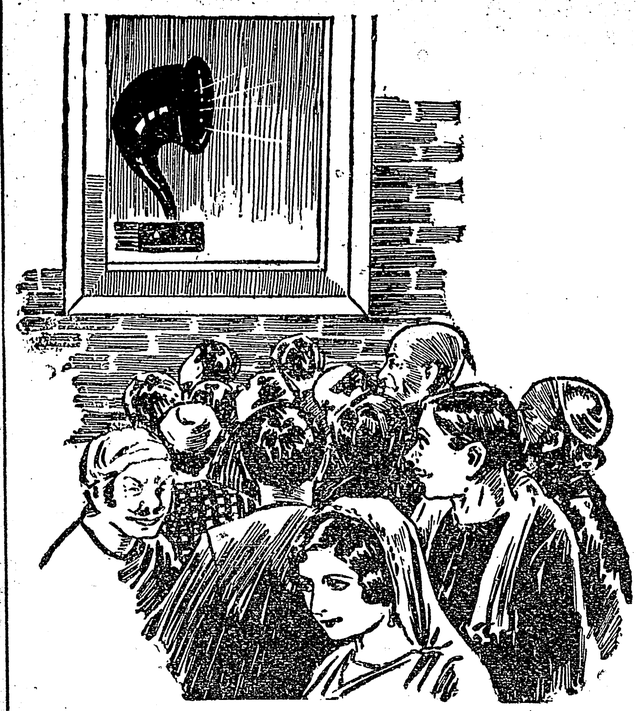

"রেডিও"

যন্ত্রসাহায্যে বিকীর্ণ বিশ্ববিমোহন সঙ্গীত
ও শিক্ষাপ্রদ সংবাদনিচয় গৃহে বসিয়া
ইচ্ছামত উপভোগ করুন

আমরা সকল প্রকার আধুনিক সেট ও রেডিও
সরঞ্জাম মজুত রাখি ও অর্ডার পাইলেই
সুযোগ্য কারিকর দ্বারা নিখুঁৎ ভাবে
বসাইবার ভার লইয়া থাকি

সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও রেডিও সরঞ্জামের জন্য

—প্রসিদ্ধ—

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮২ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Phone : Cal. 2877 Tele : Phonograph

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের } ঢাকা—(কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯এ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ী, কলিকাতা। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মেদিনীপুর, বহরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মান্দ্রাজ, দিল্লী রেঙ্গুন প্রভৃতি। } মকরধ্বজ ৪৲ তোলা

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় (১৩০৮ সনে স্থাপিত)

নারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। সর্ব্ববিধ প্রমেহ ও বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—(চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।) ২০৲ তোলা। সুরুল প্রকার ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ **ভোলানন্দ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন,—"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কোলিমে কো'ই নেই কিয়া, আপতো রাজ চক্রবর্ত্তী হ্যায়।"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল ও ভাইস্‌রয় ও বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **রোণাল্ডসে** বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি।" বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর **সার হেনরী হুইলার** বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু **সি, আর দাশ**—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়্‌গুণবলিজারিত)

মকরধ্বজ—৮৲ তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের। সর্ব্বজন প্রশংসিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল।

দশনসংস্কার চূর্ণ—১৲ কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ।

বৃহৎ খদির বটিকা—৵০ কৌটা। (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বুলবিলাস।)

দাদমার—৵০ কৌটা। দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ।

উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

চিঠি, পত্র, অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটারের নামোল্লেখ করিবেন। ক্যাটলগ ও শক্তি-পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

প্রোপাইটার—(রিসিভার) **শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি, এ** ঢাকা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

বিজয়-সিংহ

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয় দ্বিজেন্দ্রলাল

শিল্পী - শ্রীযুক্ত মণিমোহন রায় চৌধুরী

COLOURED ILLUSTRATION

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

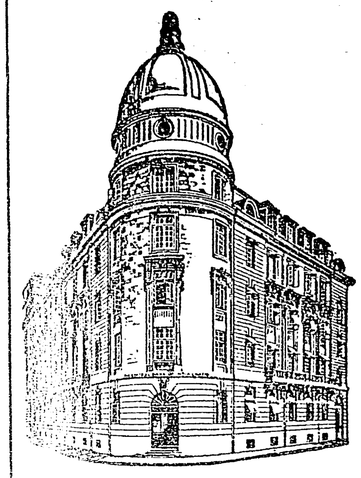

যদি আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন যে আপনি

থিয়েটার দেখিবেন না,
মদ্য পান করিবেন না,
বদ মেজাজ দেখাইবেন না,

তথাপি আপনি এই সকল প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেও পারেন

—কিন্তু—

যদি আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন যে, আপনি প্রতি বৎসর

আপনার "হোম সেভিংস একাউণ্টে"

কিছু কিছু সঞ্চয় করিবেন, তাহা হইলে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এবং—আপনি প্রতি বৎসর **দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব লিমিটেডের** তিন বৎসরের মিয়াদী ক্যাস সার্টিফিকেটে যথাসাধ্য অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

—বিশেষ বিবরণের জন্য—নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ৭১, ক্রস ষ্ট্রীট, বড়বাজার অথবা ১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বস্ত্র-জগতে শ্রেষ্ঠ অবদান

বড়বাদাম সাড়ী
ছোটবাদাম সাড়ী
পারিজাত সাড়ী

ছাপান সাড়ীর বিপুল আয়োজন

২০৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।